?

সমাজ ও ইতিহাস

সমাজ ও ইতিহাস

সুশোভন সরকার

বাক্

৩৩ কলেজ রো কলিকাতা ৯

॥ প্রচ্ছদ ঃ যামিনী রায় ॥

বাক্

প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৬৪

প্রকাশক ঃ তারাভূষণ মুখোপাধ্যায়
৩৩ কলেজ রো কলিকাতা ৯

মুদ্রক ঃ সুকুমার চৌধুরী
বাণী-শ্রী প্রেস
৮৩বি বিবেকানন্দ রোড কলিকাতা ৬

মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

বিক্ষিপ্ত সাময়িক রচনাকে গ্রন্থাকারে স্থায়ী রূপ দেবার ইচ্ছা হয়তো বা দুরাশা। তবু লেখক-মাত্রেরই নিজের লেখা সম্বন্ধে একটা মমতা থাকে, সহৃদয় বন্ধুমহলের অনুরোধও নিতান্ত উপেক্ষনীয় নয়। 'বাক্' প্রকাশনী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ বই প্রকাশের কাজে এগিয়ে এসে আমাকে তাদের কাছে ঋণী করেছেন।

গত পঁচিশ বছরে বাংলার মানসক্ষেত্রে যে-নূতন সমাজচিন্তা প্রবাহিত হয়েছে, এই লেখাগুলি তার প্রতিফলন, তার মূল সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে। একসঙ্গে পড়তে গেলে বইখানিতে তাই পুনরাবৃত্তি চোখে পড়বে, নূতন ধারণা প্রতিষ্ঠার অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম তার কারণ। এ ধরনের লেখায় ঐতিহাসিক পরম্পরার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ বাঞ্ছনীয়, তাই প্রতি প্রবন্ধের নিচে প্রথম প্রকাশের তারিখ নির্দেশ করা হল। একই কারণে প্রকাশিত বক্তব্যের সংশোধন অনুচিত মনে হয়েছে—মূলের সঙ্গে তফাত দেখা যাবে কেবল বানান, পরিভাষা ও দুএকটি শব্দের অদলবদলে। বলা বাহুল্য যে প্রথম প্রকাশের তারিখ ও তখনকার বাস্তব অবস্থার কথা বিস্মৃত হলে অনেকের কাছে লেখকের মতামত অতিপরিচিত অতি-সরল মনে হওয়া বিচিত্র নয়।

বৎসরের পর বৎসর বাংলার শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের প্রবাহের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার অভিজ্ঞতায় এক পরম সম্পদ। অগ্রণী তরুণ বন্ধুদের বুদ্ধিদীপ্ত মুখ ও প্রাণবান উৎসাহ আমার লেখার প্রেরণা ছিল। কৃতজ্ঞতার সামান্য নিদর্শন হিসাবে বইখানি তাদের উৎসর্গ করলাম।

সুশোভন সরকার

সূচীপত্র

সমাজ ও ইতিহাস

সোশালিজ্‌মের মূলসূত্র

আজকের দিনে দেশে দেশে সোশালিস্ট্‌ আন্দোলন যে প্রবল হয়ে উঠেছে শুধু তা নয়, সোশালিস্ট্‌ মতামত আধুনিক সকল চিন্তার উপর বিশাল প্রভাব বিস্তার করছে এ কথাও স্বীকার করতে হবে। সোশালিস্ট্‌ ভাবস্রোতের ঢেউ আজকাল আমাদের দেশেও পৌঁছেছে, যদিও অনেকে এটা নিতান্ত ক্ষোভের কথা মনে করে। বহু চিন্তাশীল শিক্ষিত লোক এ সম্বন্ধে আগ্রহ বা আলোচনাকে পশ্চিমের সস্তা অনুকরণ বলে ব্যঙ্গ করেছেন—এই প্রসঙ্গে প্রাচ্যের ও সর্বোপরি ভারতের বৈশিষ্ট্যের কথাও আমরা প্রায় শুনতে পাই। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা বিদেশ থেকে সাহিত্য, সামাজিক প্রথা, শিক্ষাপদ্ধতি ও রাজনীতি সম্বন্ধে নূতন নূতন মত ও আদর্শ আহরণ করতে কুণ্ঠিত হন না—ভারতবর্ষের সর্বত্র জাতীয়তা-বোধের প্রসারের বিপুল চেষ্টা পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। সোশালিজ্‌মের বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি থাকতে পারে কিন্তু তাকে বিদেশী বলেই বর্জন করার উপদেশ শ্রেণীস্বার্থের সুন্দর উদাহরণ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রত্যেক সভ্যতার বিশেষত্ব আছে—এ কথা নিশ্চয়ই সত্য। বিদেশী আদর্শের অনুকরণ না করার প্রবৃত্তিও অনেক স্থলে প্রশংসনীয়। কিন্তু সকল বিষয়েই যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের পার্থক্য থাকবে এমন কোন কথা বলা চলে না। বর্তমান যুগে সহজ যাতায়াত ও ভাবের নিয়ত আদান-প্রদানের ফলে মানুষের ঐক্য স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। বিজ্ঞান যেমন জাতি ও দেশের সীমা অতিক্রম করে, আর্থিক বিধিব্যবস্থার মূল-সূত্রগুলিও তেমনই আজ সকল দেশে একই রূপ ধারণ করেছে। একই আর্থিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একই পরিণতি আজ সকল সমাজের লক্ষ্য। চীন ও জাপানের প্রাচ্য সভ্যতা তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে নি।

সোশালিজ্‌মের সমস্যা সকল দেশে সমান তীব্র হয়ে না উঠলেও কোন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সে-আলোচনা ও আন্দোলন বন্ধ রাখতে পারবে না।

আমাদের দেশে সোশালিজ্‌মের স্থান যাই হোক না কেন, ইয়োরোপে অন্তত তাকে উপেক্ষা করবার আর উপায় নেই ; গত পঞ্চাশ বছর ধরে তার প্রভাব পাশ্চাত্ত্য জীবনকে আলোড়িত করে তুলছে। পশ্চিমের সাহিত্য ও বাদানুবাদেব মধ্যে সোশালিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে অনেক তর্কই আমরা শুনি কিন্তু এই বিবাট আন্দোলনের স্বরূপ ও ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত অল্প। যে-কোন মতবাদের প্রকৃত বিচারের পথে অজ্ঞতা ও অস্পষ্ট ধারণা বিশেষ বাধার সৃষ্টি করে। সোশালিস্ট্‌ চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু পরিচয় দেওয়া তাই আপ্রাসঙ্গিক হবে না।

দুই

বর্তমান যুগে পৃথিবীব প্রায় সর্বত্র যে-আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত বয়েছে সোশালিজ্‌ম্‌ তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এই ব্যবস্থাকে ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ বা ধনতন্ত্র বলা হয়। এর একটি মূলসূত্র বহু প্রাচীন—ব্যক্তিগতভাবে সম্পত্তি ভোগের নিয়ম ও উত্তরাধিকার প্রথা। আর একটি ইতিহাসে খুবই নূতন—গত দেডশ বৎসবেব ভিতব ধনোৎপাদন-প্রণালীব বিপুল পরিবর্তন। প্রায় প্রতি দেশেই ধনোৎপাদনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার মধ্যে শারীরিক পরিশ্রম বা গতব ছাড়া অন্য সবই অতি অল্পসংখ্যক লোকের সম্পত্তি। নূতন আবিষ্কৃত প্রণালীগুলি আবার ধনী ভিন্ন অন্যদেব আয়ত্তের বাইরে। ফলে এখন সমাজে দুটি প্রধান স্তর দেখা যায়। একদিকে অল্প-সংখ্যক ধনিকের হাতে সমস্ত আর্থিক ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, সকল ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভ পায় তারাই, দেশে তারাই প্রকৃত প্রভু। অন্যদিকে অসংখ্য শ্রমজীবীর দল, তারা পরিশ্রমেব পরিবর্তে যে-সামান্য মজুরি পায় তাতে হয়তো কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন চলে কিন্তু সে-টুকুর জন্যও তাদের নির্ভর করতে হয় ধনিকদের উপর। সমাজের অন্য অন্য অংশগুলি এই দুই মুখ্য

শ্রেণীর সঙ্গে সংযুক্ত—তাদের স্বার্থ ধনিক কিংবা শ্রমিকের স্বার্থের সঙ্গেই বিজড়িত।

ধনিকদের প্রভুত্ব এবং ধনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে এই বিরাট প্রভেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিছু নূতন নয়। ইংল্যাণ্ডে ধনতন্ত্রের প্রারম্ভে অনেক সহৃদয় লোক তার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন—তাঁদের মনে হয়েছিল যে, দেশের পূর্বতন একতা চূর্ণ করে ধনিক ও শ্রমিকের বিরোধ স্ফুট করে তুললে একই দেশে যেন দুটি বিভিন্ন জাতি গড়ে উঠবে। সম্প্রতি ইয়োরোপে ফাশিজ্‌ম্‌ও সমাজের মঙ্গলের জন্য ধনিকদের স্বেচ্ছাচারে বাধা দেবার কথা তুলেছে। আমাদের দেশেও ক্যাপিটালিজ্‌মের বিরুদ্ধে আপত্তি বিরল নয়—সনাতন আর্থিক বিধিব্যবস্থা অনুসরণের উপদেশ এবং যন্ত্র-সভ্যতার অমানুষিকতা ও সৌন্দর্যহীনতার আলোচনায় আমরা অভ্যস্ত।

কিন্তু এই ধরনের আপত্তি ও সোশালিজ্‌মের ভিতর অনেক পার্থক্য আছে। উপরে যাঁদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা যন্ত্রের বহুল প্রচার ও ধনিকদের নির্মম ও যথেচ্ছ ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তিভোগের উপর সমাজপ্রতিষ্ঠা তাঁদের কাছে স্বাভাবিক ও ন্যায্য মনে হয়। সোশালিস্ট্‌রা কিন্তু যন্ত্রপাতির বিরোধী নয় কেননা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া অল্প আয়াসে ও অল্প সময়ের মধ্যে ধনোৎপাদন অসম্ভব এবং নূতন পদ্ধতিগুলি পরিত্যাগ করলে মানুষের দারিদ্র্য বা শ্রমভার লাঘবের অন্য উপায় থাকে না। তাদের মতে ধনতন্ত্রের অমঙ্গলের মূল কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগের অধিকার, যন্ত্রের ব্যবহার নয়; তবে আধুনিক যান্ত্রিক যুগে নূতন ধনোৎপাদন-প্রণালীগুলি ব্যয়সাধ্য বলে ধনিকের প্রতাপ প্রচণ্ডতর হয়ে উঠেছে। ধনোৎপাদনের জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় সে-সমস্ত সাধারণের সম্পত্তি হলে অন্যায়, অত্যাচার, দারিদ্র্য ও দাসত্ব অসম্ভব হবে, এই বিশ্বাস সোশালিস্ট্‌দের মজ্জাগত।

এই নিয়মের অভাবেই ধনতন্ত্রকে অসীম অমঙ্গল ও অশেষ দোষের আকর বলে সোশালিস্ট্‌রা মনে করে। ধনতন্ত্র প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত,

এখানে সকলেরই উদ্দেশ্য অপরকে অতিক্রম করে বড় হওয়া। ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্পর্কের বদলে কর্মক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাতই বড় হয়ে দেখা দেয়—আর তার সঙ্গে থাকে অজস্র অপচয়। ধনতন্ত্র পুষ্টিলাভ করলে অবশ্য প্রতিযোগিতা হ্রাস পায়, কিন্তু তখন আবার অল্পসংখ্যক ধনিকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে দেশের সমস্ত আথিক জীবন নিজেদের করায়ত্ত করে ফেলে। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক দেশে বা সমাজে স্বদেশী ও বিদেশী ধনিকের আধিপত্য স্থাপিত হয়—নিতান্ত অল্পসংখ্যক লোকের হাতে থাকে প্রভুত্ব আর জনসাধারণকে জীবিকা নির্বাহের জন্য নির্ভর করতে হয় তাদের উপর। আজকাল অনেক লোকে অর্থ সঞ্চয় করে বটে কিন্তু সে-অর্থ ধনিকের ধনোৎপাদনের কাজেই লাগে ধনিকদেরই ইঙ্গিতে। আথিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে দেশের সঞ্চিত অর্থ যায় শুধু সেই সব দিকে যেখানে ধনিকদের প্রভূত লাভের সম্ভাবনা—সমাজের কল্যাণ বা জনসাধারণের উন্নতি লক্ষ্য হিসাবে নিতান্তই গৌণ হয়ে থাকে। জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও মঙ্গলকে খর্ব করে মুখ্যত অল্পসংখ্যক লোকের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যবসাবাণিজ্য-পরিচালন ধনতান্ত্রিক সমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সাবেকি অর্থশাস্ত্রের যুক্তি ছিল এই যে, প্রত্যেক লোকেরই কিসে নিজের মঙ্গল হবে তা স্থির করে সেই মতো কাজ করবার শক্তি ও সামর্থ্য আছে ; ফলে সমষ্টির কল্যাণ আপনা হতেই সাধিত হয়ে যায়। আধুনিক ইতিহাস কিন্তু সাক্ষ্য দেবে যে, এই মত আসলে ভিত্তিহীন। কর্মক্ষেত্রে সাধারণ লোকের স্বাধীনতা বা আত্মরক্ষার উপায়ের বস্তুত কোন অস্তিত্ব নেই। সেই জন্য ধনিকদের অপর্যাপ্ত লাভের দিনেও কখনও শ্রমজীবীদের দারিদ্র্য ঘোচে না আর ব্যবসায় ক্ষতির সময় বেকারসংখ্যা বেড়ে চলে। ধনিক যুগের ফ্যাক্টরি-জীবনকে দাস-প্রথার নূতন রূপ বলে গণ্য করা চলে। যে-সমস্ত বিদ্যা বা বৃত্তির অনুশীলন মানুষের প্রধান সম্পদ, বর্তমানের আথিক ব্যবস্থায় দরিদ্রেরা তাতে বঞ্চিত। অল্প কয়েকজন অবস্থাপন্ন ভাগ্যবানই এই জীবনে অধিকারী। কিন্তু তাদের আরাম-অবসর, সুখস্বাচ্ছন্দ্য, পরিশীলনসম্পদ সমস্ত নির্ভর করছে অপরের শারীরিক পরিশ্রমের

উপর। অবশ্য জীবনে উৎকর্ষলাভ সকলের স্বভাবগত অধিকার না হতে পারে, কিন্তু সে-অধিকার কেবলমাত্র অবস্থাপন্ন লোকের আয়ত্তে থাকবে, এ কথা মেনে নেওয়া শক্ত। পৃথিবীতে প্রভু ও ভৃত্যশ্রেণীর প্রভেদ স্মরণাতীত কাল থেকে চলে আসছে বটে কিন্তু কেন চলবে এ প্রশ্নের উত্তর খুব সন্তোষজনক নয়। এই প্রশ্ন থেকেই সোশালিজ্‌মের উৎপত্তি।

তিন

সমাজের সমস্যা নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন তাঁদের প্রায় সকলের কাছেই ক্যাপিটালিজ্‌মের দোষগুলি সুস্পষ্ট। কিন্তু তাঁদের অনেকেরই বিশ্বাস যে, দেশে গণতন্ত্র পূর্ণভাবে স্থাপিত হলে সংখ্যাধিক দরিদ্রেরা ভোটের ক্ষমতা ব্যবহার করে অনায়াসে ধনিকদের প্রভুত্বকে খর্ব করতে পারবে। এই কারণে সমাজের আমূল পরিবর্তনের জন্য সোশালিস্ট্‌ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অস্বীকার করেন। গত শতাব্দীতে বিশেষ করে গণতন্ত্রই সকল প্রশ্নের সমাধান করবে. এইরকম একটা বিশ্বাস সর্বত্র প্রচলিত ছিল—আমাদের দেশে বোধ হয় এই মত এখনও অবিচল।

সোশালিস্ট্‌দের কাছে এ ধারণা ভ্রান্ত বলে গণ্য হয়। পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রেণীভেদের হ্রাসের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ধনিকের তুলনায় শ্রমিকের আর্থিক অবস্থার উন্নতিও ডিমক্র্যাসি আজ পর্যন্ত করে উঠতে পারে নি। এর কতকগুলি কারণ নির্দেশ করা সম্ভব।

সহস্র দুঃখভোগ সত্ত্বেও সাধারণ লোকে যে পলিটিক্সের প্রতি উদাসীন, নিজেদের অবস্থার প্রতিকার সম্বন্ধে অজ্ঞ ও আপন শক্তিতে আস্থাহীন, এ কথা নিশ্চয়ই সত্য। ভোটের অধিকার থাকলেও তারা মতামতের জন্য অপরের উপর নির্ভর করে। তথাকথিত উন্নত দেশগুলিতেও জনমত গঠনের প্রধান উপায় হচ্ছে সংবাদপত্র। যে-সমস্ত সস্তা চাকচিক্যময় সংবাদপত্র পড়ে জনসাধারণ কোন ব্যাপারে নিজেদের মন স্থির করে, তার পিছনে রয়েছে অজস্র মূলধন ; সঙ্গে সঙ্গে ধনিকের স্বার্থ জড়িত—সত্যগোপন তাদের ব্যবসা।

সমাজে ধনিক কর্তৃত্ব থাকার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ও নিম্নস্তরে শিক্ষা-পদ্ধতিরও উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে, প্রচলিত বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে কারো মনে যেন প্রশ্ন না জাগে। যেখানে কোন পুরাতন সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মের প্রতাপ প্রবল সেখানেও ফল একই। ইহজগতের সমস্যা উপেক্ষা করে পরলোকে আত্মার কল্যাণে মন নিবিষ্ট করা; দৈনন্দিন তুচ্ছতা থেকে আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি ফেরানো; পৃথিবীর সকল অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার মৃত্যুর পরপারে নির্দিষ্ট থাকে, এই বিশ্বাসের প্রচার—প্রায় সকল ধর্মেরই এইগুলি সাধারণ লক্ষ্য। ধর্মশিক্ষার ফলে লোকে সমাজে নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করাও অন্যায় মনে করে। ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও আবার সাধারণত ধনিকদের উপর নির্ভর করতে হয়। সোশালিস্ট্‌দের ধারণা এই যে, দেশে ডিমক্র্যাসি থাকলেও সংবাদপত্র, লোকশিক্ষা ও ধর্মমতের সম্মিলিত শক্তি জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখতে পারে। তা ছাড়া ভোটের অধিকার কয়েক বৎসর পর পর একবার কাজে লাগে—অজ্ঞতা ও সাময়িক উত্তেজনায় ভোটারের মন ঠিক সেই সময় আচ্ছন্ন থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু প্রতিদিন সাধারণ লোককে যে-জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হচ্ছে তার মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার নিদর্শন কোথায়? আর্থিক সমতা আনতে হলে সেইজন্য গণতন্ত্র স্থাপনেই সন্তুষ্ট হলে চলবে না, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংঘবদ্ধভাবে নূতন আদর্শ লোকসমাজে প্রচার করা প্রয়োজন। এই বিশ্বাসই সোশালিস্ট আন্দোলনের ভিত্তি।

চার

সোশালিজ্‌ম্‌ যে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান, একথা বোঝা সহজ কিন্তু যে-নূতন সমাজগঠন তার আদর্শ সে-সমাজের বৈশিষ্ট্য কি সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার অভাব আছে। সোশালিস্ট্‌রা নানা দলে বিভক্ত সুতরাং তাদের মধ্যেও মতভেদ স্বাভাবিক। অনেকে আবার সোশালিস্ট্‌ নাম গ্রহণ করেও সে-আদর্শের সকল দিক পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করে না। সোশালিস্ট্‌দের আচরণের কথা ছেড়ে দিয়ে এখন বিশুদ্ধ মতবাদটির মূলসূত্রগুলির উল্লেখ করতে হবে।

ইতিহাসের সকল যুগে সমাজের মধ্যে একটা স্তরভেদ পাওয়া গেছে—এই বিভিন্ন অংশগুলিকে শ্রেণী আখ্যা দেওয়া হয়। শ্রেণীর স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে কিন্তু তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। মানুষের ইতিহাসে আমরা সাধারণত জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধের কথাই বিচার করি কিন্তু তার থেকেও বড় কথা বোধ হয় এই শ্রেণীর সমস্যা কেননা সাধারণ লোকের স্বার্থ ও মঙ্গল এর সঙ্গে জড়িত। শ্রেণীভেদের অর্থই এই যে বিভিন্ন স্তরের স্বার্থের মিল থাকে না; কাজেই শ্রেণীসংঘর্ষ সমাজের চিরন্তন প্রথা। সেইজন্য সমাজকে স্থিতিশীল করতে হলে শ্রেণীবিশেষের আধিপত্য আবশ্যক। অথচ যাদের উপর এই কর্তৃত্ব তাদের পক্ষে এ প্রভুত্ব মেনে চলা সহজ নয়। সোশালিজ্‌মের প্রধান কথা এই যে, সমাজ থেকে অত্যাচার, দ্বন্দ্ব ও অশান্তি নির্বাসিত করতে হলে শ্রেণীভেদ নির্মূল করতে হবে—ভবিষ্যতের মানব সমাজ গঠিত হবে মাত্র একটি বিরাট শ্রমিকসমষ্টিকে নিয়ে। বার্ণার্ড্‌ শ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ধনসাম্য চেয়েছেন কিন্তু উত্তরাধিকার-প্রথা উঠে গেলে শ্রেণীগত বৈষম্যের উচ্ছেদই যথেষ্ট মনে হয়। এর প্রধান উপায় হচ্ছে এই নূতন নিয়ম প্রবর্তন যে, ধনসৃষ্টির সকল উপাদান (ভূমি, মূলধন, যন্ত্রপাতি, খনিজ পদার্থ, শক্তির উৎস, যাতায়াতের ব্যবস্থা ইত্যাদি) সাধারণের সম্পত্তি হবে। এগুলির ব্যবহার ও পরিচালন-পদ্ধতি সম্বন্ধে সোশালিস্ট্‌দের মধ্যে কোন স্থির মত পাওয়া যায় না, কিন্তু এদের উপর যে ব্যক্তিবিশেষের অধিকার অস্বীকার করতে হবে সে-সম্বন্ধে তাদের মধ্যে অনৈক্যের লেশমাত্র নেই। পশ্চিমে রাষ্ট্রীকরণের যে-আন্দোলন চলছে তার উদ্ভব এই বিশ্বাসের থেকে। এ কথা সহজেই বোঝা যায় যে, উপরোক্ত জিনিসগুলি কয়েকটি লোকের সম্পত্তি বলেই তারা দেশের সমস্ত আর্থিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

সোশালিজ্‌মের আর একটি মূলসূত্র হচ্ছে দারিদ্র্যের অপসারণ। শ্রেণীবিভাগ উঠে গিয়ে যদি সকল মানুষের সমান অভাব হয় তবে আর যাই হোক তাকে নূতন সমাজ ও নবসভ্যতা বলা চলবে না। লেনিন অবশ্য

বলেছিলেন যে, কোনও লোকের বাহুল্য ভোগ করবার উপায় রাখার আগে প্রত্যেকের যা অত্যাবশ্যকীয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু সোশালিস্ট্‌দের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যন্ত্রবিজ্ঞানের সাহায্যে এখনকার অপেক্ষাও কম সময়ে ও পরিশ্রমে সকলের আরামে থাকার মতো ধন উৎপন্ন করা সম্ভব। দারিদ্র্যের কারণ মানুষের শক্তির অভাব নয়—আসলে ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তিগত অধিকার ও তাদের লাভের জন্য ইচ্ছামত ধনোৎপাদন ইত্যাদি সমাজের আর্থিক ব্যবস্থাগুলিই অভাব সৃষ্টি করে।

এই প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি কথা স্মরণ রাখতে হবে। সোশালিজ্‌মের আদর্শে উত্তরাধিকার-প্রথার স্থান নেই, কিন্তু তার পরিবর্তে প্রত্যেকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও জীবিকানির্বাহের ব্যবস্থার জন্য সমাজের দায়িত্ব স্বীকৃত হয়েছে। আর্থিক সমতার সঙ্গে সঙ্গে সকলের অবসরের অধিকার, শিক্ষার সমান সুযোগ ইত্যাদি কতকগুলি ধারণা এই মতবাদের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। সোশালিস্ট্‌ সমাজ সম্পূর্ণভাবে গঠিত হবার পর ব্যক্তিবিশেষের অধিকার থাকবে না অথচ সুব্যবস্থার ফলে প্রত্যেকের পক্ষেই আপনার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হয়ে উঠবে এই আশা করা হয়। সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ও সুকুমার বৃত্তিগুলি হয়তো তখন আর অল্প লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না।

সোশালিজ্‌ম্‌ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিত্ববাদের পরিপন্থী নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে মাত্র কতকগুলি লোকেরই ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভবপর—নূতন ব্যবস্থাতে জনসাধারণের পক্ষেও সে-পথ প্রথম উন্মুক্ত হবে।

সোশালিস্ট্‌ আদর্শের আর দুটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা যেতে পারে। তার মধ্যে একটি এই যে, সমাজের আর্থিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করবার ভার থাকবে জনসাধারণের উপর—গণতন্ত্রের মূলসূত্র শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকবে না, প্রাত্যহিক কর্মজীবনেও তাকে প্রচলিত করতে হবে। কি উপায়ে যে এই আদর্শ কার্যকরী হতে পারে সে-সম্বন্ধে সোশালিস্ট্‌দের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে কিন্তু সকল সম্প্রদায়েরই এক বিশ্বাস যে, অন্তত নূতন সমাজ গড়ে উঠবার পর এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না। এক অশেষপরাক্রান্ত শাসকের

ইঙ্গিতে শ্রেণীভেদ ও দারিদ্র্যের অবসান কল্পনায় সম্ভব হলেও তাকে পূর্ণ সোশালিজ্‌ম্‌ আখ্যা দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত, সোশালিজ্‌ম্‌ এক দেশের ব্যাপার নয়। ধনতন্ত্রের কল্যাণে এখন সমস্ত পৃথিবী এক সূত্রে যুক্ত, একই আর্থিক ব্যবস্থার অন্তর্গত। ভবিষ্যতে আর্থিক স্বাতন্ত্র্য আর কোনও জাতির পক্ষে সম্ভব নয়। একটি দেশে সোশালিজ্‌ম্‌ সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগে সেইজন্য অন্তত অন্য প্রধান দেশগুলিতে তার সূত্রপাত আবশ্যক। স্বাদেশিকতার মোহ কাটিয়ে ওঠা প্রকৃত সোশালিস্টের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। এ সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য সমস্ত বিশ্বকে স্বদেশ ভাবা ছাড়া অন্য পন্থা নেই।

পাঁচ

সোশালিজ্‌ম্‌ সম্ভব কি অসম্ভব সে-বিচার বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু বিরোধী কয়েকটি যুক্তি ও সেগুলি খণ্ডনেব চেষ্টার উল্লেখ না করলে তার পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

অনেকে মনে করে সোশালিজ্‌ম্‌ সহৃদয় দুর্বল লোকের দিবাস্বপ্ন মাত্র। এক সময়ে এ বর্ণনার মধ্যে কিছু সত্য ছিল কিন্তু এখন আন্দোলনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সে-যুগ শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া মানুষের চিন্তারাজ্যে সাম্যভাব অতি প্রবল—যুগে যুগে তার প্রসার হয়ে এসেছে। ধর্মপ্রবর্তকেরা প্রথম ভগবানের কাছে ধনী নির্ধন উচ্চ নীচ সকল মানুষের সমভাবের কথা প্রচার করেন। ফরাসী বিপ্লবের পর পোলিটিকাল সাম্যের আদর্শ জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর্থিক সমতা আনবার চেষ্টা করে সোশালিজ্‌ম্‌ সেই একই ভাব-ধারাকে পূর্ণরূপ দিচ্ছে বলা যেতে পারে।

সমাজে ধনিককর্তৃত্ব ও শ্রমিকের দাসত্ব অনেকের কাছে সম্ভবত অমূলক মনে হয়। এই বিশ্বাস সত্য হলে অবশ্য সোশালিজ্‌মের কোন আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু প্রতিকারের উপায় যদি বা থাকে তবু শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা তর্কে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। শ্রমজীবিদের অবস্থা যে বিশেষ উন্নত

হয়েছে একথা বলাও শক্ত ; হয়ে থাকলে শ্রমিক আন্দোলনই তার মুখ্য কারণ। রাষ্ট্রশক্তির নিরপেক্ষ বিচারে অবিশ্বাসী সোশালিস্ট্‌দের যুক্তি এই যে, শাসকসম্প্রদায় যে তাদের শ্রেণীগত স্বার্থ পরিহার করতে পারবে তার স্থিরতা কোথায় ? অসন্তোষ থাকলে আন্দোলনও অবশ্যম্ভাবী।

এ অভিযোগও শুনতে পাওয়া যায় যে, সোশালিজ্‌ম্‌ ক্ষুদ্র স্বার্থ, ঈর্ষা ও সাংসারিক বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত। কিন্তু ধনতন্ত্রের ব্যবস্থার মধ্যে নিঃস্বার্থতার কোন প্রমাণ পাওয়া দুর্লভ। শ্রেণীস্বার্থ যদি নিছক কল্পনাপ্রসূত না হয় তবে এই সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করাই শ্রেয়—মায়া ও মোহের আবরণ এ ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের আত্মরক্ষার উপায় মাত্র। ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থত্যাগের উদাহরণ বিরল নয় বটে কিন্তু সোশালিস্ট্‌দের বিশ্বাস যে, একটি সমগ্র শ্রেণীর স্বতঃ-প্রবৃত্তভাবে স্বার্থবিসর্জনের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

সোশালিজ্‌ম্‌ অস্বাভাবিক ও প্রকৃতির নিয়মের বিরোধী এই বিশ্বাস খুবই সাধারণ। কিন্তু মানুষের স্বভাব বলে একটা অপরিবর্তনীয় চিরন্তন পদার্থ আছে কিনা বিবেচ্য। যুগে যুগে মানবচরিত্র ও লোকমত যে ঠিক অবিকৃত থেকে যায় এ কথা বলা চলে না। প্রচার, শিক্ষা, নেতৃত্ব ইত্যাদির সাহায্যে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সোশালিস্ট্‌দের কাছে দুরূহ মনে হয় না। তারা বলে যে, ইয়োরোপে মধ্যযুগ ও আধুনিক কালের মধ্যে মতামতের বিপুল পার্থক্য তাদের এই আশার সমর্থন করে।

সোশালিস্ট্‌ আন্দোলনের বিরুদ্ধে শেষ আপত্তি এই যে, এতে এক অমঙ্গলের বদলে আসবে আর এক অমঙ্গল, শেষ পর্যন্ত নূতন ব্যবস্থাতে মানুষের কোন স্থায়ী কল্যাণ হবে না। ভবিষ্যত অজ্ঞেয় ; সুতরাং এ কথা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা অসম্ভব। যাঁরা অনিশ্চিতের ভয়ে প্রচলিত বিধিব্যবস্থা শ্রেয় মনে করেন তাঁদের পক্ষে এই যুক্তি অকাট্য। কিন্তু দুই ধরনের লোক এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। এক, যাদের, মার্ক্সের ভাষায়, পৃথিবীতে শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই ; অপর, যাদের চিন্তা বরাবরই দুঃসাহসিক।

॥ পরিচয় : শ্রাবণ, ১৩৩৯ (১৯৩২) ॥

ইল্ ফাশিস্মো

আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে যে-দুইটি মাত্র স্বাধীন রাজ্য এখনও আত্মরক্ষা করছে তার মধ্যে অন্যতম—ইথিওপিয়া অথবা আবিসীনিয়া আজ বিশেষ বিপন্ন। ফাশিস্ট্ ইটালির সাম্রাজ্যবিস্তারের জালে আবিসীনিয়া সম্প্রতি জড়িয়ে পড়েছে—পূর্ব আফ্রিকার এই কোণে খণ্ডযুদ্ধ বোধ হয় এখন অনিবার্য, এবং ইটালির সামরিক সজ্জা ও শক্তি যে ইথিওপিয়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পক্ষে বিশেষ ভয়ের কারণ তারও সন্দেহ নেই। অসহায় আবিসীনিয়ার প্রতি সহানুভূতি নানা দিকে প্রকাশ পাচ্ছে, বিশেষত প্রাচ্য জাতিদের মধ্যে এই মনোভাব নিশ্চয়ই স্বাভাবিক। এই উপলক্ষে সম্প্রতি আমাদের দেশে মুসোলীনিপ্রীতি অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। বহুদেববাদ আমাদের মজ্জাগত—তাই একই নিঃশ্বাসে মুসোলীনি, হিট্‌লার, লেনিন, স্টালিন, কামাল পাশা, রেজা খাঁ, সুন ইয়াৎ-সেন, মহাত্মা গান্ধী সকলকেই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে আমাদের বাধে না। কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাসে যে-বিভিন্ন মতবাদ ও চিন্তাধারার প্রতীক হিসাবেই ব্যক্তিবিশেষের স্থান প্রধানত নির্ধারিত হচ্ছে, অনেক সময় আমরা ব্যক্তিত্বের মোহে মুগ্ধ হয়ে তাদের প্রতি উদাসীন থাকি। আবিসীনিয়ার ব্যাপারে ইটালির যে-মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তার সঙ্গে ফাশিস্মো বা ফাশিজ্‌মের নিগূঢ় সম্বন্ধ ও অঙ্গাঙ্গি যোগ বিদ্যমান রয়েছে একথা ফাশিস্ট্ চিন্তা ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যার পরিচয় আছে সে-ই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবে।

ফাশিস্ট্ প্রভাব শুধু ইথিওপিয়ার ব্যাপারে সীমাবদ্ধ নয়, বর্তমান আন্তর্জাতিক সঙ্কটেরও একটি প্রধান কারণ ফাশিস্ট্ রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক নীতি। যে-তিনটি মহাশক্তির আচরণে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা সম্প্রতি অনেক বেড়েছে, তার মধ্যে ইটালি ফাশিস্মোর জন্মভূমি, জার্মানির নাৎসি দলকে

ফাশিস্ট্ পর্যায়েই গণ্য করা হয়, এমন কি জাপানের শাসকদেরও ফাশিস্ট্ ভাবাপন্ন বলা যেতে পারে। অবশ্য এই তিনটি জাতিই নিজেদের বঞ্চিত মনে করে; আধুনিক জগতে কর্তৃত্বের যে ব্যবস্থা ও ঐশ্বর্য ভাগ-দখলের যে-বন্দোবস্ত রয়েছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড্ কিংবা ফ্রান্সের তাতে আপত্তির কোন কারণ নেই। আবার জাপান, জার্মানি ও ইটালি তা নিয়ে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। কিন্তু অন্যায় ব্যবস্থা কিংবা অসহ্য দুরবস্থা এই রাষ্ট্রত্রয়ের আস্ফালনের আসল কাবণ নয়। পৃথিবীতে বঞ্চিত জাতির অভাব নেই, তাদের অধিকাংশই শান্তভাবে জীবন যাপন করে। মহাশক্তিদের মধ্যেও মহাযুদ্ধের পর রাশিয়াকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল অথচ আভ্যন্তরিক সংগঠনে মনোনিবেশই সোভিয়েট রাষ্ট্র যুক্তিসঙ্গত বলে মেনে নিয়েছে। লোকসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি জাপান, জার্মানি ও ইটালির রাজ্য-বিস্তাব-প্রচেষ্টার কারণ রূপে নির্দেশ করা হয়, কিন্তু একদেশেব জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে গেলে অন্যদেশবাসীদেব তার ভার বহন করতে হবে এ যুক্তিও নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত বলা চলে না। প্রাক্-ফাশিস্ট্ যুগের জার্মানি ভের্সাই-এর ব্যবস্থার শত প্রতিবাদ সত্ত্বেও সন্ধিভঙ্গ কিংবা যুদ্ধের আয়োজন করে নি। আসল কথা, অস্ত্রশক্তির উপাসনা ফাশিস্‌মো গৌরবময় ও মঙ্গলজনক বলেই সর্বদা প্রচার করে এসেছে এবং বিশ্বরাষ্ট্রসংঘকে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করে ফাশিস্ট্ রাষ্ট্রগুলিই সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সমস্যাকে জটিলতব করে তুলছে।

উপনিবেশ প্রসারের চেষ্টা কিংবা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে সামরিক মনোভাব কিন্তু ফাশিস্‌মোর প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়; ফাশিজ্‌মের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব থেকে ইতিহাসে এদের দেখা পাওয়া যায়। ফাশিস্ট্ মতবাদের আসল বিশেষত্ব খুঁজতে গেলে রাষ্ট্রের নূতন স্বরূপ কল্পনার এবং সমাজের আর্থিক সমস্যা সমাধানের নবপ্রচেষ্টার কথাই প্রথমে বিচার করা উচিত। ইয়োরোপ এমন কি সমস্ত জগতের আধুনিক ইতিহাস ফরাসী বিপ্লব ও পণ্যোৎপাদন-পদ্ধতির বিশাল পরিবর্তনের সময় থেকে আরম্ভ করা হয়। গত দেড়শ বছরের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে আমরা দুটি

চিন্তাস্রোতের পরিচয় পাই। তার মধ্যে একটির আরম্ভ অষ্টাদশ শতকের উদারনীতিতে এবং তার পরিণতি বর্তমান গণতন্ত্রের আদর্শে। অন্যটিকে সোশালিজ্‌ম্ বা সমাজবাদ আখ্যা দেওয়া হয়; তার মধ্যে অনেক শাখা-প্রশাখা আছে—সেগুলি সোশাল ডিমক্র্যাসি এবং সাম্যবাদ বা কমিউনিজ্‌ম্ এই দুই পৃথক মতবাদে ভাগ করা চলে। উদারনীতি ও গণতন্ত্র, সোশাল ডিমক্র্যাসি ও সাম্যবাদ, আধুনিক ইতিহাসের এই বিশেষ চিন্তার ধারাগুলি আজকের দিনে অপেক্ষাকৃত পুরাতন। এদের তুলনায় ফাশিস্‌মো অত্যাধুনিক—এর বয়স পনের বছরের বেশী নয়। ফাশিস্ট্‌দের প্রধান দাবি এই যে তাদের নূতন আন্দোলন ও নববিধান ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। ইয়োরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁস, প্রটেস্টাণ্ট্ ধর্মসংস্কার, ফরাসী বিপ্লব ইত্যাদির সমতুল্য স্মরণীয় ঘটনা হিসাবে ফাশিস্‌মোর আবির্ভাবকে দেখতে হবে—ফাশিস্ট্‌দের এই দৃঢ় বিশ্বাস। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শৃঙ্খল থেকে পৃথিবীকে মুক্তি দিয়ে ইতিহাসের নূতন যুগ নাকি আরম্ভ হচ্ছে—বিংশ শতাব্দী উনবিংশ শতকের পুরাতন ধারণাগুলিকে বর্জন করে নূতন আদর্শে গড়ে উঠবে, ফাশিস্ট্ প্রচারের এই হল গোড়ার কথা।

থিওরি হিসাবে ফাশিস্‌মোর কিছু পরিচয় এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রথমেই একটু বিপদ আসে—গণতন্ত্র এবং সাম্যবাদ যেমন সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত, ফাশিস্ট্ মতবাদে তার অনুরূপ শৃঙ্খলা পাওয়া যায় না। এর কারণ বলা হয় যে ফাশিজ্‌ম্ কর্মপ্রধান, সুসম্বদ্ধ থিওরিগঠন তার লক্ষ্য বা কাজ নয়। আর একটি কথাও স্মরণযোগ্য—জাতীয় ভাবের উপর ভিন্ন ভিন্ন দেশের ফাশিস্ট্ আন্দোলন নির্ভর করে বলে তাদের পার্থক্য বেশী চোখে পড়ে; ইটালির বেলা যে-কথা প্রযোজ্য জার্মানির সম্বন্ধে তার সমস্তটা না খাটতে পারে। তবুও ফাশিস্‌মোর সকল দেশেই একটা বিশিষ্ট রূপ আছে এবং মতবাদ হিসাবে তার বর্ণনা অসম্ভব নয়। ইটালির দার্শনিক জেন্টিলে ফাশিস্‌মোর বিবরণ দিয়েছেন, তিন বছর আগে মুসোলীনি পর্যন্ত ইটালির এক বিশ্বকোষে এর মূল ধারণাগুলির পরিষ্কার ব্যাখ্যা করেছেন। জার্মানিতে

হিট্‌লার তাঁর আত্মজীবনীতে নিজের চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, ভ্যান্‌ডেয়ার ব্রুক, স্টাপেল, রোজেন্‌বার্গ্‌ প্রমুখ নাৎসি প্রচারকদের লেখায় ফাশিস্‌মোর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পেয়েছে। অবান্তর নানা কথা বাদ দিয়ে সেই বৈশিষ্ট্যের দিকেই আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে।

দুই

ঐতিহাসিক পরম্পরার দিক থেকে দেখতে গেলে ফাশিস্‌মোর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সোশালিজ্‌মের বিরুদ্ধাচরণ। মুসোলীনি অবশ্য প্রথম জীবনে চরমপন্থী সোশালিস্ট্‌ হিসাবেই খ্যাতিলাভ করেন এবং ইটালির ফাশিস্ট্‌রা পুনর্গঠিত শ্রমিকসংঘগুলিকে নিজেদের করায়ত্ত করবার পর রাষ্ট্রের নূতন ব্যবস্থাবিধিতে তাদের স্থান অস্বীকার করে নি। এ কথাও সত্য যে হিট্‌লার নিজের দলকে ন্যাশনাল সোশালিস্ট্‌ নামে অভিহিত করেছেন এবং নাৎসিদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের ধনতন্ত্র বা ক্যাপিটালিজ্‌মের শত্রু মনে করে। কিন্তু ফাশিজ্‌ম্‌ যে সম্পূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী এ বিশ্বাস বর্জন করবার কোন বৈধ কারণ নেই।

ইটালি ও জার্মানি উভয় দেশেই সোশালিজ্‌ম্‌ প্রচারের পথ রুদ্ধ করাই ফাশিস্ট্‌ আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং সে-কাজে অন্তত সাময়িক সাফল্য লাভই এখন পর্যন্ত ফাশিজ্‌মের প্রধান কৃতিত্ব বলে গণ্য হচ্ছে। দুই দেশেই সোশালিস্ট্‌দের সঙ্গে সংঘর্ষ ও তাদের ক্ষমতার উচ্ছেদসাধন ফাশিস্ট্‌ ইতিহাসের সব চেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। জাপানে সোশালিজ্‌ম্‌ ও শ্রমিক আন্দোলনকে পদদলিত করাই ফাশিস্ট্‌ ভাবাপন্ন শাসকদের লক্ষ্য—জাতীয়তার মূলমন্ত্র জাপানে এ জন্যই প্রচণ্ডভাবে প্রচারিত হচ্ছে। পৃথিবীর অন্যত্র যে যে দেশেই ফাশিস্ট্‌ আন্দোলন মাথা তুলেছে সর্বত্রই এই একই উদ্দেশ্য দলগঠনের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পর্টুগাল, অস্ট্রিয়া ইত্যাদি সকল দেশের ফাশিস্ট্‌দের সমস্ত বাহ্যিক পার্থক্য সত্ত্বেও প্রধান মিল এইখানে।

শুধু আচরণেই এই সোশালিস্ট্-বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে এও নয়—বিশ্বাস ও মতগত পার্থক্যও এখানে উল্লেখযোগ্য। মার্ক্স্‌বাদের গোড়ার ধারণাগুলি ফাশিস্টেরা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে। মার্ক্সের মতে প্রলেটেরিয়াট বা মজুর শ্রেণীই ভবিষ্যত সমাজগঠনের মূল উপাদান—সুতরাং সামাজিক প্রগতি এ যুগে সেই শ্রেণীর সংঘবদ্ধ আন্দোলনের উপরেই নির্ভর করবে। ফাশিস্‌মো এ বিশ্বাসকে পরিহার করেছে—ফাশিস্টেরা নীতিহিসাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কৃষকদেব মঙ্গলসাধনের দাবি করে। মার্ক্সের প্রধান কথা ছিল এই যে, সমাজ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ও শ্রেণীগত স্বার্থের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী ; এই সংঘাতেব ফলে শ্রেণীভেদ লুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত শ্রেণীসংঘর্ষই ইতিহাসেব মূলসূত্র হতে বাধ্য। ফাশিস্‌মোর বক্তব্য এর বিবোধী—জাতীয় ঐক্যই আদর্শ ও আসল সত্য, এই জাতিগত স্বার্থের মধ্যে শ্রেণীস্বার্থ লোপ পেয়ে সামঞ্জস্যেব রূপ গ্রহণ করে। মার্ক্স্ ইতিহাসকে এক বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন—সেই দৃষ্টিভঙ্গীকে ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা বলা হয়, এতে আর্থিক ব্যবস্থা ও যে-শ্রেণীগত পার্থক্য তার উপর নির্ভর কবছে তাই ইতিহাসেব মূলসূত্র বলে কল্পিত হয়েছে। ইতিহাসের এই আর্থিক ভিত্তিকে ফাশিস্‌মো প্রমাদ বলে গণ্য করে। ফাশিস্ট্ মতে জাতিই (বেস বা নেশন) হচ্ছে ইতিহাসেব প্রধান উপাদান। জাতীয় চরিত্র ও পরাক্রমের স্থান আর্থিক বিধিব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থাব চেয়ে ঢের উঁচুতে এবং রাষ্ট্র বা স্টেট শ্রেণীবিশেষেব আধিপত্যেব যন্ত্র নয়, রাষ্ট্রের একটা নৈতিক স্বরূপ এবং বিশিষ্ট সত্তা আছে। বস্তুত মার্ক্সের সকল মতামতের ভিত্তি ডায়ালেক্‌টিক জড়বাদেব মধ্যে। এই দার্শনিক মত ফাশিজ্‌ম্ সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছে—নানা-জাতীয় আদর্শবাদ বা ভাববাদই ফাশিস্‌মোর অবলম্বন।

এখানে অবশ্য কথা উঠতে পারে যে ফাশিস্টেরা নিশ্চয়ই মার্ক্স্‌বাদের পরিপন্থী, কিন্তু সোশাল ডিমক্র্যাসিব নিরীহতব মতামতের সঙ্গে তাদের বিরোধ কোথায় ? ফাশিস্‌মোর সঙ্গে সোশাল ডিমক্র্যাসিরও মিলন কিন্তু

সম্ভবপর নয়। মতবাদের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সাম্যপন্থার মতন সোশাল ডেমক্র্যাট্‌দেরও আদর্শ হচ্ছে উৎপাদন-পদ্ধতির সকল উপাদানেই সর্বসাধারণের স্বত্বাধিকার। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে কিন্তু ফাশিস্‌মোর অবিচলিত আস্থা আছে। তাই সমাজবাদের সকল শাখার যেখানে মূলগত ঐক্য, সমাজের ভবিষ্যত ব্যবস্থায় সেই সাধারণ স্বত্বের আদর্শের বেলাতেই ফাশিস্‌মোর সঙ্গে এ সমস্ত মতামতের দুস্তর পার্থক্য। কর্মক্ষেত্রেও সোশাল ডিমক্র্যাসির ফাশিস্ট্‌ আমলে কোন স্থান নেই। স্বতন্ত্র শ্রমিকদল গঠন, স্বাধীন শ্রমিকসংঘগুলির অস্তিত্ব, সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যত আদর্শ সম্বন্ধে প্রচারকার্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রথাকে আক্রমণ, এর মধ্যে কোনটিই ফাশিস্ট্‌দের মনোমত হতে পারে না। মার্ক্স্‌পন্থীরাই ফাশিস্‌মোর ঘৃণিত শত্রু হলেও আদর্শনিষ্ঠ সোশাল ডেমক্র্যাট্‌দেরও ফাশিস্ট্‌দের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করবার নেই। ফাশিজ্‌ম্‌ সকল প্রকার সোশালিজ্‌মেরই সম্পূর্ণ বিরোধী।

তিন

ফাশিস্ট্‌ কর্মপদ্ধতির সঙ্গে সাম্যবাদীদের আচরণে যে-সামান্য সাদৃশ্যটুকু লক্ষ্য করা যায় তা নিতান্ত বাহ্যিক। বিপ্লবে বিশ্বাস, নূতন ধরণের বিরাট দল সংগঠন, বিপ্লবের পর একনায়কত্ব স্থাপন, অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ প্রভৃতি বিষয়ে ফাশিস্‌মো ও সাম্যতন্ত্রের মিল দেখা যায় বটে কিন্তু সে-মিল মোটেই গভীর নয়। উদ্দেশ্য, আদর্শ ও বিশ্বাসের বেলায় এই দুই চিন্তাধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পরস্পরের বিশেষত্ব বজায় রেখে সোশালিস্ট্‌ ও ফাশিস্টের মধ্যে মিলন সম্ভব নয়।

কিন্তু গত দেড়শ বছরের ইতিবৃত্তে প্রধান স্থান নিয়েছে উদারনীতি ও গণতন্ত্রের প্রসার; আধুনিক ইতিহাসকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে গেলে এদের তুলনায় সোশালিজ্‌মের প্রভাব এখনও সামান্য। ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে নিয়মতন্ত্রমূলক শাসনপদ্ধতি ও ডিমক্র্যাসির প্রতিষ্ঠাই যুগধর্ম বলে গণ্য

হয়েছে। ডেমক্র্যাটিক মতবাদ অনেক ক্ষেত্রেই সোশালিস্ট্ আদর্শকে গ্রহণ করে নি কিন্তু প্রায় সকল দেশেই বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় গণতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখনও বোধহয় তার প্রভাব অন্য সকল মতবাদের থেকে প্রবলতর। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক মনোভাব অস্বীকার করা ফাশিস্‌মোর প্রথম বৈশিষ্ট্য হলেও এ বিশ্বাসে বিশেষ নূতনত্ব নেই।

গণতন্ত্রের আদর্শেরও প্রতিবাদ এবং উদারনীতি পরিহার ফাশিস্‌মোর দ্বিতীয় বিশেষত্ব। সেই বৈশিষ্ট্য প্রথমটির তুলনায় অপ্রধান হলেও রাষ্ট্র ও সমাজের নূতন পরিকল্পনা হিসাবে এর একটা বিশেষ দাবি আছে। ফাশিস্টেরা যখন নবযুগ প্রবর্তনের কথা বলে তখন তারা গণতন্ত্রের অবসানের উপর খুব জোর দেয়। ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে পৃথিবী যে-পথে চলেছে তার শেষ নাকি ভ্রান্তি ও ধ্বংসের বিভীষিকায়, তার প্রকোপ থেকে ফাশিস্‌মো মানুষ উদ্ধার করবার ব্রত নিয়েছে। বিংশ শতকে সোশালিজ্‌ম্-এর মতন গণতন্ত্রও পরিত্যাজ্য এ কথা ঘোষণা করতে ফাশিস্ট্‌দের ক্লান্তি নেই।

গণতান্ত্রিক নিয়মপদ্ধতিকে অবহেলা ও অগ্রাহ্য করবার উদাহরণ ফাশিস্ট্ আন্দোলনের ইতিহাসে ক্রমাগতই পাওয়া যায়। সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন এবং শাসনযন্ত্র অধিকারের পর বিরোধীদলের স্বাধীনতাহরণ ফাশিস্ট্ কর্মপদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ, সুতরাং নিয়মতন্ত্রের শত্রু হিসাবেই ফাশিস্ট্‌দের গণ্য করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও শুধু আচরণ নয়, মতবাদ ও বিশ্বাসেও ফাশিস্‌মো গণতন্ত্র ও উদারনীতির থেকে স্বতন্ত্র। অল্প বিশ্লেষণেই এ কথা প্রমাণ করা সম্ভব।

সংখ্যাধিকের কর্তৃত্বের অধিকারই গণতন্ত্রের প্রধান কথা। জনসমষ্টির সাধারণ ইচ্ছাকে রুসো ন্যায্যত সমাজের শাসকশক্তি হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, সেই সাধারণ ইচ্ছা নির্ধারণ করবার বৈধ উপায় অবশ্য সংখ্যাধিকের মত গ্রহণ। এই মূলসূত্র নির্ভর করছে এ বিশ্বাসের উপর যে সকল মানুষেরই রাষ্ট্রীয় অধিকার সমান এবং বিধিব্যবস্থার মধ্যে সেই

অধিকার সম্পূর্ণ স্বীকার করাই প্রগতির পথ। এই ধারণাগুলিকে ফাশিস্‌মো যে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করছে এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। ফাশিস্ট্‌ মতানুসারে সকল মানুষের সমান রাষ্ট্রিক অধিকার এবং সংখ্যাধিকের মতে রাজ্যশাসন অন্যায় ও অমঙ্গলজনক, তাতে জাতি বা সমাজের কল্যাণের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় আর দেশের প্রকৃত ইষ্টসাধনের জায়গা নেয় নানাবিধ স্বার্থের অনুসন্ধান ও সংঘাত। এই ভাবে শ্রেণী বা ব্যষ্টির বিরোধের ফলে সমষ্টির প্রভূত অমঙ্গল-সাধন অবশ্যম্ভাবী। অতএব গণতন্ত্রের মূলসূত্রই ভ্রান্ত, তাকে বর্জন করাই উচিত।

জনমতের প্রতিনিধি হিসাবে কোনও পরিষদের শাসনব্যাপারে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব এইজন্য ফাশিস্টেরা স্বীকার করে না। পার্লামেণ্ট্‌-জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয় অক্ষম, নয় অনর্থের হেতু; দেশের শাসনভার তার উপর ন্যস্ত করা মূর্খতার পরিচয় ভিন্ন কিছু নয়। অবশ্য মুসোলীনি ইটালির পার্লামেণ্ট্‌কে সংস্কার করলেও তার উচ্ছেদসাধন করেন নি; আর হিট্‌লার মাঝে মাঝে জার্মান জনগণকে ভোটের মারফত তাঁর প্রতি আস্থা প্রদর্শনের সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে সংখ্যাধিকের প্রভুত্বের অধিকার কিংবা রাজ্যশাসনে প্রতিনিধি-সভার কর্তৃত্ব, এর কোনটিই ফাশিস্‌মোর অঙ্গ নয়। জনমতের প্রতিভূ কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে শাসকদের দায়িত্ব স্বীকার কিংবা জবাবদিহি দেবার কোন প্রয়োজনও ফাশিস্ট্‌ মত গ্রহণ করে না— অবশ্য যখন শাসকেরা ফাশিস্ট্‌ দলের অন্তর্গত তখনই এ অবাধ স্বাধীনতার দাবি ওঠে।

যে-উদারনীতি ইংল্যাণ্ড্‌ ও আমেরিকায় গড়ে উঠেছে তার মূল কথা হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শ। এই মতানুসারে সকল লোকেরই কতকগুলি জন্মগত অধিকার আছে—স্ব-মত প্রকাশের স্বাধীনতা এ-জাতীয় অধিকারের দৃষ্টান্ত। ব্যক্তির স্বতন্ত্র অধিকারগুলিকে ফাশিস্‌মো কিন্তু স্বীকার করে না। ফাশিস্ট্‌ মতে সমাজকে সমষ্টিরূপে কল্পনা করা হয়;—সমাজ ও সমাজের প্রতিভূ রাষ্ট্রের মঙ্গল তাই শুধু কথার কথা নয়, সেই মঙ্গল সাধনের অন্তরায়

হলে ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব করাই উচিত। এই ভাবে উদারনীতির মূল বিশ্বাস-গুলিও ফাশিস্‌মো কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে।

ফাশিস্টেরা অনেক সময় বলে যে গণতন্ত্র ও সমাজবাদ এক-জাতীয় বিশ্বাসেরই প্রকারান্তর। উভয়েই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রকাশ; সমাজের নিজস্ব অস্তিত্ব ও প্রাণকে অস্বীকার করে উভয় মতই সমাজকে শুধু ভিন্ন ভিন্ন লোকের একত্রে অবস্থান হিসাবে দেখেছে। এমন কি সাম্যবাদও নাকি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তির স্বার্থ ও অধিকার স্বীকারেই পর্যবসিত হয়। রাষ্ট্র ও সমাজের পরিকল্পনা ফাশিস্‌মো তাই নূতন ভাবে করতে চেয়েছে। মুস্কিল হয় শুধু এইখানে যে সংখ্যাধিকের মত এবং শ্রেণীস্বার্থের ধারণা ছেড়ে দিলে সমাজের মঙ্গল ও সমষ্টির কল্যাণ নির্ধারণের উপায় কি থাকে? এ প্রশ্নের শুধু একমাত্র উত্তর ফাশিস্‌মোর পক্ষে সম্ভব—সে উত্তর, ফাশিস্ট্‌ ইচ্ছার কাছে সকলের আত্মসমর্পণ।

চার

উদারনীতি, গণতন্ত্র, সোশাল ডিমক্র্যাসি, সাম্যবাদ—এ সমস্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করার অর্থ কি এই যে ফাশিস্‌মো যন্ত্রযুগ ও ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী অবস্থাতে মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়? গত দেড়শ বছরে যে-সমস্ত ধারণা ক্রমে ক্রমে জয়যুক্ত হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তো সকল সময়েই শোনা গেছে—ফাশিজ্‌ম্‌ কি শুধু সেই প্রাচীন প্রতিকূলতার পুনরাবৃত্তি? ফাশিস্টেরা এ কথা স্বীকার করে না—তাদের মতে এ আন্দোলন নূতন উদ্যম, এর মধ্যে নবজীবনের প্রেরণা রয়েছে। ফাশিস্‌মো পুরাতন ব্যবস্থার পুনঃস্থাপনা নয়, প্রগতির পথে সময়োপযোগী নবযুগের সূত্রপাত নাকি এর লক্ষ্য।

ফাশিস্ট্‌ মতবাদ এইজন্য সযত্নে পুরাতন যুগের ধারণাগুলির থেকে নিজের পার্থক্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফরাসী বিপ্লবের আগে ইয়োরোপে প্রায় সর্বত্র স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের প্রাদুর্ভাব ছিল, তখনকার

রাজারা ভগবৎদত্ত অধিকারে রাজ্যশাসন করবার দাবি করতেন। এ অধিকার ফাশিস্‌মো স্বীকার করে না, রাজতন্ত্রের দিকেও তার কোন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নেই। ইটালিতে রাজসিংহাসন রক্ষার কারণ রাজতন্ত্রে বিশ্বাস নয়—সাময়িক সুবিধা ও ইটালির বিশেষ অবস্থাই মুসোলীনির এ নির্ধারণের মূলে রয়েছে। অবস্থার বিপর্যয়ে নাৎসিরাও কাইজারবংশকে সিংহাসনে ফিরিয়ে আনতে পারে, কিন্তু সেকালের সে-রাজভক্তি ও রাজতন্ত্রে বিশ্বাস অন্তত হিট্‌লারের অনুচরদের বিশেষত্ব নয়। রাজতন্ত্র ছাড়া আর একটি বৈশিষ্ট্য সেকালের সমাজে উল্লেখযোগ্য ছিল—উত্তরাধিকারসূত্রে আভিজাত্য-প্রথা দেশের শীর্ষস্থান তখন অধিকার করত। ফাশিস্ট্‌ মতবাদ গণতন্ত্রের বিরোধী হলেও এ-জাতীয় পুরাতন আভিজাত্যে তার বিশেষ আস্থা নেই। অভিজাত শ্রেণীর পুরাতন মর্যাদা এবং সেকালের ফিউডাল বিধিব্যবস্থা ও দাবিগুলির সমর্থন ফাশিস্‌মোর মধ্যে পাওয়া যায় না। তৃতীয়ত, মধ্যযুগে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির যে-আধিপত্য ছিল, ফাশিস্টেরা তার পুনরুত্থানের বিরোধী। ফাশিস্‌মো ধর্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে শিথিলতা ও ঔদাসীন্য ফাশিস্ট্‌দের চিহ্ন নয়, কিন্তু চার্চের প্রভুত্ব ও স্বতন্ত্র প্রভাববিস্তার তাদের মনঃপূত হতে পারে না। ফাশিজ্‌মের প্রকৃত ধর্ম ফাশিস্ট্‌ স্টেট-পূজা। রাষ্ট্রের একটা নৈতিক রূপ ও স্বতন্ত্র জীবন আছে, ধর্ম ও নীতিতে বিশ্বাস ব্যক্তিগত রুচির কথা নয়, জাতির জীবনে জাতির একটা বিশেষ ধর্ম ও তদুপযোগী ঐতিহ্য থাকা প্রয়োজন—ফাশিস্ট্‌ মতামত এ সব বিশ্বাসের সমর্থক। কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কোন প্রবল প্রতাপান্বিত ধর্মপ্রতিষ্ঠান ফাশিস্ট্‌দের কাম্য জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী। ইটালিতে ক্যাথলিক ধর্মকে বাদ দিয়ে জাতীয় জীবন থাকতে পারে না, কিন্তু ফাশিস্ট্‌ রাষ্ট্রশক্তি রোমান ক্যাথলিক চার্চের উপর বিশেষ আস্থাবান বা নির্ভরশীল নয়। জার্মানিতে নানা ভাবে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নাৎসি দলের করায়ত্ত করার চেষ্টা চলছে। ফাশিস্‌মোর থিওরি অনুসারে রাষ্ট্রই ব্যক্তি ও সমাজের সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত

করে বিরাজিত হবে—অতএব সেখানে পূর্বকালের চার্চ্-প্রতিপত্তির স্থান কোথায় ?

গত শতাব্দীর প্রারম্ভে ফ্রান্স্ ও অন্যান্য দেশে যে-রোমাণ্টিক, ভাবুক ও ধর্মনিষ্ঠ দার্শনিকদের উদয় হয়েছিল, তাঁদের মধ্যযুগের প্রতি আকর্ষণ এবং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র-বিবোধের সঙ্গে ফাশিস্ট্ মতবাদের সুতরাং পার্থক্য আছে। উনবিংশ শতকের কোন কোন লেখককে ফাশিজ্মের অগ্রদূত বলে অভিনন্দন করা হয় বটে—কিন্তু ফাশিস্ট্ আন্দোলন বর্তমান যুগের বিশেষ অবস্থা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। তার আসল লক্ষ্য মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তন নয়, তার প্রকৃত উদ্দেশ্য আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজেরই অস্তিত্বরক্ষা। ধনতন্ত্রের উদয় ও বিকাশের যুগে ডিমক্র্যাসিতে অশেষ সুবিধা ছিল—এখন সমাজতন্ত্রাভিমুখী বিপ্লবের হাত থেকে ধনিক কর্তৃত্ব রক্ষার প্রচেষ্টাই অনেক দেশে ফাশিসমো নামক বিচিত্র মতবাদের সৃষ্টি করেছে। একমাত্র জাপানের বর্তমান অবস্থার মধ্যে ফাশিস্মোর কয়েকটি বিশেষত্বের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগোপযোগী ধারণার অস্তিত্বও দেখতে পাওয়া যায়।

পাঁচ

ফাশিস্মোর তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা উপরে আলোচিত হয়েছে—সকল প্রকার সোশ্যালিজ্মের বিরুদ্ধাচরণ, গণতন্ত্র ও উদারনীতি বর্জন, এবং মধ্যযুগের ধারণা ও প্রতিষ্ঠানের থেকে পার্থক্য। এই বিশেষত্বগুলির প্রত্যেকটি অন্য মতবাদের থেকে ফাশিজ্মের স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ফাশিস্ট্দের অন্য বিশিষ্ট বিশ্বাসের উল্লেখও প্রয়োজন।

প্রথমেই ফাশিস্ট্দের নেতৃত্বের ধারণার কথা মনে পড়ে। মানুষে সকলে সমান না, সকলের সমানাধিকার কিছু বাঞ্ছনীয় নয়, সংখ্যাধিকের আধিপত্য অমঙ্গলের আকর। জাতি ও দেশের পক্ষে প্রধান প্রয়োজন উপযুক্ত নেতার। নেতার আবির্ভাব হলে সকলের কর্তব্য তাঁর নির্দেশ অনুসারে কর্মে আত্মনিয়োগ। এই জন্য জার্মানিতে হিট্‌লারের হাতে সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি ন্যস্ত হয়েছে,

এই জন্যই ইটালিতে উচ্চৈঃস্বরে বলা হচ্ছে যে মুসোলীনির ভুল কখনও হতে পারে না।

কিন্তু জাতির নেতা সম্পূর্ণ একক নন। তিনি বিশ্বাসীদের প্রতিভূ মাত্র, তাঁর পশ্চাতে সুসম্বদ্ধ পার্টি বা দল বিরাজ করছে। ফাশিস্‌মোর প্রধান অবলম্বন আসলে এই দল—নেতা শুধু এর মুখপাত্র ও অধ্যক্ষ। ফাশিস্ট্‌দের দলসংগঠন তাদের আধুনিকত্বের পরিচায়ক, এ ব্যাপারে তাদের পদ্ধতি সাম্যবাদীদের অনুকরণ বলেই সন্দেহ হয়। আধুনিক কালের এ-জাতীয় সম্প্রদায়ের তুলনায় সাধারণ গণতান্ত্রিক দেশের দলগুলি যে নিতান্ত দুর্বল ও অক্ষম সে-সম্বন্ধে কোন দ্বিধার অবকাশ নেই। মুসোলীনি কিংবা হিট্‌লারের ব্যক্তিত্ব যে ইটালি বা জার্মানির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। অন্তত হিট্‌লার যে অনেক সময় নেতা হয়েও ক্রীড়নক মাত্র তা মনে করা অযৌক্তিক নয়।

নেতা ও দলের সম্মিলিত প্রভাবে দেশে একাধিপত্য স্থাপন ফাশিস্‌মোর উদ্দেশ্য। এই একনায়কত্ব জাতির ঐক্য ও মঙ্গল সাধনের জন্য। সাম্যবাদীদের অধিনায়কত্বের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে ফাশিস্ট্‌ ব্যবস্থা সাময়িক নয়, এ প্রথা শুধু যুগ থেকে যুগান্তরে পৌঁছবার সহায় না—এই ব্যবস্থাই চিরকালের আদর্শ ও সর্বোত্তম বিধি। ফাশিস্টেরা তাই ভবিষ্যত সামাজিক ব্যবস্থাকল্পনার মধ্যেও গণতন্ত্রের ও ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন স্থান নির্দেশ করে না। ফাশিস্ট্‌ রাষ্ট্র **totalitarian** বা সমগ্রগ্রাসী—তার এই বিশেষত্ব শুধু সাময়িক নয়, ফাশিস্‌মোর আদর্শে এ চিহ্ন চিরকালের জন্য।

কিন্তু তাই বলে দেশের শাসনযন্ত্রে যে লোকমত প্রকাশের কোন উপায় একেবারেই থাকবে না তা নয়। জনসাধারণের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের অধিকার অস্বীকৃত হলেও তাদের সহযোগিতা আবশ্যক। বিশেষত শ্রমিকদের সম্পূর্ণ পদানত রাখা সম্ভব না। শ্রেণীগত পার্থক্য ও স্বার্থের সংঘাতও ফাশিস্ট্‌ মতবাদে একেবারে অগ্রাহ্য হয় নি। এই সব নানা কারণে ইটালিতে নূতন ভাবে রাষ্ট্রগঠনের প্রচেষ্টা চলছে। শ্রমিক ও

ধনিকদের পৃথক পৃথক সংঘ গঠিত হচ্ছে—তাদের সহযোগিতায় দেশের সকল ব্যবসা পরিচালিত হবার কথা। তবে বিরোধ উপস্থিত হলে স্টেটের মধ্যস্থতা অবশ্যই মানতে হবে; রাষ্ট্রশক্তি যে সে-ক্ষেত্রে কোন্ দিক নেবে তা অনুমান করা শক্ত নয় কিন্তু ফাশিস্টেরা বলে যে রাষ্ট্র ও তার কর্মচারীরা শ্রেণীস্বার্থের উপরে উঠতে পারে। দেশের শাসনযন্ত্রও সাক্ষাতভাবে এই সংঘগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর খানিকটা নির্ভর করবে। এই রূপ নূতন ব্যবস্থাকে Corporative State আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতে করে ধনিক কর্তৃত্ব খর্ব বা ব্যক্তির সম্পত্তিতে অধিকার হ্রাসের কোন সম্ভাবনাই নেই।

নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা, নূতন আদর্শে দলগঠন, সমগ্রগ্রাসী একাধিপত্য, এবং শাসনযন্ত্র সংস্কার—এ সকলেরই মূল উদ্দেশ্য হল জাতির ঐক্যবোধ বিস্তার ও মঙ্গলসাধন। দেশ বা জাতির মঙ্গল কিসে সে-কথা নির্ধারণের ভার অবশ্য ফাশিস্ট্ সম্প্রদায়ের উপর—তা নিয়ে বাদানুবাদের স্বাধীনতা এখানে নেই। জনসাধারণের মধ্যে এ বিশ্বাস সংক্রামিত করতে হবে যে নেতা ও দল এবং তাদের আজ্ঞানুবর্তী রাষ্ট্রশক্তি জাতির মঙ্গল ভিন্ন আর কিছুই করছে না। এ বিশ্বাস প্রচারের উপায় ফাশিস্‌মোর প্রসার ও তদনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা। জাতীয়তা বোধকে এত প্রবল করতে হবে যে সে-ঐক্যের পরিপন্থী সমস্ত কিছুকেই বিনষ্ট করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। পরিপূর্ণ অকুণ্ঠ অন্ধ ন্যাশনালিজ্‌ম্ তাই ফাশিস্ট্‌দের কাম্য—এর প্রতাপ যত বেশী হবে ততই জনসাধারণের মধ্যে ফাশিস্ট্ কর্তৃত্বের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বেশী। জাতীয়ভাবের এই রূপ আজ জাপানে এত প্রকট বলেই জাপান ফাশিস্‌মোর এত নিকটে এসে পড়েছে।

জাতীয়তা-বোধের পুষ্টিসাধনের প্রধান উদ্দেশ্য আবার আসলে আভ্যন্তরিক শ্রমিক অসন্তোষের হ্রাস। ফাশিস্ট্ মতে শ্রেণীবিদ্বেষ জাতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় মাত্র, অথচ শ্রমিকদের সম্পূর্ণভাবে পদদলিত করাও সম্ভব নয়। এ বিপদ থেকে উদ্ধারের দুটি উপায় আছে—এক, জাতীয় ঐক্যবোধকে এমনভাবে

উদ্বুদ্ধ করা যাতে জনসাধারণ স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব ও মঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছায় দুঃখ ও অভাব বরণ করে নেবে। যুদ্ধের সময় এ মনোভাব সর্বত্র দেখা যায়; প্রশ্ন শুধু এই যে, এ উচ্ছ্বাস ক্ষণিক উত্তেজনা থেকে চিরন্তনের পর্যায়ে তোলা যায় কিনা। দ্বিতীয় উপায়,—ধনতন্ত্রের কোন কোন দিকে অল্প সংশোধন, যার ফলে শ্রমিক ও নির্ধনদের আস্থা ও আশাভরসা ফিরিয়ে আনা যায়। এ জন্যই ধনিকপ্রবরদের রাষ্ট্রকর্তৃত্বের অধীনে আনা, কৃষকদের সাহায্য ও সন্তোষসাধন, ধ্বংসোন্মুখ নিম্নস্তরস্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবিকা-নির্বাহের পথপ্রদর্শন ইত্যাদি প্রচেষ্টার উদ্ভব। দুঃখের কথা এই যে, ইটালি ও জার্মানিতে এখন পর্যন্ত এ সদিচ্ছা বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে বলে জানা যায় নি। ইটালিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ গত বার বছরে ঠিক অন্য দেশের মতনই চলেছে, জার্মানিতেও ধনিক শ্রেণীর প্রতিপত্তি কিছু কমেছে বলে জানা যায় না।

ধনতন্ত্র বজায় রেখে জনসাধারণের অবস্থা উন্নত করবার এক উপায় অবশ্য রাজ্যবিস্তার—এইজন্য উপনিবেশ স্থাপন ও রাজ্যজয়ের ইচ্ছা ফাশিস্‌মোর এক প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক ফাশিস্ট্ রাজ্যের অবশ্য প্রসারের বিশেষ লক্ষ্য ও দিক থাকে। কিন্তু বিভিন্ন উদ্যমগুলি এক ঝোঁকেরই অন্তর্গত। ব্রিটেন, ফ্রান্স্ ও যুক্তরাষ্ট্রে ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত এমন শক্তি আছে, এই দেশগুলির সম্বল ও সঞ্চয় এত বেশি যে এখানে রাজ্য-বিস্তারের প্রয়োজন নেই, ফাশিজ্‌ম ও এদের কাছে অনাবশ্যক। ইটালি, জার্মানি ও জাপানের কিন্তু অভ্যন্তরিক অবস্থা এখন এমন যে সেখানে ফাশিজ্‌মের বিশেষ স্থান আছে এবং এ রাজ্যগুলির নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যাবার প্রয়াসের একটা প্রচণ্ড প্রলোভন রয়েছে। সেই ঝোঁককে মুসোলিনী সমর্থন করেন এই বলে যে, বর্তমান ব্যবস্থাতে কতকগুলি দেশ বঞ্চিত ও নিগৃহীত হচ্ছে—তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভ করবার একটা দাবি আছে। তাঁর যুক্তিতে অবশ্য বিপদ এই যে ন্যায় অন্যায় বিচার করবার উপায় আন্তর্জাতিক ব্যাপারে দুর্লভ। যদি প্রতি জাতি নিজের দাবির নিজেই

বিচার করে তাহলে মতভেদেরও অবসান হবে না, যুদ্ধবিগ্রহও চিরকাল মানুষের সাথী থেকে যাবে।

এ প্রসঙ্গে ফাশিস্টেরা বলে থাকে যে যুদ্ধ সত্য সত্যই চিরন্তন, তাকে ছাড়িয়ে যাবার উপায় মানুষের নেই। শুধু তাই নয়, ফাশিস্ট্ মতানুসারে এতে দুঃখিত হবার কিছু নেই—সংগ্রামস্পৃহা মঙ্গলজনক ও উন্নতির সহায়ক। যুদ্ধ ভিন্ন মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি কখনও স্ফূর্তি পায় না—দেশ ও জাতির জন্য প্রাণবিসর্জনে প্রবৃত্ত হওয়া মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। যুদ্ধের প্রতি বিরাগ ব্যক্তির পক্ষে কাপুরুষত্ব, জাতির পক্ষে বার্ধক্য ও অসুস্থতার চিহ্ন। জেনীভার রাষ্ট্রসংঘ সম্বন্ধে তাই ফাশিস্ট্দের অবজ্ঞার অন্ত নেই এবং সকল দেশেই এই অবজ্ঞা সাধারণত এখন ফাশিস্ট্ মনোভাবেরই পরিচায়ক। জাপান ও জার্মানি লীগ ত্যাগ করেছে, ইটালিও আজ তাদের অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত। মাঞ্চুকুয়োর বেলায় জাপান, ভের্সাই সন্ধি লঙ্ঘনের সময় জার্মানি রাষ্ট্রসংঘকে অবহেলা ও অমান্য করেছে। ইটালি কর্ফু দ্বীপের ব্যাপারে বহুদিন আগে ও সম্প্রতি আবিসীনিয়ার গোলযোগে সেই একই মনোভাব দেখিয়েছে। অবশ্য যুদ্ধের নৈতিক উপকারই যে শুধু ফাশিস্ট্দের মুগ্ধ করে তা নয়। 'বঞ্চিত' মহারাষ্ট্রগুলি নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে স্বভাবতই ইচ্ছুক; আর যুদ্ধের সম্ভাবনা কিংবা যুদ্ধ এসে পড়লে জাতীয় ঐক্যের নামে আভ্যন্তরিক বিরোধ চেপে রাখা যে বেশি সহজ হয়ে আসে এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

ছয়

উগ্র জাতীয়তা-বোধ যখন ফাশিজ্মের একটি প্রধান অঙ্গ, তখন বিভিন্ন ফাশিস্ট্ দলের মধ্যে পার্থক্য, এমন কি তাদের স্বার্থের সংঘাত পর্যন্ত কিছু বিচিত্র নয়। তাই অস্ট্রিয়ায় নাৎসি দলের সঙ্গে অন্য ফাশিস্ট্দের সংঘর্ষ হয়, আর ইটালি ও জার্মানি, কি ইটালি ও জাপান পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাবও পোষণ করতে পারে। এই জন্যই আবার ইটালির ফাশিস্ট্ ও জার্মানির নাৎসি ঠিক সব ব্যাপারে একমত না। এই দুই দেশের আন্দোলন দুইটির স্বতন্ত্র বিশেষত্ব

সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলা প্রয়োজন। কিন্তু আসলে এদের চিন্তার গভীর মিলই উল্লেখযোগ্য, পার্থক্যগুলি চমকপ্রদ হলেও তাদের ঐতিহাসিক মূল্য কম।

ইটালীয় ফাশিস্ট্‌দের নিজস্ব সম্পদের মধ্যে প্রধান হল রোমান সাম্রাজ্যের স্মৃতি ও রোমান সভ্যতার উত্তরাধিকারিত্বের গৌরব। মুসোলিনীর অনুবর্তী দলের দৃঢ় বিশ্বাস যে ইতিহাসে ইটালির জন্য নেতার আসন নির্দিষ্ট রয়েছে। পুরাকালে রোমান রাজ্য, মধ্যযুগে পোপের আধিপত্য, তারপরে রেনেসাঁস, ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় পুনরুত্থানের পথপ্রদর্শন, বর্তমান শতকে ফাশিজ মের সৃষ্টি—এ সকলই সভ্যতার ইতিহাসে ইটালির দান। সেকালের রোমের পদাঙ্ক অনুসরণ তাই আজকের ইটালির বাঞ্ছিত পন্থা। সাম্রাজ্য-বিস্তারের ইচ্ছা এতে আরো প্রবল হয়েছে। মুসোলীনির আস্ফালন ও সকল দেশকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান এ মনোভাবেরই হাস্যাস্পদ ফল হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। ফাশিস্‌মো নামটি পযন্ত প্রাচীন রোমেব রাজশক্তির প্রতিভূ দণ্ডগুচ্ছ থেকে গৃহীত।

পক্ষান্তরে জার্মান নাৎসিদের বিশিষ্ট বিশ্বাস হচ্ছে নর্ডিক জাতিব শ্রেষ্ঠত্ব। গত শতকে চেম্বারলিন নামক ঐতিহাসিক ঘোষণা করেছিলেন যে, নর্ডিক টিউটনেরা নাকি বিধাতাব শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই নর্ডিকেবাই আসল খাঁটি আর্য বলে এখন দাবি করা হচ্ছে। জার্মানেরা তাদের প্রধান বংশধর—এখন জার্মান রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে পারলেই জার্মানি জগতের মুকুটমণিরূপে শোভা পাবে। রেস সম্বন্ধে এ ধারণা নাৎসিরা এখন সোৎসাহে প্রচার করছে। এতে জার্মানির পুরাতন য়িহুদি-বিদ্বেষে ঘৃতাহুতি পড়েছে। য়িহুদিরা জার্মান জাতির বিশুদ্ধতা নষ্ট করে—তাদের নীতি, ব্যবহার, চরিত্র, চিন্তা, সমস্তই কলুষিত এ কথা হিট্‌লার উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেছেন। তার উপর তারা বিজাতীয়, আর্থিক জগতে নাকি সব অত্যাচারের তারাই মূল, এমন কি মার্ক্স্‌বাদ তাদেরই গূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধির উপায় মাত্র। য়িহুদি-বিদ্বেষ ছাড়া অন্য ব্যাপারেও নাৎসিদের জাতি সম্বন্ধে বিশেষ দম্ভ

প্রকাশ পায়। সকল জার্মান্‌কে এক রাষ্ট্রের মধ্যে আনতে হবে, অতএব হিট্‌লারি আমলে সাগরপারে উপনিবেশ স্থাপন অপেক্ষা মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপে বিস্তার লাভের ইচ্ছাই বেশি, কারণ তাতে বিদেশী জার্মান্‌দের পিতৃভূমিতেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। ধর্মের বেলাও সেই জাতির বৈশিষ্ট্য মাথা তুলছে ; ফলে জার্মান ক্রিশ্চান বলে খৃস্টধর্মের এক নূতন সংস্করণ বেরিয়েছে—তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে কোন কোন নাৎসি বিশুদ্ধ জার্মান দেবতা হিসাবে ওডিন, থর ইত্যাদি সেকালের দেবদেবীর পূজা প্রবর্তন করতে উদ্যত হয়েছে।

সাত

জাতিগত বিভিন্নতার ফল সুবিস্তৃত হলেও তাদের বাদ দিয়ে ফাশিস্‌মোর মূলসূত্রের ব্যাখ্যাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল। ফাশিজ্‌মের আবির্ভাবের কারণ ও তার ভবিষ্যত সম্বন্ধে বিতর্ক এখানে অবান্তর—তবু শেষ করবার আগে তার উল্লেখ করছি।

ফাশিস্ট্‌দের অভ্যুদয়ের পিছনে দীর্ঘ ইতিহাস আছে। প্রতি দেশে সে-ইতিবৃত্ত অনেকখানি বিভিন্ন। কিন্তু তার মধ্যে কোন ঐক্য খুঁজতে গেলে স্বীকার করতেই হবে যে সে-আন্দোলনের মূল কারণ নানা স্থানে সোশালিস্ট্‌ আধিপত্য স্থাপনের আশু সম্ভাবনা। ধনতন্ত্রের আত্মরক্ষার প্রয়াস হিসাবেই ফাশিস্‌মোকে এখন ঐতিহাসিকেরা ব্যাখ্যা করছেন। তবে সব দেশে এ আন্দোলনের সাফল্য সমান সম্ভব নয়। যেখানে গণতন্ত্র বহুকাল সুপ্রতিষ্ঠিত, যেদেশে উদারনীতি জনমতের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে, সেখানে ফাশিস্‌মোর প্রতিপত্তি না হওয়াই স্বাভাবিক। অনেকে মনে করে যে ফাশিস্ট্‌ মতবাদ ধনতন্ত্রের প্রথম যুগের অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা মাত্র। সেই জন্যই নাকি ফাশিস্টেরা কৃষক ও নিম্নস্তরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি এত সদয়। অর্থাৎ অল্প লোকের হাতে আর্থিক ক্ষমতা এসে পড়ার যে-একটা ঝোঁক ধনতন্ত্রে আছে, ফাশিস্‌মো তাকে বিনাশ করে পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনতে চায়। এ কথা বিস্তর শোনা যায় অবশ্য, কিন্তু এখন পর্যন্ত ইটালি ও জার্মানির

আধুনিক অভিজ্ঞতায় ও দিকে কোনও ফল পাওয়া গেছে বলে মনে হয় না। অতীত অবস্থাকে ফিরিয়ে আনা নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য।

ফাশিস্‌মোর আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক কতকগুলি অপরিহার্য বিপদ আছে। বিভিন্ন দেশের ফাশিস্ট্‌দের মধ্যে সংঘর্ষ তার মধ্যে অন্যতম। দ্বিতীয়ত, ফাশিস্ট্‌দের কর্মপদ্ধতি দুর্বল—বিশেষ করে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের সংঘাত দূরীকরণ সহজ কাজ নয়। জনগণের উপর নির্ভর করে ফাশিস্ট্‌ দল গঠিত হয় বলে তাদের বহুকাল ধরে হাতে রাখার সমস্যাও সুকঠিন, জনসাধারণকে ও শ্রমিকদের রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ব থেকে বরাবরের মতন বঞ্চিত রাখাও দুঃসাধ্য। যোগ্য নেতা সকল সময়ে পাওয়া যাবে কিংবা নানাবিধ লোকের সমষ্টিতে যে-দলের গঠন তার একপ্রাণতা যে নষ্ট হবে না এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করবে না। এই সব কারণেই মনে হয় যে ফাশিস্‌মো আধুনিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান নয়, এমন কি সর্বত্রই যে এ প্রথা গণতন্ত্রের স্থান অধিকার করবে তারও কোন স্থিরতা নেই।

॥ পরিচয় : কার্তিক ১৩৪২ (১৯৩৫)॥

সমাজবাদের নীতি ও প্রয়োগ

রুশ বিপ্লবের ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের অভ্যুদয় সভ্যজগতে যে-বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছিল আজও তার শেষ হল না। শেষ না হওয়া অবশ্য বিচিত্র নয়, কারণ এ তর্কের আড়ালে আরও বিরাট এবং ব্যাপক যে-সমস্যা বিদ্যমান আজ তার প্রভাব চিন্তাশীল মন মাত্রেরই উপর ছায়া ফেলেছে এবং ক্রমশ সে-কথা সকল আর্থিক ও রাষ্ট্রিক আলোচনার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রুশ দেশে লোকশিক্ষা কতদূর বিস্তার লাভ করল, সোভিয়েট সরকার স্বাস্থ্যোন্নতির কি-ব্যবস্থা করেছে, সে-অঞ্চলে আর্ট্ ও ধর্মের বর্তমান অবস্থা কিংবা বিভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতির ভবিষ্যতই বা কি, এই সব সাধারণ জিজ্ঞাস্যকে যে-মূল প্রশ্ন ছাপিয়ে ওঠে তার তিনটি অঙ্গ নির্দেশ করা যায়—সোশালিজ্‌মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি, সে-আদর্শ কার্যে পরিণত করা আদৌ সম্ভব কিনা, এবং সে-প্রচেষ্টাতে মানবজাতির শুভ বা অমঙ্গল কোন্‌টির সম্ভাবনা বেশি।

আমাদের যুগের এই প্রধান আলোচ্য বিষয় নিয়ে যে-বিচার চলছে তার মধ্যে একটা ব্যাপার সহজেই চোখে পড়ে। যাদের আন্তরিক অনুভূতি প্রচলিত বিধিব্যবস্থার সমর্থক বলে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে গণ্য করা চলে তারা সমাজবাদের দুর্বলতা অল্প আয়াসেই বোঝে, কিন্তু সমাজের উপস্থিত গঠনের তীব্র প্রতিবাদ যাদের মনে জেগেছে সোশালিজ্‌মের প্রতি তাদের অধিকাংশের বিশ্বাস বিশেষ বিচলিত হয় না। এর থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে আজকের তর্কবিতর্কের পিছনে রয়েছে দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পরবিরোধী সংঘাত। অর্থাৎ থিওরি সেই মূল সংঘর্ষের অস্ত্রমাত্র, শ্রেণীসংগ্রামের অঙ্গ

Retour de l' U. R. S. S. – by Andre Gide (Gallimard)
Theory and Practice of Socialism – by John Strachey (Gollancz)

হিসাবে তাকে দেখা অসম্ভব নয়। শ্রেণীপ্রত্যয় বলতে অবশ্য শ্রেণীর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী ও সমষ্টিগত ঝোঁক বোঝায়, তার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে তদনুসারে কাজ করবে ও ভাববে এমন অদ্ভুত দাবি কেউ কখনও করে নি। নিয়মের ব্যত্যয়মাত্রে সাধারণ সূত্র অবৈধ হয়ে যায় না একথা বলা বাহুল্য।

কিন্তু বুদ্ধিবাদীরা কি এই শ্রেণীভেদের ঊর্ধ্বে বিচরণ করে না, কিংবা তাদের কি পৃথক শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা সমীচিন নয়? দুঃখের বিষয় তাদের মধ্যে মতানৈক্য সুস্পষ্ট, এবং ধনিক ও শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করে তৃতীয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মতবাদ আজ পর্যন্ত তারা গড়ে তুলতে পারে নি। পণ্যোৎপাদনের সহায়ক উপাদানের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট বিশেষ সম্বন্ধ কোনও শ্রেণীর পৃথক অস্তিত্বের মূল কথা, সুতরাং বুদ্ধিজীবীরা স্বতন্ত্র শ্রেণী নয়, সকল শ্রেণীর মধ্যেই তাদের দেখা পাওয়া যেতে পারে। তাদের আসল কাজ হল শ্রেণীবিশেষের অস্পষ্ট ধারণা ও চিন্তাস্রোতকে ন্যায়সঙ্গত সুসম্বদ্ধ রূপ দেওয়া যাতে সে-শ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধি হয়। এ কথার অর্থ এ নয় যে সব থিওরিই প্রকৃতপক্ষে তুল্যমূল্য, তার মধ্যে যে-কোন একটা গ্রহণ করলেই চলতে পারে। কারণ সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীর উত্থানপতন আছে—সুতরাং বিশেষ কোনও যুগে মানবজাতির কাছে বিশেষ মতবাদের বেশি সার্থকতা থাকা সম্ভব। অর্থাৎ সব মতই সব সময় সমান প্রযুজ্য নয়, এবং এক শ্রেণীর মতামত একযুগে পূর্ণতর সত্যরূপে প্রতিভাত হলে সাময়িক বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে তার অধিকতর সামঞ্জস্য প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক। ইতিহাসে রাষ্ট্রিক ও আর্থিক চিন্তাধারার বিচিত্র বিবর্তন এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। অন্যদিকে আবার পরিবর্তনের ছন্দ ও রূপও অনেকখানি নির্ভর করবে কোন থিওরি কতখানি প্রসার লাভ করছে তার উপর।

সোশালিস্ট্ মতানুসারে আজকের আলোচনার একটা বিশাল পটভূমিকা আছে। ইয়োরোপে গত পাঁচ শতাব্দীর একটা ঐক্য বোঝা সহজ। তারও পূর্বে ফিউডাল বিধিব্যবস্থার প্রতাপ ছিল প্রায় অপ্রতিহত। সে-সমাজের

প্রধান অঙ্গ একদিকে ভূস্বামী, অন্যদিকে অর্ধদাস কৃষক। মুষ্টিমেয় শহুরে বুর্জোয়া মধ্যশ্রেণী তখনও নগণ্য ছিল, কিন্তু শীঘ্রই যে-ব্যবসাবাণিজ্য তাদের প্রাণস্বরূপ তার দ্রুত প্রসার পরিবর্তনের স্রোতকে প্রবল করে তুলল। ভৌগোলিক আবিষ্কারের পর ক্রমে বণিক সম্প্রদায় ও ধনিক মনোভাব শক্তিশালী হয়ে উঠল—এদের মূলমন্ত্র হল আর্থিক লাভের জন্যই পণ্যবিক্রয় ও পণ্যোৎপাদন। অধিক লাভের আশায় তখন ইংরাজ জমিদারেরা পর্যন্ত অনেক সময়ে চাষীদের বিতাড়িত করে পশমের লোভে জমিতে ভেড়ার পাল চরাবার বন্দোবস্ত করত। তারপর লাভের তাড়নায় এল যন্ত্রশিল্পের পরমোৎকর্ষসাধন, তার ফলে এল ফ্যাক্টরি ও আধুনিক উৎপাদন-প্রথা। ক্রমে অভিজাতেরাও ধনিক শ্রেণীর অন্তর্ভূত হয়ে পড়ে—মধ্যশ্রেণী তখন আর আসলে মধ্য রইল না। ধনতন্ত্র পূর্ণপ্রতিষ্ঠা লাভ করবার প্রথম যুগে বৈশিষ্ট্য ছিল অবাধ প্রতিযোগিতার আদর্শ এবং তখন পর্যন্ত ধনতন্ত্রের ক্রমপ্রসার ও উর্ধ্বগতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অন্তর্নিহিত সংকটের ফলে এসেছে সংকোচনের যুগ, এরই জন্য আজ প্রশ্ন উঠছে ফিউডাল ব্যবস্থার মতন ধনতন্ত্রেরও কি অবসান আসছে?

উপরোক্ত সংকটের সম্বন্ধে সোশালিস্ট্ মতবাদ সব চেয়ে প্রাঞ্জল মূর্তি নিয়েছিল জন স্ট্রেচির প্রধান কীর্তি The Nature of Capitalist Crisis গ্রন্থে। তাঁর নূতন পুস্তকের প্রারম্ভেও সংক্ষেপে সে-যুক্তির পুনরাবৃত্তি রয়েছে। জমি, খনিজ সম্পদ, সঞ্চিত মূলধন প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদান (means of production) ব্যক্তিগত সম্পত্তি হওয়াতে মালিকদের অনুমতি বিনা তাদের ব্যবহার অসম্ভব, এবং এখন তাই একমাত্র ব্যক্তি-বিশেষের আর্থিক লাভের (খাজনা, মুনাফা ও সুদ) প্রত্যাশাতেই পণ্যোৎপাদন হয়ে থাকে। বিত্তহীন লোকেরা বাধ্য হয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের পরিবর্তে তাদের পরিশ্রমশক্তি ধনিকের কাছে বিক্রয় করে। লাভের হার বজায় না রাখতে পারলে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে, বজায় রাখতে হলে পারিশ্রমিক সামান্য হওয়া অনিবার্য, এবং তার ফলে দেশে অধিকাংশ লোকের

অর্থশক্তি ক্ষীণ। ওদিকে সম্পন্ন লোকের আয়ের উদ্বৃত্ত মূলধনেই পরিণত হয়, ক্রয়ের কাজে লাগে না। সুতরাং জনসাধারণের প্রচুর প্রকৃত অভাব থাকলেও সাধারণ ব্যবহার্য দ্রব্যের (consumers' goods) আর্থিক চাহিদা (effective demand) প্রবল হয় না, অর্থাৎ সে-সব জিনিস দেশের মধ্যে লাভজনক মূল্যে বিক্রয় করা কঠিন। তাই ব্যবহার্য জিনিসের চাইতে অভিনব উন্নত উৎপাদক যন্ত্র ও সরঞ্জাম (producers' goods) প্রস্তুতকার্যে আপাতত বেশি লাভের সম্ভাবনা মনে হয়। তখন আবার আরও অধিক পরিমাণ উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিদেশে বাজার বিস্তার ও কর্তৃত্বের প্রচেষ্টা অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়ে। এর ফলে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ এবং অনুন্নত দেশ নিয়ে কাড়াকাড়ি তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। উপরে বর্ণিত মতানুসারে ধনতন্ত্রের প্রকৃতিগত সমস্যাই হল এই যে, কিছুকাল পরে একদিকে দেশের আভ্যন্তরিক ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হতে থাকে, অপরদিকে বিদেশী বাজারের প্রসারপথেরও একটা স্বাভাবিক সীমা আছে। অথচ উৎপাদনের উপাদান ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি হওয়াতে পণ্যোৎপাদনের পরিমাণ ও প্রকারভেদ নির্ণীত হয় শুধু ব্যক্তিগত লাভের প্রত্যাশা দিয়ে—এ ক্ষেত্রে সকল উদ্যমের মূল কথা দাঁড়ায় লাভের হার বজায় রাখার প্রচেষ্টা। সুতরাং কিছুদিন পর পর আর্থিক সংকট (periodic crisis) উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক এবং ধনতন্ত্রের প্রথম প্রসারের শ্রীবৃদ্ধির পর সংকোচনের জরা ও অবসাদ (general crisis) আসাই সম্ভব। সমাজবাদ খণ্ডন করতে হলে এই যুক্তিগুলিকে আক্রমণ করতে হবে।

ধনতন্ত্রের পাঁচ শতাব্দীব্যাপী ইতিহাসের যে-ছবি এভাবে আঁকা হয়েছে তার মধ্যে আর একটা কথা আছে। ধনজীবী সম্প্রদায়ের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই তার ঠিক বিপরীত শ্রমজীবী শ্রেণীর অভ্যুত্থান দেখা যায়। কিছুদিন পর পর শ্রমিকেরা ধনিকদের বাধা দিতে চেষ্টা করে এসেছে—মধ্যযুগের অন্তে প্রজাবিদ্রোহ থেকে উনিশ শতকের চার্টিস্ট্ আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির শক্তিসঞ্চয় এর প্রমাণ। ধনিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্বেরও তাই একটা

ঐতিহাসিক ধারা আছে। আজ যদি ধনতন্ত্র সংকোচনের পথে নামে তবে তার স্বাভাবিক ফল হবে শ্রমিকদের শক্তিবৃদ্ধি।

আর্থিক পরিবর্তনের সঙ্গে পা ফেলে চিন্তার প্রগতিও ইতিহাসে ছাপ রেখে গেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজের পূর্ণ রাষ্ট্রিক রূপ হচ্ছে লিবারেল ডিমক্র্যাসি—তার প্রসার ধনিক বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিপত্তির অনুসরণ করছে দেখা যায়। অধ্যাপক ল্যাস্কি সম্প্রতি দেখাতে চেয়েছেন যে সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ইয়োরোপের মন প্রথমে রেনেসাঁস পরে রেফর্মেশন, তারও পরে 'আলোক-উদ্ভাসিত' ব্যক্তিবাদের মধ্য দিয়ে ইংরাজ বিপ্লবের উদার মত ও ফরাসী বিপ্লবের গণতন্ত্রে পৌঁছেছিল। উনিশ শতকে ধনতন্ত্রের স্বর্ণযুগ আসবার পরই লিবারেল ডিমক্র্যাসি পরাকাষ্ঠা লাভ করে। স্ট্রেচি প্রমুখ লেখকেরা বলেন যে সাম্প্রতিক ফাশিস্ট্ ঝোঁকও তেমনই আবার সংকোচনোন্মুখ ধনতন্ত্রের উপযুক্ত মুখপাত্র। অন্যদিকে বহুকাল ধরে নূতন সমাজগঠনের আশা বিভিন্ন লেখকের স্বপ্নের মধ্য দিয়ে অস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। ইংল্যাণ্ডে এর উদাহরণ হিসাবে স্ট্রেচি চারজনের কথা বর্ণনা করেছেন—ষোলো শতকের প্রথমে টমাস মোর, সতেরো শতাব্দীর গৃহযুদ্ধের সময় জেরার্ড্ উইন্‌স্টান্‌লি, গত শতকের প্রথমে রবার্ট্ ওয়েন এবং শেষের দিকে উইলিয়াম মরিস। শোষণের বিরুদ্ধে লড়ার প্রবৃত্তির সঙ্গে নূতন সমাজ-গঠনের আকাঙ্ক্ষার অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্‌স্ আধুনিক সোশালিস্ট্ আন্দোলন সৃষ্টি করলেন। উৎপাদনের উপাদানে শ্রমজীবীদের সম্পত্তি নেই বল্লেই চলে, অথচ জীবনধারণের জন্য এরা যে-শারীরিক শক্তি বিক্রয় করে উৎপাদন ব্যাপারে সেটাই অপরিহার্য অঙ্গ। শ্রম প্রয়োগে যতখানি ধন উৎপন্ন হয় তার সব মূল্যটুকু শ্রমিকেরা পেতে পারে না কারণ তাহলে উৎপাদনের মালিকদের কোন লাভ থাকে না। শ্রমের এই অতিরিক্ত মূল্যের (surplus value) ন্যায্যত অধিকারী ব্যক্তি নয়, সমস্ত সমাজ, এই বিশ্বাস সমাজতন্ত্রের আর্থিক ভিত্তি। নূতন সমাজব্যবস্থার মূলে থাকবে জনসাধারণের প্রকৃত প্রয়োজনের খাতিরে উৎপাদন (production for

use), লাভের তাড়নায় নয়। তার সোপান হবে উৎপাদনের উপাদানে ব্যক্তিগত অধিকার বর্জন, এর ফলে সমাজে শ্রেণীভেদ মিলিয়ে যাবে। সাম্যবাদের গোড়ার কথাটা এ ভাবে ব্যক্ত করা যায়।

যে-মূল প্রশ্নের উত্থাপনে প্রসঙ্গ আরম্ভ হয়েছিল এখন তাতে ফিরে গেলে বোঝা যাবে কি জন্য বাদানুবাদ অনিবার্য অথচ অফুরন্ত। সোশালিস্ট্ প্রচেষ্টার শুভাশুভ ফল সম্বন্ধে প্রশ্নের সঠিক সমাধা শেষ পর্যন্ত ইতিহাসই করতে পারবে। প্রশ্নের অন্য অঙ্গ দুটির আলোচনা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেছে সম্প্রতি দুটি গ্রন্থ। যে-তীক্ষ্ণ সরল নৈপুণ্য জন স্ট্রেচির রচনার গৌরব তাঁর নবতম গ্রন্থে তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তাই সোশালিজ্‌মের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর বই সকলকেই জ্ঞান দিতে পারে। সোশালিজ্‌মের সাধারণ সরল ব্যাখ্যার শীর্ষস্থান এ বইখানির প্রাপ্য, উপরের সুদীর্ঘ আলোচনার অনেকখানিই তাঁর লেখার সংক্ষিপ্তসার। শুধু মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাণ ডায়ালেক্‌টিকের ব্যাখ্যা থেকে স্ট্রেচি সর্বদাই কিছু দূরে থাকেন, তাঁর মনের গড়নই বোধ হয় প্র্যাক্‌টিকাল, দার্শনিক নয়।

ফরাসী সাহিত্যিকদের অগ্রণী আঁদ্রে জীদ যে-বইখানি লিখেছেন কয়েক মাসে তার শতাধিক সংস্করণ বেরিয়েছে। তিন বছর আগে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার ভক্ত সমর্থক হিসাবে সকলকে চমকিত করেছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি রাশিয়াভ্রমণের ফলে তাঁর যে-সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে আলোচ্য পুস্তিকায় তিনি তাই ব্যক্ত করেছেন। এখনও জনসাধারণের মধ্যে সমতার ভাব, 'সংস্কৃতি-উদ্যান'গুলিতে লোকশিক্ষা ও সকলের বিশুদ্ধ আনন্দ লাভের ব্যবস্থা প্রভৃতি রুশ দেশের অনেক ব্যাপারের তিনি প্রশংসা করেন কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনারই মূল্য নিশ্চয় বেশি। সোশালিস্টেরাও স্বীকার করবে জীদের বই তাদের সজাগ থাকার পক্ষে সহায়ক হবে। বিশেষ করে এ কথা খাটে তিনটি দোষ সম্বন্ধে। রুশ জাতি এখন সোভিয়েটের সাফল্যে উল্লসিত হয়ে অতিরিক্ত আত্মপ্রসাদ অনুভব করছে, বৈদেশিক অবস্থা সম্বন্ধে তাদের প্রগাঢ় অজ্ঞতা জীদকে পীড়া

দিয়েছে, অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল অবস্থার লোকদের প্রতি নাকি সাধারণের একটা ঔদাসীন্যও সেখানে লক্ষিত হয়।

জীদের প্রধান অভিযোগ কিন্তু এই যে, রাশিয়া গত দু-এক বছরের মধ্যে বিপ্লবের আদর্শ থেকে চ্যুত হয়েছে—এখন সেদেশে নূতন বুর্জোয়া সভ্যতার উদ্ভব হচ্ছে। এই অভিযোগ ট্রট্স্কির অনুচরেরা কয়েক বছর থেকেই করে আসছে। সে-মনোভাব অবশ্য নিজেকে ঘোর বিপ্লবী মনে করে। কিন্তু জীদ কি সত্যই এ-জাতীয় বিপ্লবী? আলোচ্য গ্রন্থের কতকগুলি আক্ষেপ ট্রট্স্কির চরমপন্থার সঙ্গে বিশেষ খাপ খায় না। রাশিয়াতে ব্যক্তিত্ববোধ লোপ পাচ্ছে, চিন্তার স্বাধীনতা হ্রাস পেয়েছে, তৃপ্তি ও আত্মসন্তুষ্টি জনগণের মধ্যে এখন ব্যাপ্ত—এ সব মন্তব্য ঠিক চরম বিপ্লবীর উপযুক্ত নয় বরং এগুলি 'রাশিয়ার চিঠি' লেখকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তফাত এই যে, আমাদের কবি নিজেকে কখনও সাম্যবাদী বলে পরিচয় দেন নি।

ট্রট্স্কির অভিযান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা উচিত। বল্‌শেভিক বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত ট্রট্স্কি সাম্যবাদী ছিলেন না এবং তখন জিনোভিয়েভ প্রভৃতি অনেকে লেনিনের নেতৃত্ব ঠিক অনুসরণ করেন নি; স্টালিন কিন্তু প্রথম থেকেই বল্‌শেভিক দলের অন্তরঙ্গ সদস্য ছিলেন। ট্রট্স্কি-স্টালিনের তর্কযুদ্ধ যাঁরা অভিনিবেশের সঙ্গে অনুসরণ করেছেন তাঁদের প্রায় সকলেরই মত যে স্টালিনই ঠিক মার্ক্স্‌, এঙ্গেল্‌স্ ও লেনিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, ট্রট্স্কি ডায়ালেক্‌টিক সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। জিনোভিয়েভ প্রভৃতি ট্রট্স্কির সহকর্মীদের যে সুবিচারের বিশেষ অভাব হয় নি ইংরাজ 'কে-সি' প্রিটের এই মত প্রণিধানযোগ্য। ট্রট্স্কির দলের প্রতি ধনিক সমাজের এত সহানুভূতিরই বা কি কারণ? শ্রমিকেরা তো এই বিপ্লবীদের প্রতি বিশেষ আস্থাবান নয়। রাশিয়ায় যদি পূর্বাবস্থা ফিরে আসবার উপক্রম হয়ে থাকে তবে ধনিক রাষ্ট্রের সঙ্গে তার গভীর সখ্যস্থাপন হয় না কেন? ফাশিস্ট্‌দেরই বা তাহলে আন্তরিক রুশ-বিদ্বেষের কারণ কি?

আসলে জীদ মার্ক্স্‌তত্ত্বে অনেকখানি অনভিজ্ঞ বলে সোশালিজ্‌মের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে ও তার কার্যপদ্ধতির বিষয় কিছু কিছু ভুল ধারণা পোষণ করেছেন। তিনি সোশালিজ্‌মকে অসম্ভব কিম্বা অন্যায় ও অমঙ্গলের আকর বলে অনায়াসে আক্রমণ করতে পারতেন, তাতে কারও কিছু আপত্তি থাকত না। কিন্তু তিনি যে-দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেছেন তার তাৎপর্য তাঁর কাছে খুব পরিস্ফুট নয়। বিবর্তনের ডায়ালেক্‌টিক তিনি একেবারে অস্বীকার করে কবির অসহিষ্ণু স্বপ্নচোখে রাশিয়ার কাছে অনেক জিনিস প্রত্যাশা করেছেন—সিড্‌নি ও বিয়াট্রিস ওয়েবের মতন তিনি সমগ্র রূপ ধরবার প্রয়াস পান নি। অথচ বিরোধী সমালোচকেরও এই হল প্রথম কর্তব্য। সমাজতন্ত্রগঠনের যে-স্তরভেদের কথা মার্ক্স্‌ ১৮৭৫ সালে গোথা প্রোগ্রামের আলোচনায় উল্লেখ করেছিলেন—যার উপর আজকের থিওরিতে সোশালিজ্‌ম্‌ ও কমিউনিজ্‌মের পার্থক্য নির্দেশ করা হয় (স্ট্রেচি, এগারো অধ্যায়) সেই গোড়ার কথাটুকুও জীদ ধরতে পারেন নি। প্রথম স্তর অর্থাৎ সোশালিজ্‌মের আদর্শ হল উৎপাদনের উপাদানে ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তির বিনাশ মাত্র। রুশ দেশ এখন এই স্তরে—সুতরাং প্রকৃত প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে ব্যক্তিগত এ-জাতীয় সম্পত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা সেখানে হচ্ছে কি না। সমালোচকের এ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই, স্ট্রেচির মতে সেখানকার গতি এ দিকেই নয়। জীদ এ প্রশ্ন ধরতেই পারেন নি।

॥ পরিচয় : জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ (১৯৩৭) ॥

ইডিয়োলজি ও ইউটোপিয়া

1929-31

নাৎসি বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে যখন সমস্ত জার্মানি বিভিন্ন মতামতের সংঘর্ষে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, প্রসিদ্ধ অধ্যাপক কার্ল্ মান্‌হাইমের এই গ্রন্থটির অধিকাংশের মূল জার্মান সেই সময় প্রথম প্রকাশিত হয় (১৯২৯-১৯৩১)। সেই চাঞ্চল্যের যুগে লেখা তাঁর পুস্তকের শান্ত আত্মস্থ ভাব সত্যই প্রশংসনীয় এবং তাঁরই উপযুক্ত। সোশিওলজি প্রায়শ বাকবহুল এরূপ একটা ধারণা বহুদিন আমার মনে ভীতি উৎপাদন করে এসেছে। অনেক সময় এঙ্গেল্‌সের একটা কথাতেও সায় দিতে ইচ্ছা হয়, যে, সকল জাতিই অল্পবিস্তর নিরর্থক কথা বলে বটে কিন্তু জার্মান্‌দের বিশেষত্বই এই যে তারা গুরুগম্ভীর ভাষায় প্রলাপ বকতে পারে। কিন্তু জার্মান পণ্ডিতের সমাজবিদ্যা সম্বন্ধে এ গবেষণা আমার মতো অনধিকারী সাধারণ পাঠককেও মুগ্ধ করেছে। আমার বিশ্বাস যে সমাজতত্ত্ব-সাহিত্যে এ বইখানির একটা বিশিষ্ট ও অত্যুচ্চ স্থান ইতিমধ্যেই সর্বস্বীকৃত হয়ে গেছে, তাই এখন এর ইংরাজি অনুবাদেও অনেকে উপকৃত হবে। সোশিওলজি-চর্চায় মান্‌হাইম এক নূতন পথ খুলে দিয়েছেন, তার নাম তিনি রেখেছেন—Wissenssoziologie (ইংরাজিতে sociology of knowledge)। তারই মূলসূত্র আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য।

সামাজিক সকল তত্ত্বের আলোচনা ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চার মধ্যে একটা দুস্তর পার্থক্য আছে—দেখা যায় যে প্রথম শ্রেণীর সিদ্ধান্তগুলি সকলের স্বীকার্য হয় না। এ-জাতীয় বিদ্যার প্রতি স্তরেই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় থাকে, এর

Ideology and Utopia—by Karl Mannheim. Translated by Louis Wirth and Edward Shils. (Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd.)

ফ্যাক্টের বিশ্লেষণের প্রতিপদেও মানুষের নানারূপ স্বার্থ জড়িত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রনীতি, অর্থশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিদ্যাকে অশান্তিজনক আলোচনারূপে অভিহিত করা যায়। জাপানের শাসকেরা যখন পশ্চিমের যুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানকে সাদরে বরণ করে তখনও তারা ইয়োরোপের সকল প্রকার সামাজিক বিজ্ঞানকে তাই দূরে ঠেকিয়ে রাখবার প্রয়াস পেয়েছিল। মাঝে মাঝে গণিত ও সংখ্যাশাস্ত্রের রীতিপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে সামাজিক তত্ত্বের কোন কোন সংকীর্ণ ক্ষেত্রকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পর্যায়ে তুলবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু মান্‌হাইমের মতে এ পদ্ধতিতে বিপদ এই যে, এতে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় শুধু তারই উপর যাকে কোন প্রকারে অঙ্কের মাপকাঠিতে ফেলা যায়; ফলে একটা ধারণা প্রবল হয় যে যাকে গণিতসম্মত প্রথায় মাপা চলে না তার কোন মূল্য নেই। এতে স্থিরসিদ্ধান্তের মোহে জ্ঞানের পরিধি অযথা সংকুচিত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, পণ্ডিতেরা বলতে পারেন সামাজিক বিদ্যাগুলি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান পদবাচ্যই নয়, তাতে বিজ্ঞানেব যে-কোন প্রয়োগই অচল। মান্‌হাইম কিন্তু এ ভাবে বিজ্ঞানের সংজ্ঞাকে খর্ব করতে প্রস্তুত নন; কেননা, ২×২=৪, এ-জাতীয় যুক্তি ছাড়াও বৈজ্ঞানিক চিন্তার অন্য ক্ষেত্র থাকতে পারে। সুসম্বদ্ধ বিশেষ জ্ঞান যদি বিজ্ঞান হয়, তবে সামাজিক বিজ্ঞান একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু সমাজ সংক্রান্ত সকল আলোচনাই স্বার্থজড়িত ও পক্ষপাতদুষ্ট নয় কি? মান্‌হাইম এ কথা স্বীকার করেই বলছেন যে এমন অনেক বিষয় আছে যেখানে মূল্যনির্ধারণ (valuation), অন্তর্দৃষ্টি (insight), ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী (bias) জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়। এগুলি উপস্থিত থাকলেই সে-ক্ষেত্র আমাদের আয়ত্তের (control) বাইরে এমন কথা বলা অনুচিত। চতুর্থত, আজকের দিনে অবশ্য চিন্তার রাজ্যে সংশয়বাদের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, এমনকি তাতে পদার্থবিদ্যার ভিত্তিও নড়ে উঠছে। আদর্শবাদ ও জড়বাদ জগৎ-সংসারের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকলেও সে-সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভ সম্ভব বলেই স্বীকার করে এসেছিল; হিউম সে-নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে সংশয়ের ভূমিকম্প আনলেন।

কাণ্ট্ বিশুদ্ধ নিশ্চিত জ্ঞানের ক্ষেত্র কিছু সংকীর্ণ করে নিয়ে দর্শনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু আধুনিক যুগে সংশয়ের পুনরভ্যুত্থানে মানুষের চিন্তা যেন পক্ষাঘাতে বিকল হয়ে পড়েছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি পর্যন্ত আপেক্ষিকতত্ত্বের কৃপায় আর ধ্রুবসত্য বলে মনে হয় না। এ সম্বন্ধে মান্‌হাইমের যুক্তি এই যে, মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও বিশ্লেষণী চিন্তা আংশিক ও আপেক্ষিক বটে relational), কিন্তু সেই নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে সে-জ্ঞান ও চিন্তা ভুল বা অবিশ্বাস্য বলা একান্ত অন্যায়। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ব্যতীতও যেমন বিজ্ঞান থাকতে পারে, চিরন্তনীর পর্যায় বাদ দিয়েও তেমনি আপেক্ষিক সত্যের একটা মূল্য আছে।

মান্‌হাইমের মতবাদের দুটি প্রধান অঙ্গ নির্দেশ করা সম্ভব। 'তিনি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন যে বিশুদ্ধতম বিজ্ঞানের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে মানুষের সকল চিন্তাই তার বিশেষ সামাজিক অবস্থানের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। অথচ তার মানে জ্ঞানান্বেষণ অসম্ভব কিংবা ছলনামাত্র নয়, বিশিষ্ট পরিবেশের প্রভাব বুঝতে পারবার পরই জ্ঞানচর্চা সার্থক হয়ে উঠতে পারে, তাই আজ জ্ঞানার্জন সম্বন্ধে নূতন থিওরির প্রয়োজন আছে।

মান্‌হাইম বোঝাতে চেয়েছেন যে মানুষের চিন্তা ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক। কিন্তু সামাজিক অর্থে এখানে সমগ্র সমাজের প্রতিফলন বোঝায় না। মানুষ ভাবে তার বিশিষ্ট গোষ্ঠীর (group) নির্দেশে, তাই একই দেশ ও কালে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে চিন্তার রূপ ও ভঙ্গী পৃথক হয়ে পড়ে। ম্যাক্স্ ভেবর প্রতিপন্ন করেছিলেন যে একই ধর্ম একই কালে বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন আকার ধারণ করে। এক হিসাবে এই মতের প্রধান উদ্ভাবক অবশ্য স্বয়ং কার্ল্ মার্ক্স্, কেননা তিনিই ঘোষণা করেছিলেন যে সংস্কৃতির সৌধের সকল অঙ্গই মূলত আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মান্‌হাইম মনে করেন যে মানুষ যখন ভাবে তখন সে শূন্যে বিচরণ করে না; তার ভাবনার ক্ষেত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা (inherited situation), তার ভাবনার প্রথা (patterns of thought) অনেকখানি পূর্বনির্দিষ্ট। ফ্রয়েড চিন্তার মূল

খুঁজেছিলেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে কিন্তু আসলে অভিজ্ঞতা গোষ্ঠীগত। বাল্যজীবন অপেক্ষা সামাজিক পরিবেষ্টনের বিশ্লেষণই তাই বেশী যুক্তিসঙ্গত। দর্শন ও মনস্তত্ত্বে স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষের পরিকল্পনা বস্তুতই কল্পনা মাত্র এবং উদীয়মান বুর্জোয়া সভ্যতার ব্যক্তিত্ববাদের সঙ্গেই তার নিবিড় যোগ ছিল। আজ যখন সে-সভ্যতার সঙ্গে সেই ব্যক্তিত্ববাদের প্রভাব কমে আসছে, তখন স্বভাবতই চিন্তার গোষ্ঠীগত মূলের দিকে মানুষেব চোখ পড়েছে।

এই বিশ্বাসের সমর্থনে মান্‌হাইম অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন। রাষ্ট্রতত্ত্বে কতকগুলি পবস্পরবিরোধী মতবাদ সকলেবই চোখে পড়ে আর তার এক একটি যে সমাজের এক এক স্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এ কথা বোঝাও শক্ত নয়। মান্‌হাইম এ প্রসঙ্গে যে-সংজ্ঞার আশ্রয় নিয়েছেন তা অনেকখানি মার্ক্সের প্রসিদ্ধ সূত্র—তত্ত্ব ও ব্যবহারের অঙ্গাঙ্গি যোগ (unity of theory and practice)-এর অনুরূপ। ভাবুকের মনে এ যোগ যে সর্বদা স্পষ্ট প্রতিভাত হয় তা নয়, সেইজন্য যে-সব কথা লোকে নির্বিচারে প্রায় স্বতঃ-সিদ্ধ রূপে মেনে নেয়, তাদের চিন্তাব বিশ্লেষণেব সময় সেইগুলিব অন্তর্নিহিত অর্থই প্রধান হয়ে ওঠে। Wissenssoziologie-এর প্রথম কর্তব্য হল সকল চিন্তাব মূল উদ্‌ঘাটন করে তার প্রকৃত সামাজিক ভিত্তি প্রকাশ করা।

সাম্প্রতিক রাষ্ট্রচিন্তায় মান্‌হাইম এইভাবে পাঁচটি ভিন্ন টাইপের সন্ধান পেয়েছেন। এক ধরনের রক্ষণশীল মনোভাব বাজ্যশাসন-ব্যবসায়ীদের উপ-যোগী, এরা মনে করে যে শাসনযন্ত্রের উৎকর্ষসাধন ও শাসন-প্রণালীব সুদক্ষ পদ্ধতিই রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রধান কথা। এ মনোভাব বুরোক্র্যাটিক, আমেরিকায় আজকাল টেক্‌নোক্র্যাসি নামে এর প্রভূত প্রচলন হয়েছে। দ্বিতীয় টাইপটিকে রোমান্টিক রক্ষণশীলতা আখ্যা দেওয়া যায়। এর ভিত্তি অভিজাত আবেষ্টনের মধ্যে; প্রাচীন ঐতিহ্যের পূজা এবং জাতীয় সংস্কার (volkgeist) আঁকড়ে থাকা এর বৈশিষ্ট্য। উদার গণতান্ত্রিক মতবাদ বুর্জোয়া মধ্যশ্রেণীর উদ্ভাবনা এবং বিশেষ করে তাদেরই সম্পত্তি। ধনিকতন্ত্রের দিগ্বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে

মনোভাব ছড়িয়ে পড়েছে, এর দোহাই হচ্ছে যুগধর্ম (zeitgeist)। শ্রমিক-স্বার্থ অবশ্য মূর্তি নিয়েছে সমাজবাদ ও সাম্যবাদে। শেষ টাইপটি ফাশিস্ট মতবাদ; মান্‌হাইমের বিশ্বাস এর প্রেরণা এসেছে বর্তমান সংকটে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন স্তরের সাময়িক মিলনে এবং নেতৃত্বলোভী ব্যক্তিবিশেষদের স্বার্থসন্ধানে।

গোষ্ঠীর স্বার্থ ও পরিবেষ্টন থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন মতবাদ শেষ পর্যন্ত পৃথিবী সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে পর্যবসিত হয়—সেইজন্যই সামাজিক আলোচনায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় না। এমন কি একই কথা (concept) পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীতে (weltanschauung) স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে। **Freedom**-এর মতন সামান্য একটি সংজ্ঞাও রক্ষণশীলদের কাছে এক জিনিস বোঝায়, মধ্যশ্রেণী বা শ্রমিকদের পক্ষে তার অর্থ অন্য প্রকার। তর্কের সময় তাই একই ভাষা বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত লোকের কাছে পৃথক ভাবের উদ্রেক করে।

সমাজের মধ্যে গোষ্ঠী অনেক হওয়াতে দৃষ্টিভঙ্গীও বিবিধ ও বহুসংখ্যক। মানহাইম তাদের দুটি প্রধান পর্যায়ে ফেলেছেন—এবং তার থেকেই আলোচ্য গ্রন্থটির নামকরণ হয়েছে। প্রচলিত দুটি কথাকে ঈষৎ নূতন অর্থে ব্যবহার করতে অনেকের আপত্তি হতে পারে, কিন্তু মান্‌হাইম তাদের সংজ্ঞানির্দেশ করে দিতে ত্রুটি করেন নি। সমাজের প্রচলিত বিধিব্যবস্থার আত্ম-রক্ষা-প্রচেষ্টাতে যে-সব বিশ্বাসের আশ্রয় নেওয়া হয় তাদের তিনি নাম দিয়েছেন—ইডিওলজি। আর পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে যে-সকল স্বপ্নকে উৎসাহ দেওয়া হয় তাদের সাধারণ নাম—ইউটোপিয়া। মানুষের প্রায় সর্ববিধ চিন্তাকে এর মধ্যে এক কিংবা অপর কোঠায় ফেলা যেতে পারে।

আজকের দিনের যে-সংস্কৃতিসংকট চিন্তাশীল লোকদের পীড়া দেয়, **Wissenssoziologie**-তে তার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইডিওলজি মাত্রই যে বিশেষ উদ্দেশ্যসম্ভূত কল্পনাসমষ্টি, প্রতিপক্ষেরা তা প্রমাণ করে ফেলছে;—আর ইউটোপিয়াও যে অবাস্তব ইচ্ছাসম্পূরণ সে-সন্দেহও

আলোচনার মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। তাহলে মানুষের আশ্রয় কোথায়? সমাজসংক্রান্ত চিন্তামাত্রই গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়িয়ে যেতে পারবে না, মান্‌হাইমের এই প্রথম সূত্রের ফলই আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

কিন্তু এখানে আলোচ্য বিষয়টির শেষ নয়। সংস্কৃতিসংকটের অনুভূতি থেকেই Wissenssoziologie তার দ্বিতীয় প্রস্তাবে পৌঁছচ্ছে। মানুষের সহজ সাধারণ বুদ্ধি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে-সমন্বয় খোঁজে, তার কি কোনও সম্ভাবনা নেই? একই ব্যাপার বা ঘটনা সম্বন্ধে লোকের ভিন্ন ধারণা জন্মায় এই জন্য যে তার বিভিন্ন অঙ্গের দিকে বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। সুতরাং প্রত্যেক দৃষ্টিভঙ্গী হয়তো আংশিকভাবে সত্য—দ্রষ্টার চোখ সম্পূর্ণ দৃশ্য গ্রহণ করতে না পাবলেও খানিকটা হয়তো তার কাছে ধরা পড়ছে। বস্তু যদি এক হয় তবে ন্যায্যত নানা দৃষ্টির অন্তত আংশিক সমন্বয় অসম্ভব নয়। বাধা শুধু এই যে, প্রথম সূত্র অনুসারে সামাজিক জ্ঞান মাত্র কোনও এক গোষ্ঠীর স্বার্থ ও অনুভূতির সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য। কিন্তু যদি এমন কোনও গোষ্ঠী থাকে যার অনুভূতি ও স্বার্থকে অপর সকলের তুলনায় ব্যাপক আখ্যা দেওয়া চলে? মান্‌হাইমের মতে Intelligentsia অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের ঠিক এই অবস্থা। মধ্যযুগে চিন্তা পুরোহিতদের আয়ত্তে ছিল—তারপর কিন্তু সমাজের নানা স্তর থেকে পুষ্ট বুদ্ধিজীবীদের দল চিন্তাই নিজেদের ব্যবসা করে নিয়েছে। সমালোচনাই হয়ে দাঁড়িয়েছে এদের স্বার্থ, শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা হয়েছে এদের যোগসূত্র। সাধারণত তারা অপরাপর গোষ্ঠীদের থিওরির অস্ত্র জুগিয়ে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন স্তর থেকে উৎপত্তি, ও ব্যবহারিক স্বার্থের প্রসার তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যাপক রূপ দিতে পারে, যদি অবশ্য তারা সে-উদ্যমে প্রবৃত্ত হয়। মান্‌হাইম মনে করেন যে এইভাবে একটি গোষ্ঠীর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী আজকের সংকটের দিনে আংশিক ও সাময়িক সমন্বয় আনতে পারে। শুধু মনে রাখতে হবে যে, তাদের ব্যাপক দৃষ্টিও চিরন্তন ও ধ্রুব সত্য নয়, তাদের চিন্তার ভিত্তিও সামাজিক, এবং তাকেও বারবার সংশোধন ও পরিবর্তন করে চলতে হবে। এ বিশ্বাসের অনুযায়ী

টেক্‌নিক বা বিচারপদ্ধতির প্রবর্তনই Wissenssoziologieর দ্বিতীয় কর্তব্য।

বিশেষজ্ঞরা আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু উপরোক্ত সিদ্ধান্তকে চলতি ভাষায় অনুবাদ করলে এই দাঁড়ায় না কি যে, ধনিক-শ্রমিক ও অন্যান্য সংঘর্ষের অবসান হবে যদি সকলে বুদ্ধিবাদীদের হাতে আত্মসমর্পণ করে? বুদ্ধিবাদের সুবিদিত অহমিকাই কি এর মূল নয়? মান্‌হাইম নিজেই বুদ্ধিজীবীদের গাঢ় তমিস্র রজনীর মধ্যে জাগ্রত প্রহরীদের সঙ্গে তুলনা করেছেন (১৪৩ পৃষ্ঠা)।

গ্রন্থের ভূমিকায় অনুবাদক অধ্যাপক উইর্থ্‌ মার্ক্‌স্‌বাদ সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করলেও, মান্‌হাইম নিজে মার্ক্‌স্‌কে তাঁর অগ্রচারী বলে স্বীকার করেছেন (২৭৮ পৃঃ)। সুতরাং মার্ক্সের থেকে তাঁর পার্থক্যের দিকে নজর রেখে Wissenssoziologieর কিছু সমালোচনা করা অন্যায় হবে না। মান্‌হাইমের যুক্তির প্রধান ফাঁক তাঁর গোষ্ঠী বা group-এর ধারণা। চিন্তার ক্ষেত্রে মার্ক্স্‌ জোর দিয়েছিলেন শ্রেণীর (class) উপর; তাই শ্রেণীস্বার্থ, শ্রেণীপ্রত্যয়, শ্রেণীসংঘাত মার্ক্সের বিশ্লেষণের গোড়ার কথা। মান্‌হাইম শ্রেণীবিভাগকে অস্বীকার করেন নি কিন্তু তাতে তিনি সন্তুষ্ট নন—গোষ্ঠী অর্থে তিনি আরও বহুবিধ সামাজিক ভাগকে বুঝেছেন, যেমন ব্যবসা (occupation), সামাজিক প্রতিষ্ঠা (status), সমবয়স্কতা (generation), ইত্যাদি (২৪৮ পৃঃ)। কিন্তু এই ধরনের সমষ্টিগুলির কি মার্ক্সের শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা চলে? এই-জাতীয় group-এর কি সত্য সত্যই সার্থক দৃষ্টিভঙ্গী আছে? তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিরও ত পৃথক দৃষ্টি থাকতে পারে। মান্‌হাইম কোথাও প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন নি যে আধুনিক জগতে দেশের মধ্যে শ্রেণী-ব্যতীত অন্য গোষ্ঠীর বস্তুত কোন স্বতন্ত্র weltanschauung আছে কিংবা সে-পার্থক্যের কোনও ব্যাপক সার্থকতা দেখা যায়। উদাহরণের প্রয়োজন হওয়া মাত্র তিনি ফিউডাল, বুর্জোয়া, শ্রমিক ইত্যাদি সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন। সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে মান্‌হাইম মার্ক্স্‌কে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

এ প্রসঙ্গে সন্দেহ হতে পারে যে, গোষ্ঠীর সংজ্ঞার উপর জোর দেওয়ার প্রকৃত কারণ হচ্ছে ইতিহাসে বুদ্ধিবাদীদের স্বাধীন স্বতন্ত্র ভূমিকা জোটাবার আগ্রহ। মান্‌হাইম পণ্ডিত, মার্ক্সের শ্রেণী সম্বন্ধে ধারণা তিনি নিশ্চয় **Eighteenth Brumaire** পুস্তিকায় পড়েছেন, বুদ্ধিজীবীরা যে আসলে ঠিক নির্দিষ্ট শ্রেণী নয় সে-কথা তাঁর অজানা নেই। শ্রেণীকে তাই পিছনে ঠেলে একবার গোষ্ঠীর ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই তাঁর যুক্তির বাকি অঙ্গগুলি নিরাপদে নিজ আসন গ্রহণ করতে পারে। সেই সঙ্গে বর্তমান যুগে দুই মূল শ্রেণীর সংঘাতের সমস্যা অসংখ্য গোষ্ঠীর বিচিত্র পর্দার আড়ালে আত্মপ্রত্যয় থেকে মিলিয়ে যাবে, মান্‌হাইমের মনে এ আশা থাকলে তাকেও কি ইউটোপিয়া বলা চলে না? আর তাঁর নিজের সংজ্ঞানুসারে বুদ্ধিবাদের সমন্বয়কে ইডিওলজি আখ্যা দেওয়াও বোধ হয় অন্যায় নয়—কেননা ধনিকতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এ দুয়ের মাঝামাঝি কোন্ অবস্থার ইঙ্গিত বুদ্ধিজীবীরা দিতে পারে তা বোঝা শক্ত এবং শ্রেণীসংগ্রামের ধারণা পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবাদ প্রচলিত বিধিব্যবস্থার রক্ষক হয়ে পড়তে বাধ্য। বুদ্ধিবাদের সমন্বয়ের কথায় একটা বিখ্যাত গল্পের কথা মনে পড়ে যায়। সন্তানের কি নাম রাখা হবে তা নিয়ে পিতামাতার মধ্যে প্রচুর বাক্‌বিতণ্ডার পর মিটমাট হয়—compromise-এ মাতার প্রদত্ত নামটিই রাখা হয়েছিল।

বর্তমান যুগে দুই মূল শ্রেণীর বিরোধকে প্রায় সম্পূর্ণ অবহেলা এবং শ্রেণীর বদলে গোষ্ঠীর ধারণার উপর অত্যধিক নির্ভরের ফলে, মান্‌হাইম ফাশিস্ট্ আন্দোলনের স্বরূপটিও ঠিক ধরতে পারেন নি। ফাশিস্ট্‌দের সাফল্য নিশ্চয়ই নানা স্তরকে আকৃষ্ট করবার ক্ষমতা এবং নেতাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে খোঁজা যায়। কিন্তু অন্তত জার্মানিতে কি সোশালিস্ট্‌দের নিশ্চেষ্টতা এবং পণ্ডিতদের বাক্যচ্ছটার ফলে মূল সংঘর্ষকে অস্পষ্ট ও আচ্ছন্ন করে তোলাও এর জন্য দায়ী নয়? ধনতন্ত্রকেই দৃঢ়তর ও সুরক্ষিত করার চেষ্টা ছাড়া ফাশিস্টেরা আজ পর্যন্ত আর কি করেছে? শুধু য়িহুদি উৎপীড়ন, 'রেস' বা সাম্রাজ্যের গুণকীর্তন, ও অস্ত্রের আস্ফালনে নূতন সমাজ গঠন চলে না। ফাশিস্ট্‌দের

আংশিক পথপ্রদর্শক গত শতকের বোনাপার্টিজ্‌ম্‌—আর Eighteenth Brumaireএ তার যা বিশ্লেষণ আছে, Wissenssoziologie এখনও তার কাছ থেকে কিছু শিখতে পারে।

মান্‌হাইমের গবেষণার আরম্ভ মার্ক্স্‌-এর সামাজিক ব্যাখ্যা থেকে, কিন্তু অন্যান্য বহুলোকের মতো তিনিও তাকে পরোক্ষে সংশোধিত, মার্জিত ও ভদ্রস্থ করে নেবার চেষ্টা করেছেন, এই বিশ্বাসই এত সমালোচনার কারণ। শুধু একটি কথার উল্লেখ করেই এখন প্রসঙ্গ শেষ করি। মান্‌হাইম লিখেছেন যে মার্ক্সের দুর্বলতা এই যে, তাঁর মতবাদও যে শ্রমিকশ্রেণীরূপ গোষ্ঠীর উপর গঠিত এ কথা ভুলে গিয়ে তিনি তাকে বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যার পদ দিতে চেয়েছিলেন। এর উত্তরে সহজেই বলা যায় যে, মার্ক্সের অন্তর্দৃষ্টির প্রাণ—জড়বাদ এবং ডায়ালেক্‌টিকে বিশ্বাস—এখন শ্রমিক স্বার্থের উপযোগী হলেও তার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়, পক্ষান্তরে জগৎ-সংসারের স্বাভাবিক গঠনই এর মূল, অন্তত মার্ক্সের তাই সিদ্ধান্ত ছিল। Objective dialectics-এ যদি কিছু সত্য থাকে, তাহলে বিশেষ কোনও যুগে শ্রেণীবিশেষের মতবাদ বেশি objective হতে কোনও বাধা নেই। আমাদের সমসাময়িক সংকটে তাই উদীয়মান শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর তরফ থেকে অধিক objectivityর দাবি করা আসলে সত্য হোক বা না হোক, ন্যায্যত একেবারেই অসম্ভব নয়।

॥ পরিচয় : শ্রাবণ ১৩৪৪ (১৯৩৭) ॥

'শৃঙ্খলিত মন'

ইয়োরোপ এবং আমেরিকার লেখকসমাজে গত আট বৎসরে একটা আলোড়ন উপস্থিত হয়েছে, তার সুস্পষ্ট প্রভাব সাময়িক সাহিত্যে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে দেখা যায়। ১৯২৯ সালে যে-বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকট আরম্ভ হয়েছিল তার ফলে ধনিক সভ্যতার ভিত্তি পর্যন্ত নড়ে উঠল। সেই দুর্দিনেও সোভিয়েট রাশিয়া অনেকখানি অবিচলিত থাকার ফলেই বোধহয় সাম্যবাদ ও ডায়ালেক্‌টিক-দর্শনের প্রতি পাশ্চাত্ত্য জগতের কৌতূহল বেড়ে উঠেছে। ১৯৩৩-এর হিট্‌লারি বিপ্লবের পর ফাশিস্ট্‌ ও সাম্যবাদী এই দুই পরস্পর-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী সাম্প্রতিক চিন্তাকে দ্বিধাবিভক্ত করতে উদ্যত হল। তারপর ১৯৩৬-এ এল স্পেনের অন্তর্বিরোধ। আজকের দিনের সকল আলোচনা এরই প্রতিঘাতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে বলা অত্যুক্তি হবে না।

ইংল্যাণ্ডে আর্থিক ও রাষ্ট্রিক তর্কের গণ্ডি ছাড়িয়ে সংস্কৃতি ও সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রেও যে ক্রমবর্ধিষ্ণু বামপন্থী চিন্তাধারা প্রবল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আলোচ্য পুস্তকটি তার অন্যতম নিদর্শন। এর সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেছেন কবি সিসিল ডে-লুইস; প্রবীণ সাম্যবাদী জ্যাক্‌সন, কৃতী বৈজ্ঞানিক বার্ণাল, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক কল্‌ভার-মার্শাল, নবীন কবি ম্যাজ, সম্পাদক রিক্‌ওয়ার্ড্‌ প্রভৃতি সুপরিচিত লেখকদের প্রবন্ধ এতে স্থান পেয়েছে। বামমার্গের নানা গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রন্থকারেরা বারটি বিভিন্ন অধ্যায়ে মূলসূত্র নির্ণয়ের যে-প্রচেষ্টা করেছেন সে-সন্ধান পলিটিক্সের ক্ষেত্রে আজকের দিনে সম্মিলিত জনশক্তি গড়ে তুলবারই অনুরূপ কাজ।

The Mind in Chains—edited by Cecil Day Lewis (Frederick Muller Lt l.)

এ-জাতীয় লেখা সফল হতে পারে দুই ভাবে। প্রবন্ধগুলিতে বর্তমান অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সর্বত্র কৃতকার্য হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। ব্যাখ্যা হয়তো মাঝে মাঝে যুক্তির আশ্রয় নেয় নি, বিশেষ বক্তব্য অনেক সময় কষ্টকল্পনায় পরিণত হয়েছে। থিওরির প্রয়োগে অক্ষমতা কি ভুল কিম্বা অযথা বিস্তার থাকলেই কিন্তু লেখা ব্যর্থ হয় না। অধ্যাপক হল্‌ডেন এ সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন যে যেমন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতিতেও মাঝে মাঝে ভুল হয় তেমনি মার্ক্সের মূলবিশ্বাসের প্রয়োগ ক্ষেত্রবিশেষে ঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য কয়েকটি বিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্তে নয়, তার দৃষ্টিভঙ্গী ও মূলবিশ্বাসেই তার যাথার্থ নির্ভর করছে। সুতরাং বইখানির বিচার এর উপরেই হওয়া উচিত এবং এদিক থেকে দেখলে অন্তত প্রথম ও শেষের প্রবন্ধ কয়েকটি আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় নি। এক সূত্রে যুক্ত বলে অবশ্য উপহাস করা সহজ যে এই লেখকদের মনই আসলে শৃঙ্খলিত, কিন্তু তখনই প্রশ্ন ওঠে যে তথাকথিত ‘স্বাধীন’ চিন্তা বস্তুতই স্বাধীন কিনা। সে-তর্কের মীমাংসা সুদূরপরাহত—তাই তার মধ্যে প্রবেশ না করে এই গ্রন্থের মূল বক্তব্যের এখানে কিছু পরিচয় দেওয়াই বোধহয় বাঞ্ছনীয়।

সংস্কৃতির তরফ থেকে ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে আজকাল এই অভিযোগ আনা যায় যে সামাজিক গঠন ও আর্থিক ব্যবস্থার ফলে সর্বত্রই একটা ব্যর্থতার ভাব ফুটে উঠেছে। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এখন নিজের কাজে গৌরব অনুভব কিংবা তার ফলে জগতের মঙ্গলসাধনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশ্বাস শিথিল হয়ে আসছে। শিক্ষা, সাহিত্যচর্চা, এমন কি বিজ্ঞান-আলোচনার মধ্যেও গ্লানি ও অবসাদের ভাব আজ নিতান্ত বিরল নয়। জার্মানি ও ইটালি প্রভৃতি দেশের লব্ধকীর্তি সংস্কৃতি আজ বিপন্ন, অন্য অনেক দেশেও তার প্রভাব এখন স্তিমিতপ্রায়। ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের যে-হিসাবনিকাশ ধনিক সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করছে, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পও তার থেকে অব্যাহতি পায় না বলেই অনেকের মতে তাদের এই দুরবস্থা। আর্থিক জগতের মতন এ ক্ষেত্রেও শক্তির অপচয় ও অপব্যবহার রয়েছে। তাছাড়া

শ্রেণীবিরোধ প্রবল হয়ে ওঠাতে জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার অনুভূতি জ্ঞানী বা শিল্পস্রষ্টার সূক্ষ্ম মনকে পীড়িত করতে বাধ্য। শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর একদিক থেকে। জীবনের জন্য প্রস্তুত করে তোলাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য, কিন্তু সমাজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে যে-প্রশ্ন ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে ধনিক কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল শিক্ষকদের সে-বিষয় নিরুত্তর থাকতে হয়, তাই শিক্ষাও হয়ে পড়ে প্রাণহীন। সেই প্রশ্নকে চাপা দেবার জন্য হয় কর্তব্যবুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করে প্রচলিত সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থাকে অসরল মনে সমর্থন, কিম্বা সমস্যাকে একেবারে এড়িয়ে শিক্ষার তুচ্ছতর কোনও অঙ্গ বা উদ্দেশ্যের উপর মনোনিবেশ ভিন্ন গতি থাকে না। আধুনিক সংস্কৃতিসংকটের আর এক চিহ্ন দেখা যায় ক্রমোন্নতি বা উৎকর্ষসাধনের সম্ভাবনার প্রতি গভীর অবজ্ঞার মধ্যে। সংশয়ের ভিতর তাই সজীব ও সবল চিন্তা এখন প্রায় লোপ পেতে বসেছে। বামপন্থী মতবাদের বিশ্বাস এই যে, এ অবস্থার মূল কারণ ধনতন্ত্রের অধঃপতন, ব্যক্তি-বিশেষের মানসিক দৌর্বল্য বা অক্ষমতা নয়।

কথা উঠতে পারে যে ধনতন্ত্রের যুগেও অনেক সময় সংস্কৃতির উৎকর্ষ দেখা গেছে, আজকের নৈরাশ্যের জন্য ধনিক প্রভুত্বকে দোষ দেওয়া কি সঙ্গত? ইংল্যাণ্ডে বণিকপ্রাধান্যের প্রারম্ভে এলিজাবেথীয় সাহিত্য, যন্ত্রযুগের সঙ্গে সঙ্গে রোমান্টিক কবিতা কি দেখা দেয় নি? রেনেসাঁস ও রেফর্মেশনের সময় কিম্বা উদার বিচারশীল গণতন্ত্রের আমলে মানুষের চিন্তাশক্তি তো অনেক অসাধ্য সাধন করেছিল, অথচ তখন তো ধনতন্ত্রের জয়যাত্রা অবাধে চলছিল। নূতন থিওরিতে এর উত্তর এই যে, ইতিহাসে একটা সময় ধনিকের অভ্যুদয়ই ছিল নবীন উদীয়মান শক্তি, শৃঙ্খল তারাই ছিন্ন করে সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারের পথ উন্মুক্ত করে, ধনতন্ত্র তখন ছিল বিপ্লবী ও প্রগতিপন্থী। কিন্তু তারপর স্থবিরতা এসেছে, ধনিক শ্রেণীর আর সেই পূর্বতন সতেজ সাহস ও স্বাধীন চিন্তা নেই, ঠিক যেমন আর্থিক জগতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমশ বিকল হয়ে পড়েছে। এখন বার্ধক্যের যুগে ধনতন্ত্র সংস্কৃতির ও সব ধরনের মুক্তির পথে

বাধাস্বরূপ, সে-বাধা দূর না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান সংকটের হাত থেকে উদ্ধার নেই। সমাজের মধ্যে যে-ভবিষ্যত ব্যবস্থা গড়ে উঠছে বলে বামপন্থীদের বিশ্বাস, কাল্চারকে এখন তার আশ্রয় খুঁজতে হবে, নয়তো তিলে তিলে ক্ষয় ও অধঃপতন অনিবার্য। ধনতন্ত্রের উপর নির্ভরই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে তার শৃঙ্খল, ঠিক যেমন এক সময় ফিউডাল সমাজব্যবস্থা ও সনাতনী ধর্মবিশ্বাস ছিল চিন্তার কঠোর বন্ধন। এই বিশ্বাসের মূল ইতিহাসে ডায়ালেক্টিক দৃষ্টিভঙ্গী—মার্ক্সের এই সূত্রই আলোচ্য গ্রন্থের প্রাণবস্তু।

সংস্কৃতি শুধু আর্থিক ব্যবস্থার যান্ত্রিক প্রতিফলন অবশ্য নয়, তাহলে তার সম্বন্ধে ভাববার কোন প্রয়োজনই থাকত না। তার একটা পৃথক সত্তা ও সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তাকে তাল রেখে চলতে হবে আর্থিক পরিবর্তনের ধারার সঙ্গে। না-চলবার স্বাধীনতা হয়তো তার আছে, কিন্তু তাহলে পরিণামে কাল্চারেরই হবে ক্ষতি, তাতে সাময়িক ভাবে তিমির যুগ ফিরে আসাই সম্ভব। বামপন্থীর বক্তব্য এই যে, যাঁরা সংস্কৃতির পুরোধা তাঁদের কর্তব্য ডায়ালেক্টিকের মর্মগ্রহণ করে ভবিষ্যতকে বরণ করা, অন্ধভাবে পুরাতনকে আঁকড়ে থাকলে আসলে কাল্চারেরই সর্বনাশ—আর সমস্যাকে অস্বীকার করা হল তারই নামান্তর। এ প্রস্তাবে অনেকেই আপত্তি করবে, কিন্তু সে-বিবাদ আসলে ডায়ালেক্টিক্‌কে অস্বীকারেরই সামিল। এইখানে সমাজের গতি সম্বন্ধে মূল প্রশ্নের সঙ্গে সংকীর্ণতর সংস্কৃতিসংকটের যোগ।

সমাজের মধ্যে যখন ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়ে শ্রেণীসংঘর্ষ প্রবলতর হয়ে ওঠে তখন পরিবর্তন ও বিপ্লবের যুগ আসন্ন ভাবা উচিত। সংস্কৃতির প্রচলিত রূপেরও তখন সমস্যা উপস্থিত হয়। বিচার ও নীতির দোহাই দিয়ে তখন নূতন চিন্তাস্রোতকে আটকাবার চেষ্টা স্বাভাবিক। তাতেও বিশেষ ফল না পেলে পুরাতনপন্থীরা কাল্চারকে বিসর্জন দিতেও উদ্যত হতে পারে। এর উদাহরণ ফাশিস্ট্ দেশে আজ বিরল নয়। জার্মান সংস্কৃতির বর্তমান দুর্দিন অনেক লেখককে পীড়া দিয়েছে। কিন্তু ধনতন্ত্রের আত্মরক্ষার জন্যই পুরাতন আদর্শকে অকস্মাৎ ত্যাগ করতে হচ্ছে, এ ব্যাখ্যা কি ভেবে দেখবার নয়?

ইংল্যাণ্ড্ বা আমেরিকায় ধনিক প্রভুত্বের ভবিষ্যত এখনও অত অন্ধকার নয় বলেই হয়তো সেখানে সংস্কৃতির উদার রূপ টিঁকে আছে, কিন্তু সেখানেও বিপদ এগিয়ে আসছে। ফস্টার ইংল্যাণ্ডে সে-বিপদকে ফেবিও-ফাশিজ্ম্ আখ্যা দিয়েছেন, তার গতি মন্থর হলেও সে কাল্চারের পরিপন্থী। পক্ষান্তরে যে-উদার আদর্শে আমরা অভ্যস্ত তার সঙ্গে সোশালিজ্মের কোন চিরন্তন প্রকৃতিগত বিরোধ নেই, তাই স্পেণ্ডার প্রমুখ নবীন লেখকেরা সাম্যবাদকেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গত যুগের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করেছেন।

সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে বামপন্থীরা এমন কথা বলে না যে, সাম্যবাদী লেখক বই লিখলেই সে-বই ভাল হবে কিম্বা সাহিত্য সম্বন্ধে ভাল মন্দ কোন আখ্যাই দেওয়া চলে না। এককালে সাহিত্যের বিচার ছিল অনেকটা আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ কতকগুলি চিরন্তনী সত্যকে উদ্ভাসিত করার সাফল্যই ছিল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ। রিচার্ড্স্ প্রমুখ সমালোচকেরা দেখিয়েছেন যে সৌন্দর্য, আনন্দ, মঙ্গল প্রভৃতি ধারণার সর্বসম্মত রূপ পাওয়া কঠিন। তাঁরা আবার বোধহয় ভাবেন যে সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের মনের সূক্ষ্ম আবেগ প্রকাশের বাহন মাত্র। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক শূন্যে বিচরণ করতে পারে না এবং মানুষ একক নয়। তাই প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ সাহিত্যের মূলাধার, তার প্রকাশরূপ যতই বিচিত্র, নৈর্ব্যক্তিক ও কল্পনাপ্রবণ হোক না কেন। এ গ্রন্থের অন্যতম লেখক আপ্ওয়ার্ডের মতে তাই উচ্চাঙ্গের সাহিত্যকে বাস্তব হতে হবে। বাস্তব অর্থে অবশ্য বহির্জগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ ফোটোগ্রাফি বোঝায় না—তেমন বিবরণ অনেক সময় প্রকৃত রূপ ধরতেই পারে না। তাই সাহিত্যে অন্তদৃষ্টির এত আদর। মানুষের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের যোগের মধ্যেও কিন্তু পরিবর্তন ও গতি আছে, সেখানেও ডায়ালেক্‌টিকের প্রভাব রয়েছে। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেই ছন্দকে রূপ দেওয়াই প্রকৃত বাস্তবসাহিত্য সৃষ্টি।

প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতে যে-অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠে সাহিত্যের মূল বস্তু তাই;—সে-অভিজ্ঞতার রূপ পরিবর্তনই সাহিত্যিক

প্রগতির নিয়ন্ত্রণের হেতু। কিন্তু বিষয়বস্তু ছাড়াও সাহিত্যে আর একটা দিক আছে—প্রকাশভঙ্গী। তার অভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতাও সাহিত্যের পর্যায়ে উঠতে পারে না। স্টাইলের এই নৈপুণ্যকে হয়ত বিষয়ের dialectical opposite বলা যায়, যদিও এ কথা আপ্‌ওয়ার্ড্‌ বলেন নি। এই দুইটির পরস্পর সংমিশ্রণে যে-সিন্‌থেসিস উৎপন্ন হয় তাকেই সাহিত্যিক সাফল্য আখ্যা দেওয়া চলে এবং তার ভিতর আমরা নূতন এক qualityর পরিচয় পাই। এ প্রসঙ্গে বামপন্থীদের প্রধান কথা এই যে, বর্তমান সংকটে সাহিত্যসৃষ্টি অনেকখানি নির্ভর করছে লেখকদের উদীয়মান চিন্তাধারার সঙ্গে যোগের উপর। পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান ধারাই আজকের দিনে বাস্তব বিশ্বালোচনার মূল কথা—সে-অন্তর্দৃষ্টির অভাব থাকলে লেখকের পক্ষে futilityর অবসাদই এখন বেশি সম্ভব। তার উপর নিশ্চয় প্রকাশনৈপুণ্য থাকা দরকার, কিন্তু প্রথমটির অভাবে সাহিত্যসৃষ্টির আন্তরিক আবেগই ক্রমশ শুকিয়ে যাবে; তখন বস্তুর অভাবে কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগও কমে আসবে। এ ছাড়াও অবশ্য কাল্‌চারের উপর ফাশিস্ট্‌ আক্রোশের সমূহ বিপদ রয়েছে।

সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাতে অভিজ্ঞতার রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের লেখাকে আমরা নূতন ভাবে দেখতে শিখি। যে-লেখাকে এই ভাবে ভবিষ্যত যুগ নূতন করে দেখতে পারে তাকেই মহৎ লেখা বলা যায়। সে-জাতীয় লেখকের মধ্যে স্টাইলের ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার প্রসার ও অন্তর্দৃষ্টি নিশ্চয়ই থাকে। শক্তিমান লেখক যদি স্থিতিশীল যুগের বদলে পরিবর্তন ও সংকটের সময় জন্মান, তবে উদীয়মান ভাবধারার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ স্বপ্রকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। মিল্‌টন বা বানিয়ানের জীবন এ সিদ্ধান্তকে খণ্ডিত করে না। তাঁদের সময় রাষ্ট্রনীতির জগতে পিওরিটান পরাজয় ঘটে থাকলেও রেস্টরেশনের সাময়িক উত্তেজনার পর ইংল্যাণ্ডের জাতীয় জীবনে মধ্যশ্রেণীর উপযোগী পিওরিটান প্রভাব কিছু ক্ষুণ্ণ হয় নি, তাকে তখন পতনোন্মুখ ভাবা কঠিন।

যে-শ্রেণীর সামাজিক অবস্থান ক্ষয়ের মুখে, তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত কাল্‌চারও সংকীর্ণ হয়ে পড়তে বাধ্য। আর এ কথা বলাও শক্ত যে, সামাজিক বিপ্লবের যুগে সাহিত্যিক বা শিল্পী বাস্তবকে অগ্রাহ্য করে মানসকুঞ্জবনে সর্বদা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারবেন। ইংল্যাণ্ডের নূতন সাহিত্যিকেরা তাই অনেকেই বর্তমান সংঘষে জড়িয়ে পড়ছেন। সকলে পলিটিক্সে নামবেন এমন কথা অবশ্য নেই কিন্তু রাষ্ট্রিক সমস্যাকে অস্বীকার করা ক্রমশ দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। সকলে বড় লেখক হয়ে উঠবেন এমন কথা বলা চলে না কিন্তু তাঁদের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি ও আশার রেখা দেখা দিয়েছে। উইস্টান অডেন লিখছেন—

> "Seekers after happiness, all how follow
> The convolutions of your simple wish,
> It is later than you think—"

এই অনুভূতি আলোচ্য গ্রন্থটিকে অনুপ্রাণিত করছে। আর সেই জন্য সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানের ভবিষ্যত ভেবেই এই লেখকেরা সম্মিলিত জনশক্তিকে ফাশিজ্‌মের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করবার আদর্শকেই মন্ত্র রূপে গ্রহণ করেছেন।

বুদ্ধিজীবীরা নিজের প্রচেষ্টায় এ উদ্দেশ্য সফল করবে এমন দুরাশা এ লেখকদের নেই। তাঁরা স্বীকার করেন যে ভবিষ্যত নির্ভর করছে শ্রমিক শ্রেণীর উপর আর তাঁদের উচিত সে-শ্রেণীর সহায়তা করা। তাই শ্রমিকদের সংস্কৃতির ভবিষ্যত রক্ষক রূপে সম্মান করা হয়। কাল্‌চারের অস্তিত্ব ও প্রসার ক্রমশই শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের অঙ্গ হয়ে পড়বে বলে এঁদের বিশ্বাস। গত শতকের উদার আদর্শবাদীদের পতন সুরু হল সেই মুহূর্তে যখন তারা বুঝতে চাইল না যে, ভবিষ্যতের একমাত্র ভরসা শ্রেণীশূন্য সমাজ গঠন। ডায়ালেক্‌টিক্‌কে তারা উপেক্ষা করে এভলিউশনের নামে—অথচ ডায়ালেক্‌টিক আসলে এভলিউশনেরই ব্যাপক প্রয়োগ ও সার্থক রূপনির্দেশ মাত্র। শ্রমিক অধিনায়কত্ব উদার মতবাদীর কাছে অসহ্য অথচ ধনিক কর্তৃত্ব মেনে নিতে তাদের আপত্তি নেই, যদিও বাধা অপসারণের জন্যই শ্রমিকশাসনের উদ্ভব।

সোশালিজ্‌মের ভবিষ্যত অজ্ঞেয় বলে পণ্ডিতেরা ভয় পান, কিন্তু বর্তমানকে ভুলে দূর অনাগতের সম্বন্ধে ব্যাকুল হওয়া তাঁদেরই উপযুক্ত। অতীতের কাল্‌চার শ্রমিকেরা সমূলে উৎপাটিত করবে এ আশঙ্কাও কি অমূলক নয়? সম্পূর্ণ নূতন শ্রমিকসংস্কৃতি গঠনের চেষ্টাকে লেনিন নিন্দা করেছিলেন—সে-উদ্যম বাস্তবকেই অবহেলা করে বোহেমীয় আদর্শবাদের ইউটোপিয়ায় পরিণত হতে বাধ্য। উদার মতবাদে আজ সমস্যা এড়াবার শেষ যুক্তি—রাশিয়ায় লাঞ্ছিতদের অভিজ্ঞতা। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদিও মেনে নেওয়া যায় যে সেখানে বহু অনাচার হয়েছে, তবু প্রশ্ন থাকে যে বিভীষিকার তাণ্ডবলীলা কিংবা থামিডরের আদর্শচ্যুতি কি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শকে সে-যুগে ব্যর্থ ও পঙ্গু করতে পেরেছিল?

।। পরিচয়: অগ্রহায়ণ ১৩৪৪ (১৯৩৭)।।

সাম্যবাদ ও রুশ বিপ্লব

আঠারো শতক থেকে রাশিয়া ইয়োরোপে প্রধান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আসন পেয়েছে। উত্তরোত্তর তার শক্তি অনেকদিন বৃদ্ধি পেল। উনবিংশ শতাব্দীতে রুশ সম্রাট জারদের রাজ্যমধ্যে স্বেচ্ছাচার ও বাইরে প্রতাপ প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়। ১৯১৭-তে সে-শক্তির উচ্ছেদসাধন সুতরাং সম্পূর্ণ আকস্মিক হতে পারে না। বস্তুত ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর থেকে রুশ রাজ্যের প্রসার অনেকখানি বাধা প্রাপ্ত হতে লাগল। দেশের মধ্যে সংস্কারকামনার উদয়ও প্রায় সেই একই সময়ে। প্রথম নিকোলাসের রাজত্বে, অর্থাৎ ঠিক একশত বৎসর আগে, রুশ চিন্তারাজ্যে প্রখর বাদানুবাদের পর জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের উপাসক স্লাভোফিল দলের চাইতে সংস্কারক পশ্চিমপন্থীদের প্রভাব প্রবলতর হতে লাগল। ক্রমে সে-ভাবধারা রাষ্ট্রিক আন্দোলনে পরিণত হলে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রাষ্ট্রশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে নেবার জন্য কয়েকটি সংস্কার আনলেন। ব্যবস্থাগুলি বহুপূর্বে আনা উচিত ছিল, সে জন্য, এবং তাদের মধ্যেও উদারতার অভাবের ফলে দেশে কিন্তু অসন্তোষ লাঘব হল না। কৃষকসাধারণ অর্ধদাসত্বপ্রথা লোপের পর দেশের কিছু জমি পেলেও, পূর্বতন প্রভুদের ক্ষতিপূরণের ভার তাদের উপরই পড়ল। রাজ্যশাসনে অবাধ রাজতন্ত্রের তখনও অবসান হয় নি। তাই চরমপন্থীদের সঙ্গে শাসকদের প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল।

এ সময়ের আন্দোলন (গত শতকের তৃতীয় পাদে) নারোদনিক নামে খ্যাত। একদিকে রাজার অত্যাচার, অন্যদিকে নিহিলিস্ট্ নামে পরিচিত সন্ত্রাসবাদ রাশিয়াকে তখন মথিত করে। বাকুনিনের প্রভাবান্বিত এসার দল রাশিয়ায় প্রথম সোশালিজ্‌মের ধ্বজা তুলল কিন্তু তার কিছু পরে যন্ত্র-

শিল্পের প্রসারের সঙ্গে মার্ক্সের অনুগামী সোশাল ডেমক্র্যাটদের উদ্ভব হয় প্লেখানভের নেতৃত্বে। তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ও দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে ওদিকে দমননীতির পরাকাষ্ঠা দেখা গেল। শুধু সন্ত্রাসবাদীরা নয়, সকল প্রকার সোশালিস্ট্, এমনকি উদার মতাবলম্বী লোকেরা এবং সংখ্যান্যূন জাতিদের নেতারা পর্যন্ত দণ্ডিত হতে থাকে। দমন ও বিপ্লব-প্রচেষ্টার সংঘাত তখনকার রুশ সাহিত্যেরও পটভূমিকা; সাইবেরিয়ায় নির্বাসন-দণ্ডের কথাও সুপরিচিত।

বিদেশে লণ্ডনে রুশ সোশাল ডেমক্র্যাটদের দ্বিতীয় মহাসভায় দলভঙ্গ হল —মেন্‌শেভিক মত অগ্রাহ্য করে লেনিনের অনুচরেরা তাদের সে-সভায় সংখ্যাধিক্যের জন্য বল্‌শেভিক নামে খ্যাত হয়। মতভেদের কারণ লেনিনের মতামত—তিনি মার্ক্সীয় দলটিকে বিপ্লবব্রতীরূপে সংগঠিত করতে চান আর অনেক বিষয়ে মার্ক্স্‌বাদের প্রচলিত ব্যাখ্যা তাঁর ভুল মনে হতে থাকে। প্লেখানভ ক্রমশ মেন্‌শেভিক ভাবাপন্ন হয়ে পড়েন, তাই লেনিনই বল্‌শেভিক-দের প্রকৃত নেতা হন। তাঁর স্বদেশে ফেরার উপায় ছিল না কিন্তু স্টালিন প্রভৃতি বল্‌শেভিক কর্মীরা দেশের মধ্যে গোপনে প্রচার চালালেন। মেন্‌-শেভিকদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে রাশিয়া আর্থিক হিসাবে অনুন্নত বলে প্রথমে পশ্চিম ইয়োরোপের অনুরূপ উদার গণতন্ত্র সে-দেশে স্থাপিত হবে, তারপর কালে সোশালিজ্‌ম্ স্থাপন সম্ভব হবে। বল্‌শেভিক মতে মার্ক্স্ কখনও এমন যান্ত্রিকভাবে বিবর্তনের কল্পনা করেন নি। লেনিন দেখালেন যে ধনতন্ত্র এখন পৃথিবীব্যাপী, কাজেই রাশিয়া অন্য দেশের মতন অগ্রসর না হলেও সেই আর্থিক ব্যবস্থারই অঙ্গ হয়ে পড়েছে। বিরোধের ফলে ধনতন্ত্র ভেঙে পড়াকে লেনিন টানের চোটে শৃঙ্খল ছেঁড়ারূপে কল্পনা করেছিলেন। শিকল ছিঁড়বে নিশ্চিত জানলেও ঠিক কোথায় ছিঁড়বে আগে থাকতে তা জানা যায় না, তবে এটুকু বলা সম্ভব যে দুর্বলতম স্থানটিই আগে ছিন্ন হবে। কাজেই কোনও কারণে ধনতন্ত্রের ব্যবস্থা কোথাও দুর্বল হয়ে পড়লে সেখানে শ্রমিক বিপ্লব ঘটতে পারে। যুদ্ধের ফলে রাশিয়ায় তাই হল, কিন্তু বল্‌শেভিক

মতবাদ আগে থাকতেই সে-সম্ভাবনা ধরতে পেরেছিল। ১৯১২ সালের মধ্যে বল্‌শেভিকেরা মেন্‌শেভিকদের সম্পূর্ণ ছেড়ে পৃথক দল গঠন করল।

জাপানের হাতে পরাজয়ের পর রাশিয়ায় তুমুল আন্দোলন হয় (১৯০৫)। নানা দলের মিলিত চাপে সম্রাটকে বাধ্য হয়ে নিয়মতন্ত্র অঙ্গীকার করতে হল। ডুমা অর্থাৎ প্রতিনিধি-সভা এভাবে স্থাপিত হলেও গণ্ডগোল অবসানের পর ধীরে ধীরে সব ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। কিন্তু দেশের মধ্যে অসন্তোষ আরও পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে লাগল। তারপর এল মহাসংগ্রাম (১৯১৪)।

মার্ক্স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ বরাবরই বলেছিলেন যে তাঁরা শুধু মূলসূত্র ও বিশ্লেষণ প্রণালীর উদ্ভাবন করেন, তাঁদের মতবাদ মুখস্থ বিদ্যা নয়, বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী মাত্র। কাউট্‌স্কির প্রামাণ্যতা অগ্রাহ্য করে লেনিন ইতিমধ্যে পারিপার্শ্বিকের পর্যালোচনায় মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়োগ করেছিলেন। ধনতন্ত্রের সমসাময়িক রূপকে তিনি সাম্রাজ্যতন্ত্র আখ্যা দিলেন—তার চালক শক্তি হচ্ছে ফিনান্স্‌ ক্যাপিটাল, তার ঝোঁক মনোপলি বা একচেটিয়া কর্তৃত্বের দিকে। শক্তিশালী দেশ মাত্রই তাই আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধনিকদের তাড়নায় কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়তে উদ্যত। স্বভাবতই পৃথিবী ভাগাভাগি কাড়াকাড়িতে পরিণত হলে যুদ্ধের উদয় হবে—আর তখন আসবে শ্রমিকদের সুযোগ। ধনিকতন্ত্রের শান্তভাবে সমাজতন্ত্রে পরিণত হবার প্রত্যাশা কাউট্‌স্কির মনে ছিল। সে-আশা ইংরাজ ফেবিয়ান্‌দের মন্থর পরিবর্তনের ধারণা থেকে অভিন্ন। লেনিন ঘোষণা করলেন যে সাম্রাজ্যতন্ত্র তিনদিক থেকে চাপের জন্য অচিরে ভেঙে পড়বে—দেশের মধ্যে শ্রমিকদের অসন্তোষ, অধীন অনুন্নত জাতিদের মুক্তি-প্রয়াস, এবং মহাশক্তিদের স্বার্থপ্রণোদিত সংঘর্ষ। লেনিনের ধারণাগুলিকে, স্টালিনের ভাষায়, সাম্রাজ্যতন্ত্রের যুগোপযোগী মার্ক্স্‌বাদরূপে অভিহিত করাই সঙ্গত।

মহাযুদ্ধের সময় জারতন্ত্রের অক্ষমতা বারবার প্রকাশ পাওয়াতে অসন্তোষ ও সংস্কারকামনা আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। রাস্‌পুটিন নামে এক

খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী রাজ পরিবারের শনিরূপে সম্রাট সাম্রাজ্ঞীর অপ্রিয়তা বৃদ্ধির কারণ হন। তাঁর মৃত্যুর পর সম্রাটের শিথিল হাত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়বার উপক্রম হল। ১৯১৭ সালের প্রথমে রণক্লান্তি, খাদ্যাভাব, ধর্মঘট, দমনচেষ্টা, অবস্থা সঙ্গীন করে তোলে। পেট্রোগ্রাডে মার্চের প্রথমে সৈন্যেরা শ্রমিকদের উপর গুলি চালাতে চাইল না। তারপর বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়াতে, ডুমা-সভার এক সমিতি রাজ্যভার গ্রহণ করে এবং সম্রাটকে পদত্যাগ করতে হয়। ইতিহাসে এর নাম ১৯১৭ সালের প্রথম বা মার্চ্ বিপ্লব।

ক্রমে এসার নেতা কেরেন্স্কি দেশের শাসক হয়ে পড়েন, কিন্তু নানা দলের মিলিত কর্তৃত্বই নূতন সাধারণতন্ত্রকে তখন চালাতে থাকে। স্থির হয় যে সমস্ত জনসাধারণের এক বিরাট প্রতিনিধি-সভা ভবিষ্যত শাসনপদ্ধতি ঠিক করবে আর নূতন রাষ্ট্রশক্তি আগের মতনই যুদ্ধ চালাতে থাকবে। ইতিমধ্যে লেনিন ও নির্বাসিত অন্য সব নেতাদের দেশে ফেরা সম্ভব হয়েছিল।

মেন্শেভিকেরা তাদের মতানুসারে দেশে পরবর্তী পর্যায় হিসাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্র স্থাপন প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু লেনিনের মনে হল ধনিকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শ্রমিক বিপ্লবের সুবিধা উপস্থিত হয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ নূতন কর্মপদ্ধতির উদ্ভাবন করে ফেলেন। সময়োপযোগী ব্যবস্থার প্রবর্তন মার্ক্স্পন্থার একটা বৈশিষ্ট্য। ১৯০৫-এর বিপ্লবে পেটোগ্রাডে শ্রমিকেরা সোভিয়েট নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়েছিল। ১৯১৭-র মার্চে তার পুনর্স্থাপন হয় এবং অন্যান্য স্থানেও অনেক সোভিয়েট দেখা যায়। সোভিয়েট শুধু শ্রমজীবিদের সমিতি—কিন্তু নির্বাচনের কেন্দ্রগুলি বাসস্থান অনুযায়ী পল্লীসমূহ নয়, কারখানা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন কর্মস্থল হিসাবে প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা এর বিশেষত্ব। যে-কোন মুহূর্তে পুরাতনের জায়গায় নূতন প্রতিনিধি পাঠাবার ক্ষমতা থাকায় সোভিয়েটে শ্রমিকদের ইচ্ছা সক্রিয় থাকতে পারে। লেনিনের আন্দোলনের মন্ত্র হল এখন যে সোভিয়েটগুলির হাতেই সকল ক্ষমতা দেওয়া হোক। সহসা সমগ্র দেশের প্রতিনিধি-সভার আদর্শ খর্ব করে শ্রমিক শ্রেণীর

প্রাধান্যের কলরব উঠল। কৃষকদের দলে টানবার জন্য লেনিন দাবি করলেন যে জমিদারের জমি কেড়ে চাষীদের হাতে দেওয়া হোক। অত্যাচারিত সংখ্যান্যূন অনেক জাতির রুশ দেশে বসবাস; লেনিনের তৃতীয় প্রস্তাব, এদের পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব দেওয়া। আর সমস্ত দেশের প্রকৃত ইচ্ছা মূর্ত হল তাঁর চতুর্থ প্রস্তাবে—যুদ্ধ থামিয়ে তৎক্ষণাৎ শান্তির আয়োজন।

জুলাই মাসে একটা বিদ্রোহের চেষ্টা ব্যর্থ হলে লেনিনকে অজ্ঞাতবাসে থাকতে হয়। সেই দারুণ উদ্বেগের সময় তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকা—রাষ্ট্র ও বিপ্লব—রচনা হল। তারপর নভেম্বরে বিপ্লবচেষ্টা করল সাফল্যলাভ। নবাগত ট্রট্স্কির সাহায্যে লেনিন ও তাঁর সহকর্মীরা শাসনযন্ত্র অধিকার করলেন। এই সময়ে দশটি স্মরণীয় দিনের প্রত্যক্ষ বিবরণ রীড নামে এক আমেরিকান লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। যে-চার প্রস্তাবে লেনিন জনমতকে উত্তেজিত করেছিলেন, বল্‌শেভিকদের প্রথম কর্তব্য হল সেগুলি অনুমোদন এবং কাজে পরিণত করবার প্রয়াস। জাতীয় প্রতিনিধিসভার বদলে শ্রমিকসমিতি বা সোভিয়েটগুলি নূতন রাষ্ট্রের অঙ্গ হওয়াতে রাশিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ান নামে পরিচিত হল। ইতিমধ্যে অবশ্য সোভিয়েটসমূহ বল্‌শেভিকদের হাতে এসে পড়েছিল।

১৯১৭-র নভেম্বর থেকে ১৯১৮ সালের জুন পর্যন্ত আট মাস বল্‌শেভিক শাসনের প্রথম অধ্যায়। লেনিনের প্রস্তাবের কিছু কিছু সোশালিস্ট আদর্শের আপাতবিরোধী হলেও তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে, প্রথম কর্তব্য হল শাসনযন্ত্র অধিকার এবং দ্বিতীয় হচ্ছে সে-অধিকার অটুট রাখার চেষ্টা। তাই কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করা হয় এবং ছোট ছোট জাতির স্বায়ত্তশাসন পায় আর ব্রেস্ট্‌লিটভ্‌স্কের সন্ধিতে রাশিয়া রাজ্যক্ষয় করেও শান্তি আনে। ধনিকদের একেবারে উচ্ছেদ তখনও হয় নি; কেন্দ্রীয় আর্থিক পরিষদ ও ফ্যাক্টরিগুলিতে শ্রমিক প্রতিনিধি নিয়ে পরিচালকসমিতি গঠন আর্থিক ব্যাপারে প্রথমটা ধনিকদের সহযোগে একরকম দ্বৈত শাসনের প্রবর্তনা করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৯১৮-র জুন থেকে ১৯২১-র অগস্ট্ পর্যন্ত। এই সময়টা বল্‌শেভিকদের অগ্নিপরীক্ষার যুগ। অন্তর্বিরোধ আরম্ভ হল—বল্‌শেভিকদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে নানা দিকে বিদ্রোহ দেখা দিতে লাগল। উত্তরে যুডেনিচ, দক্ষিনে ডেনিকিন ও র‍্যাঙ্গেল, পূর্বে কল্‌চাক বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন। জার্‌তন্ত্রের ঋণ শোধে বল্‌শেভিকেরা অস্বীকাব করার নজীরে মিত্রশক্তিরা সোভিয়েটের শত্রুদের সাহায্যে উদ্যত হল। ইংরাজ, ফরাসী, জাপানী ও মার্কিন সৈন্য রুশদের আক্রমণ করে। বল্‌শেভিকদের দৃঢ়তা কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। মধ্য ইয়োরোপে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা, রাশিয়াকে আক্রমণ করাতে পশ্চিমে শ্রমিকদের অসন্তোষ, ও সোভিয়েটের গৃহশত্রুদেব অকৃতকার্যতা শেষ পর্যন্ত মিত্রশক্তিদের অভিযান ব্যর্থ কবে। পোলেবা শুধু এই সুযোগে রাজ্যবিস্তারে সমর্থ হয়েছিল। এই জীবনমরণের সমস্যার সময়ই লেনিনকে বাধ্য হয়ে সামরিক সাম্যতন্ত্রেব ব্যবস্থা কবতে হয়। নূতন রাষ্ট্রশক্তি তখন সমস্ত আর্থিক ব্যবস্থা নিজের হাতে নেয়। ধনিকদের উচ্ছেদ হল। যন্ত্রশিল্প এল স্টেটের কর্তৃত্বে, কৃষকদের সঙ্গে শস্যের পবিবর্তে অন্য পণ্য সরবরাহের চুক্তি হয়। রাষ্ট্রশক্তিব সর্বৈব কর্তৃত্ব যুদ্ধজয়ে সাহায্য কবল বটে, কিন্তু এতে দেশেব ভিতরে অভাব ও গণ্ডগোল বহুল বৃদ্ধি পেল।

১৯২১ সালে লেনিন নূতন আর্থিক ব্যবস্থা, সংক্ষেপে নেপ্‌-পদ্ধতির আশ্রয় নিলেন। 'সাম্যবাদেব অবসান হল' চারিদিকে তখন এই রব উঠলেও বোঝা সহজ যে বল্‌শেভিকেবা শুধু নানা সাময়িক উপায়ে নিজেদের কর্তৃত্ব দৃঢ়তব করেছিল, মূল লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয় নি। পবে ১৯২৮-এ আর্থিক নীতিপরিবর্তন এ কথা সপ্রমাণ করে। নেপের আমলে কৃষকদের এবং ব্যবসায়ীদের স্বাধীনতা অনেকখানি ফিবে আসে। আর বিদেশী ধনিকদেরও কিছু কিছু সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু ধনতন্ত্রের পূর্বাবস্থায় দেশ ঠিক ফিরে যায় নি মনে রাখতে হবে। বড় কারখানাগুলি এবং বহির্বাণিজ্যের কর্তৃত্ব নেপের আমলেও রাষ্ট্রের হাতে থাকে। তাই ধনিকদের ক্ষমতা কিছু ফিরে

এলেও আর্থিক ব্যবস্থা একেবারে সোভিয়েট শক্তির মুষ্টিচ্যুত হল না। নেপ্‌কে বস্তুত নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর হিসাবে দেখা উচিত। কিন্তু এরই মধ্যে ১৯২৪-এর প্রথমে লেনিনের মৃত্যু হল।

লেনিনের শাসনসম্পর্কে আর দুটি বিষয়ের—বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ এবং নূতন রাষ্ট্রশক্তি সংগঠনের উল্লেখ করেই তাঁর কথা শেষ করতে হবে। ১৯১৮-১৯ এ শ্রমিক বিপ্লব নানা দেশে ছড়িয়ে পড়বার খুবই সম্ভাবনা ছিল। বল্‌শেভিকেরা মার্ক্সের ব্যবহৃত সাম্যবাদী নাম গ্রহণ করে কমিন্‌টার্ন্‌ অথবা তৃতীয় শ্রমিক-আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করল—সর্বত্র বিপ্লবের প্রসার ছিল তার লক্ষ্য। যুগসন্ধির সময় কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জগত লেনিনকে অগ্রাহ্য করে উইল্‌সন-পন্থাই অনুসরণ করে। কিছুদিনের মধ্যে সাম্যবাদীরা পর্যন্ত বুঝল যে ধনিকতন্ত্র টলমল করে উঠলেও খানিকটা সামলে নিয়েছে। হাঙ্গেরিতে বেলাকুনের বল্‌শেভিকি আধিপত্য ধনিকেরা ধ্বংস করল রোমানিয়ার সৈন্যের সাহায্যে। জার্মানিতে বিপ্লবের পর ধীরে ধীরে মধ্য-শ্রেণীর কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠ হল। রাশিয়ার মধ্যে বিপ্লব জয়যুক্ত হলেও শেষ পর্যন্ত বাইরে তার পরাজয় হয়। ১৯২৩-এর পর আমেরিকার আর্থিক সাহায্যের সম্ভাবনা পশ্চিমে বিপ্লবের ভয় অপসারণ করতে পেরেছিল। কিন্তু সে-সম্ভাবনার অনেক আগে থাকতেই সোভিয়েট রাশিয়া বিদেশ সম্বন্ধে নিরপেক্ষনীতি অবলম্বন করে। ১৯২০ সালেই চিচেরিন মার্কিন গভর্ণমেণ্ট্‌কে জানান যে, সোভিয়েট শক্তি অন্য দেশের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। জারদের সুবিদিত অগ্রসরনীতি তাই প্রথম থেকে সযত্নে পরিত্যক্ত হয়েছিল। তার উদাহরণ ব্রেস্ট্‌লিটভ্‌স্কের রাজ্যক্ষয় অঙ্গীকার পালন, দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র জাতিগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান, এবং একদিকে তুরস্ক অন্যদিকে চীনের উপর চাপ দেবার লোভ সম্বরণ। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে শান্তিপ্রিয়তা শুধু এখন নয়, লেনিনের আমল থেকেই সোভিয়েট ইউনিয়ানের বিশেষত্ব। এর কারণ নিশ্চয়ই আভ্যন্তরিক সংগঠনকার্যে ব্যস্ততা এবং বিদেশে ছড়িয়ে পড়বার আর্থিক

তাগিদের অভাব। তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্থানের সঙ্গে রুশদের নূতন সদ্ভাব ১৯২১-এর সন্ধিগুলির থেকে আরম্ভ; চীনের সঙ্গেও মৈত্রী হল ১৯২৪-এ। ক্রমে ক্রমে পশ্চিমের প্রতিবেশীদের সঙ্গেও সন্ধিস্থাপন হয় যদিও সীমান্ত নিয়ে পোলাণ্ড্ ও রোমানিয়ার সঙ্গে কিছু মনোমালিন্য থেকে গেল। এ সময় বড় রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েটকে অস্পৃশ্য করে রাখাতে লাঞ্ছিত জার্মানির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল (রাপালোর সন্ধি, ১৯২২)।

নূতন রাশিয়ার আভ্যন্তরিক অবস্থার আলোচনা সময়সাপেক্ষ। শুধু মনে রাখা উচিত যে অশেষ দুর্গতি ও অনেক অত্যাচারের মধ্য দিয়েও এক সম্পূর্ণ নূতন ব্যবস্থা গড়ে উঠবার সূত্রপাত হয়েছে। রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তিতে স্থানীয় সোভিয়েটগুলি গ্রামে গ্রামে ও প্রতি নগরে বিরাজ করতে লাগল। তাদের প্রতিনিধি নিয়ে প্রাদেশিক সোভিয়েট এবং প্রদেশগুলির প্রতিনিধি দিয়ে সোভিয়েট কংগ্রেস গঠিত হল—এই কংগ্রেসই দেশের ব্যবস্থাপরিষদ। কংগ্রেস দুইভাগে বিভক্ত এক সংসদ নির্বাচন করে, তার একভাগে দেশান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রতিনিধিরা আসন পায়। সংসদ থেকে আবার কমিসার অথবা মন্ত্রীদের সমিতির নিয়োগ। ১৯২৩-এর শাসন-পদ্ধতি অনুসারে সোভিয়েট রাষ্ট্র এক ফেডারেশন অথবা সংহত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এতে আসল রাশিয়ার সঙ্গে আর ছয়টি সোভিয়েট রিপাব্লিক সংযুক্ত হল; তাদের নাম শ্বেত-রাশিয়া, উক্রেন, ট্রান্স্ককেশিয়া, তাজিকিস্থান, উজ্বেকিস্থান, এবং তুর্ক্মানিয়া। মূল রুশ দেশেও আবার নানা অঞ্চলে স্থানীয় আত্ম-কর্তৃত্বের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু এই জটিল বন্দোবস্ত চালাতে লাগল এক মূল শক্তি—এবং সে-চালক হচ্ছে সাম্যবাদী দল। প্রকৃত নেতৃত্ব রইল পার্টি কংগ্রেস ও তার সমিতির হাতে। শেষ পর্যন্ত পলিট্‌বুরো নামক সাম্যবাদী কর্মসমিতিই রাশিয়ার চালক—মন্ত্রী প্রভৃতিরা তাদেরই আশ্রিত। রুশ অধি-নায়ক স্টালিন কেবল সাম্যবাদী দলের কর্মসচিব ও পলিট্‌বুরোর সভ্যমাত্র।

লেনিনের গঠিত যন্ত্রের মূল কথা ছিল শ্রমিক আধিপত্য—তার রূপ হল সোভিয়েটগুলি। কিন্তু শ্রমিকসাধারণকে ঠিক পথে চালাবার জন্য নেতার

প্রয়োজন। সে-অভাব দূর করে সাম্যবাদী দল। বিরোধীদের তাই দেশের মধ্যে দমন করা হল। এই চণ্ডনীতির কোন সার্থকতা থাকলে মার্ক্স্ ও লেনিনের মতবাদে বিশ্বাস থেকেই তার উৎপত্তি।

দুই

যুদ্ধান্তের জগতে সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা—সোভিয়েট ইউনিয়ানের সৃষ্টি; ১৯৩৭-এর নভেম্বরে তার কুড়ি বছর পূর্ণ হয়েছে। বিপ্লবের পর থেকে রাশিয়া শ্রমিকরাষ্ট্ররূপেই গণ্য হয়েছে এবং অন্য সকল দেশের থেকে তার পার্থক্য এইখানে। এর পূর্বগামী অনুরূপ রাষ্ট্র ১৮৭১-সালের প্যারিস কমিউন আকারে ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী ছিল। চারদিকের পৃথিবীব্যাপী ধনতন্ত্রকে ছাড়িয়ে নতুন আর্থিক ব্যবস্থা ও নবীন শ্রেণীবর্জিত সমাজ গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা সোভিয়েট রাশিয়ার বৈশিষ্ট্য। মার্ক্সের মতে সাম্যতন্ত্র গঠন একটা সম্পূর্ণ যুগের কাজ, ধনিকতন্ত্রও যেমন একদিনে ফিউডাল ব্যবস্থার স্থান নিতে পারে নি। রাশিয়ায় তাই এখনই সাম্যতন্ত্রী সমাজ দেখার প্রত্যাশা, আদর্শ কতখানি কৃতকার্য হল তার সঠিক পরিমাণ নির্দেশ, কিংবা রুশ অভিজ্ঞতা থেকে সে-আদর্শের সম্ভাবনীয়তা অথবা দোষগুণ বিচার—এ সমস্তই অনেকখানি অবান্তর আলোচনা ও পণ্ডশ্রম মাত্র। ঐতিহাসিকের চোখে পড়ে শুধু একটা বিরাট সুসম্বদ্ধ উদ্যম, তার ফলাফল এখনও ভবিষ্যতের অন্ধকারে। সে-উদ্যমের প্রাণ হচ্ছে মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বাস। বল্‌শেভিকেরা থিওরি এবং প্র্যাক্‌টিসের অঙ্গাঙ্গি যোগ মানে, তাই তাদের আচরণের বিচার শেষ পর্যন্ত একটি প্রশ্নে গিয়ে দাঁড়ায়—মার্ক্সের নির্দিষ্ট পন্থা থেকে তারা ভ্রষ্ট হচ্ছে কি না। রুশ বিপ্লবের পর গোঁড়া মার্ক্সীয় নামে খ্যাত কাউট্‌স্কি অভিযোগ আনলেন যে লেনিন মার্ক্স্‌বাদকে বিকৃত করেছেন। তখন বহু বাদানুবাদ হয়েছিল। তার ফলে আজকের দিনে আর কেউ এ কথা বলে না। কিন্তু গত কয়েক বছর বার বার কথা উঠেছে যে স্টালিন নির্দিষ্ট আদর্শ ও পন্থা থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন—এখন প্রধান অভিযোগকারী লেনিনের সহযোগী স্বয়ং ট্রট্‌স্কি। এ তর্ক বিতর্ক এখনও চলেছে কিন্তু মার্ক্স্‌তত্ত্বে

অভিজ্ঞ অধিকাংশের মতে স্টালিনই মার্ক্সের প্রকৃত শিষ্য। সাম্যবাদের চিন্তাধারার প্রকাশ বোঝাতে গেলে তাই মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্‌-লেনিন-স্টালিন এঁদেরই নির্দেশ অনুসরণ করা সঙ্গত।

লেনিনের মৃত্যুর (১৯২৪) পর তিনজন নেতার হাতে রাজ্যভার এসে পড়ে। তাঁরা তখন ত্রয়ী নামে খ্যাত হয়েছিলেন—সে-তিনজন জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, এবং স্টালিন। বহির্জগতে লেনিনের সহকর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতি লাভ করেছিলেন ট্রট্‌স্কি। বিপ্লবের সময় ট্রট্‌স্কির উপর নেতৃত্বের ভার অনেকখানি পড়ে এবং পরে নতুন লোহিতবাহিনীর স্রষ্টিকর্তা হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধ হন। কিন্তু ট্রট্‌স্কি বহুদিন মেন্‌শেভিক ছিলেন, লেনিন-বিবৃত মার্ক্স্‌তত্ত্ব তাঁর ঠিক দুরস্ত ছিল না। থিওরির ব্যাপারে এখন পর্যন্ত তাঁর দুর্বলতা থেকে গেছে, তাঁর লেখাতে ডায়ালেক্‌টিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব সুবিদিত। তাছাড়া তাঁর স্বভাব ছিল রোমান্টিক ধরনের, কমিউনিস্ট্‌ দলের নেতৃত্বের তিনি ঠিক উপযোগী ছিলেন না। ট্রট্‌স্কির মনের গড়নই আদর্শবাদ, বিপ্লব-বিলাস ও নৈরাজ্যতন্ত্রের অনুকূল। লেনিনের ব্যক্তিত্ব তাঁকে আচ্ছন্ন করে থাকলেও, অবিসম্বাদী নেতার মৃত্যুর পর কমিউনিস্ট্‌ দল তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারে নি। নেতার পার্শ্বচর হিসাবে তিনি খ্যাত হলেও, লেনিনের যথার্থ মতবাদ হৃদয়ঙ্গম করে প্রচার ট্রট্‌স্কি করেন নি—সে-কাজ স্টালিনের। স্টালিন বিপ্লবের বহু পূর্ব থেকে রাশিয়ায় দলের গুপ্ত প্রচার কার্যে জীবন সংশয় করে পরিশ্রম করেছিলেন। বিপ্লবের পর তিনি নির্দিষ্ট কাজ যোগ্যতার সঙ্গেই সম্পন্ন করতেন। বক্তৃতায় ও লেখায় লেনিনের মতবাদ তিনিই পরিস্ফুট করেন। দলের কর্মসচিব হিসাবে তিনি কমিউনিস্ট্‌দের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন।

লেনিনের মৃত্যুর সময় রাশিয়াতে নেপের আমল চলছিল। ট্রট্‌স্কি তার প্রকৃত রূপ বুঝতে না পেরে গণ্ডগোল আরম্ভ করলেন; নেপ আরম্ভ হবার এত পরে তাঁর এই অভিযান নতুন নেতাদের বিব্রত করবারই উপায় মনে হয়। বহির্জগতের অভিমত প্রতিধ্বনিত করে ট্রট্‌স্কি বললেন যে রাশিয়ায়

বিপ্লবের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, ফরাসী বিপ্লবে যেমন রোব্‌স্‌পিয়ারের মৃত্যুর পর থার্মিডরের প্রতিক্রিয়া এসেছিল এখন তেমনি রুশ দেশেও বিপ্লবী দল পশ্চাদ্‌গমন করছে। তখন দলের মধ্যে তর্ক উঠল কর্মপদ্ধতি নিয়ে। ট্রট্‌স্কির মতে শুধু এক দেশ অর্থাৎ রাশিয়ায় নতুন সমাজগঠনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। তার আগে পৃথিবীর নানা দেশে শ্রমিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন। বিপ্লবকে আগুনের মতন দেশ থেকে দেশান্তরে না নিয়ে যেতে পারলে সব ব্যর্থ হবে। শ্রমিক বিপ্লব জগদ্ব্যাপী করা আবশ্যক, তাই প্রধান কাজ হল কমিন্‌টার্নের সাহায্যে সর্বত্র বিপ্লব আনয়নের চেষ্টা। ট্রট্‌স্কির মতবাদে তাঁর অবাস্তবতা সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে—মার্ক্স্‌তত্ত্বের জটিলতা আয়ত্ত না করে তিনি তাকে মন্ত্রের রূপ দিতে এবং বিপ্লবপ্রচেষ্টাকে ছেলেখেলায় পরিণত করতে চাচ্ছিলেন। স্টালিনের মতে সাম্যবাদীদের কর্তব্য সর্বদা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার। লেনিনও লক্ষ্য অবিচলিত রেখে স্থানকাল অনুসারে কর্মপদ্ধতি পরিবর্তিত করতেন। অধীর আস্ফালনকে তিনি এক বিখ্যাত পুস্তিকায় শৈশবসুলভ ব্যাধি নাম দিয়েছিলেন। এরও বহু আগে স্বয়ং মার্ক্স্‌ ব্ল্যাঙ্কির নির্বিচার বিপ্লবের উচ্ছ্বাস ও স্টার্নার-এর উগ্রপন্থার নিন্দা করেন। দেশে নিশ্চেষ্টতা ও বিদেশে শাস্তিক্ষয়ের মধ্য দিয়ে ট্রট্‌স্কির নীতি নামে চরমপন্থা ও কাজে পশ্চাদ্‌গমনে পর্যবসিত হবে। ১৯২৪-এ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল যে ধনতন্ত্র অনেকখানি টাল সামলেছে। এ অবস্থায় রাশিয়ার আভ্যন্তরিক সংগঠন দলের প্রধান কর্তব্য। লেনিন নিজেই তার পথপ্রদর্শন করেছিলেন। রাশিয়ার মতন এক দেশেও নতুন সমাজের প্রথম অবস্থায় পৌঁছান সম্ভব—তার মূলসূত্র হচ্ছে যে প্রত্যেককে শ্রম করতে হবে এবং প্রত্যেকে শ্রমের উপযুক্ত মূল্য পাবে। এই প্রথম অবস্থাকে সমাজতন্ত্র নাম দেওয়া যায়। পূর্ণ সাম্যতন্ত্র এর পরের অবস্থা—আর সে-অবস্থায় পৌঁছতে গেলে সম্ভবত বিপ্লবের সর্বদেশে প্রসার প্রয়োজন। শ্রমিক কর্তৃত্ব জগদ্ব্যাপী হলেই নতুন শ্রেণীবিহীন সমাজের পূর্ণগঠন সম্ভব আর তখনই এঙ্গেল্‌সের প্রতিশ্রুত স্টেটের নিষ্পেষক যন্ত্রের

সম্পূর্ণ লোপ হতে পারবে। এই দ্বিতীয় পর্যায়কে সাম্যতন্ত্র নাম দেওয়া হল—এর মূলসূত্র হবে যে প্রত্যেকে শক্তি অনুসারে শ্রম করবে বটে কিন্তু সমাজের কল্যাণে সে পাবে তার যা কিছু প্রয়োজন সমস্তই।

১৯২৬-এ জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ হঠাৎ পূর্ববৈরী ট্রট্স্কির দলে যোগ দিলেন, অবশ্য এঁদের দুজনের মতিস্থিরতার অভাব বল্‌শেভিক্‌দের পূর্ব ইতিহাসেও লক্ষ্য করা যায়। ১৯২৭-এ বিস্তর আলোচনার পর কমিউনিস্ট্ দল স্টালিনের মতই গ্রহণ করল—আর সেই সময় ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, রাডেক, রাকভ্‌স্কি দল থেকে বহিষ্কৃত হলেন। পরে অন্য সকলে ভুল স্বীকার করে দলে ফিরে আসেন, কিন্তু ট্রট্স্কি অবিচলিত থাকায় তাঁর নির্বাসন হয় (১৯২৯)। ১৯৩১-এ দার্শনিক বিচারের ক্ষেত্রে এর অনুরূপ সংঘর্ষ দেখা দেয়। ডেবোরিন, কারেভ প্রভৃতি দার্শনিকদের বিরুদ্ধে মিটিন ইত্যাদি অভিযোগ আনেন যে, তাঁরা চিন্তার রাজ্যে আদর্শবাদের দিকে ঝুঁকছেন। ট্রট্স্কির মতন ডেবোরিনও পরাস্ত হলেন।

মার্ক্স্ ও লেনিনের সময় সাম্যবাদকে দুইদিকের বিকৃতির ঝোঁক সামলাতে হয়েছিল। এখনও ট্রট্স্কির পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে উল্টোদিকের চরমপন্থাকেও স্টালিন বর্জন করেন। ১৯২৮-এ বুখারিন, টম্‌স্কি, রাইকভ প্রভৃতি নেতারা স্টালিনেব নীতিকে অতিমাত্রায় দুঃসাহসিক মনে করলেন। ট্রট্স্কির অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই বিপদ ছিল মার্ক্স্‌বাদের বিকৃতি। এবারও সাম্যবাদী দল স্টালিনকে সমর্থন করে। এই বাদানুবাদের সময় সুবিখ্যাত পঞ্চবার্ষিক সংকল্পের সাহায্যে দেশের মধ্যে নতুন সমাজের প্রথম স্তর গড়ে তোলবার উদ্যোগ হয়েছিল।

১৯২৮-এর নবপদ্ধতির দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথম লক্ষ্য, যন্ত্রশিল্পের প্রভূত প্রসার, রাশিয়াকে এখন আমেরিকা বা জার্মানির মতো যন্ত্রপ্রধান দেশের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। আজকের দিনের সোভিয়েট রাষ্ট্রের লোহা, ইস্পাত বা কেমিক্যালের কারখানা, কয়লার খনি কিংবা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা বিস্ময়ের বস্তু। আরও আশ্চর্য এই যে, এত বৃহদায়তন

যন্ত্রশিল্পের অভ্যুত্থান এদেশে জনসাধারণের সম্মিলিত চেষ্টার ফল—এর পিছনে স্বদেশী বা বিদেশী ধনিকের লাভের জন্য অর্থ নিয়োজিত নেই। দ্বিতীয় লক্ষ্য, কৃষিকার্যে রাশিয়ার অনুন্নতির অপবাদ ঘোচানো। সমগ্র দেশ এতদিন লক্ষ লক্ষ কৃষকের খণ্ডসম্পত্তিতে বিভক্ত ছিল। বিপ্লবের পর কৃষকদের জমির উপর অধিকার অটুট হয়, এমন কি জমিদারদের জমিও তাদের হাতে দেওয়া হল কৃষকদের সমর্থন লাভের জন্য। সামরিক সাম্যতন্ত্রের যুগে কৃষকদের চেপে রাখার চেষ্টা নেপের আমলে বর্জিত হয়, ফলে অবস্থাপন্ন কৃষক অথবা কুলাক্‌দের গ্রামে সম্পদ ও শক্তি বৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু কুলাক্‌দের নিচে মধ্যবিত্ত কৃষক এবং আরো নিচে গরীব চাষীদের দুরবস্থা ও অসন্তোষ তখনও কমে নি। পঞ্চবার্ষিক সংকল্পে কুলাক শ্রেণীর উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয়। দেশে স্টেট-পরিচালিত শত শত আদর্শ ফার্মের সৃষ্টি হল, কিন্তু সব জমির হঠাৎ এ ভাবে সরকারী চাষ সম্ভব হয় নি। সুতরাং একত্রিক কৃষিকার্যের উদ্ভব হল—অর্থাৎ স্থানীয় সব কৃষকদের জমি একত্র করে চাষের ভার তাদেরই সম্মিলিত সমিতিদের হাতে দেওয়া হয়। একত্রিক চাষের সুবিধা সহজেই বোঝা যায়—সম্মিলিত কৃষিকার্যে যন্ত্রের সাহায্যে শ্রমলাঘব চলে, স্বতন্ত্র চাষে যন্ত্রের বহুল ব্যবহার অসম্ভব। সরকারী চাষ ও একত্রিক কৃষিকার্য এইভাবে রাশিয়ার গ্রামে যুগান্তর আনল। এই ব্যবস্থা সাম্যবাদের ইতিহাসে স্টালিনের এক প্রধান কীর্তি হিসাবে স্থান পাবে। কৃষকেরা স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ও ভূমি সম্বন্ধে লোভী—সোশালিজ্‌মের বাধা হিসাবেই তাদের এতদিন দেখা হয়েছিল। স্টালিনের নীতি মোটামুটি সফল হলে সে-বাধা অপসারণের এক উপায় পাওয়া যাবে।

নেপের আমলে রাশিয়ার বাইরে বিশ্বাস ছিল যে, সেদেশে আর্থিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে। বিদেশী ধনিকদের লাভের জন্য টাকা খাটাবার সুযোগ কিন্তু নেপের সময়ও এল না। পঞ্চবার্ষিক সংকল্পের সময় যন্ত্র নির্মাণের টাকা আসতে লাগল জনসাধারণ ও শ্রমিকদের আয় ও ব্যয়সংকোচের মধ্যে। রাশিয়ায় তখনও প্রচুর অভাব রইল, কিন্তু অভাবের

ফলে শ্রমিক অসন্তোষ প্রবল হয় নি। তার কারণ অবশ্য সোভিয়েট রাষ্ট্র শ্রমিকদেরই নিজস্ব এই ধারণার অস্তিত্ব। শ্রমিকেরা কষ্ট স্বীকারে প্রস্তুত ছিল, যতদিন তাদের অভাবের ভিতর দিয়ে সঞ্চিত অর্থ অল্পসংখ্যক ধনিকের ভোগে না এসে নূতন সমাজের উৎপাদিকা শক্তিবর্ধনে নিয়োজিত থাকবে। অশেষ কষ্টের মধ্যে গোড়াপত্তন এ ভাবে হবার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক সংকল্প আসে। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য, উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি—আর তার মধ্যে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের প্রাচুর্যও স্থান পেল। ক্রমে রাশিয়াতে এখন সাধারণ জীবনযাত্রা সচ্ছলতর হয়ে এসেছে। বিদেশী পর্যটকেরা অনেকে সম্প্রতি এই পরিবর্তনকে ধনতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন ভেবেছে কিন্তু আর্থিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে তার অনুযায়ী পূর্ব ব্যবস্থা ফিরে আসার লক্ষণ দেখা যায় না। পণ্যোৎপাদন প্রসারচেষ্টার মধ্যে স্টাকানভ আন্দোলনের উল্লেখ করা উচিত। শ্রমিকদের মধ্যে কর্মকুশলতা ও শ্রমশীলতার উৎসাহবিধান এর বৈশিষ্ট্য। সে-উৎসাহ প্রকাশ্য সম্মানের মধ্য দিয়েই বেশি আসে, অথচ আর্থিক পুরস্কারও রয়েছে। কিন্তু মাহিনার অসমতা আর ধনতন্ত্র এক কথা নয়। স্বতন্ত্র ধনিক শ্রেণীর অস্তিত্ব, তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ লাভের জন্য খাটাবার সুবিধা, পণ্যোৎপাদনে ধনিকদের প্রভুত্ব, আর্থিক মূলধনের জন্য তাদের উপর নির্ভর—এইগুলি সব রুশ দেশে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিপ্লবের অবসান হবে না।

নতুন রাশিয়ার বর্ণনা এখানে অসম্ভব। ওয়েব দম্পতির বিখ্যাত গ্রন্থে তার অনেক পরিচয় এখন সহজেই পাওয়া যায়। কেবলমাত্র মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখই স্বল্পকলেবর আখ্যানে স্থান পেতে পারে। আর্থিক ব্যবস্থায় দেশব্যাপী প্ল্যানিং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, কিন্তু পৃথিবীর অন্যত্র এর যত অনুকরণ প্রস্তাবিত হয়েছে তার সঙ্গে এ উদ্যমের মূলগত পার্থক্য হচ্ছে এই যে, এর পিছনে একটা বিশিষ্ট মতবাদের সাধনা রয়েছে যার সঙ্গে এ সংকল্পের অঙ্গাঙ্গি যোগ। রাষ্ট্রিক ব্যাপারে প্রথমে শ্রমিকদের প্রতিভূ সাম্যবাদী দলের অধিনায়কত্ব ছিল; বিরোধীদের স্বাধীনতা লোপ

পেয়েছিল, স্বীকার করতেই হবে। ১৯৩৬-এর নতুন শাসন-পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক উদারনীতি অনেকখানি ফিরে এসেছে। এর থিওরি এই যে, ধনিক শ্রেণীর উচ্ছেদসাধনের পরই উদারনীতি প্রথম সার্থক হতে পারে, আর রাশিয়ায় সে-অবস্থা আগতপ্রায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে নিরক্ষরতার অবসান রাশিয়ার মতো দেশে এক বিপুল কীর্তি। রাষ্ট্রশক্তি তাদের নিজস্ব, এই বিশ্বাস শ্রমিক ও কৃষকদের মনে বিরাজ করছে। তাদের আর্থিক সুবিধাবিধান স্টেটের এক প্রধান কর্তব্য। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য সাদরে রক্ষিত হচ্ছে—এদের পরস্পরের সদ্ভাব স্টালিনের আমলেব আর একটি কীর্তি।

কিন্তু বিরোধের অবসান এত সহজে আসে না। ট্রট্স্কির পরাজয়ের পরও তাঁর মতবাদ অসংখ্য লোকের মনে সন্দেহের কারণ হয়ে রইল। স্টালিনের মূল বিশ্বাসে ভুল থাকলে দেশও ভুল পথে চলছে বলতে হবে। আর্থিক উন্নতিকে অভ্যর্থনা করে স্টালিন বলেছিলেন যে, রাশিয়ায় এতদিনের পরিশ্রমের পর জীবনে আনন্দ ফিরে আসছে। ট্রট্স্কির চোখে দেখলে সে-আনন্দ বিপ্লব-অবসানের মুখোস নয় তো? ১৯৩৩-এর পর বাহ্জগতে পরিবর্তনের ফলে সমস্যা উপস্থিত হল। জার্মানি বা জাপানের হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে স্টালিন যখন ব্যস্ত, তখন অনেক পুরাতন নেতা আবার ট্রট্স্কির পন্থার দিকে গোপনে ঝুঁকলেন। তাঁদের ব্যবহারে পরস্পর-বিরোধী আচরণ থিওরির দুর্বলতাই প্রমাণ করে। কেউ কেউ ভাবলেন জার্মানি ও জাপানকে কিছু রাজ্য ছেড়ে দিলে গোল চুকবে। অন্যদের মনে হল এই সুযোগে হয়তো ফাশিস্ট্দের সাহায্যেই স্টালিনকে ধ্বংস করা সম্ভব। কারো মতে যুদ্ধ এলে ভালই—তাতে বিপ্লবেরই সুবিধা। অন্যেরা বিদেশে গণ্ডগোল সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। দুটি বৈশিষ্ট্য এঁদের আচরণে ধরা পড়ে—ফাশিস্ট্-বিপদকে সামান্যজ্ঞানে তুচ্ছ করা এবং স্টালিনের পতনের জন্য ষড়যন্ত্র। গুপ্ত অভিসন্ধি প্রকাশ পাওয়াতে রাশিয়ায় এই ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার ও দণ্ডবিধান সম্প্রতি সমস্ত জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

১৯৩৪-এর ডিসেম্বরে কিরভ নিহত হলেন। স্টালিনের প্রাণনাশের

চেষ্টা হয়, তাঁর প্রধান সহকর্মীদের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র হয়েছিল। দেশে নানা গণ্ডগোল সৃষ্টির প্রয়াসও দেখা গেল। মস্কোর বিচারে দণ্ডিত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির অধিকাংশই যে সাজানো নয়, বিচারের সম্পূর্ণ প্রতিলেখনপাঠে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। দণ্ডিত নেতারাও অনেকে প্রায় দশ বছর ধরে সাম্যবাদী দলের আচরণে সন্দেহ প্রকাশ করে এসেছেন। তাঁরাই খাঁটি প্রাচীন বল্‌শেভিক, এ কথা অমূলক। স্টালিনের প্রধান সমর্থক—কাগানোভিচ, ভরোশিলভ, মলোটভ, লিটভিনভ প্রভৃতি সকলেই দলের পুরাতন সভ্য। দণ্ডিত নেতারা কেউ কেউ লেনিনের সময়ও ভুল নীতির অনুসরণ করেন—লেনিনের সময় তাঁরা উচ্চপদে থাকলেও ট্রট্স্কি-স্টালিনের দ্বন্দ্বে তাঁরা স্টালিনের নেতৃত্বে খানিকটা সন্দিহান হয়ে পড়েন। ষড়যন্ত্রকারীদের তাই সাধারণ ভাবে ট্রট্স্কিপন্থী বললে অন্যায় হবে না, তাঁদের পরস্পরবিরোধ সে-পন্থারই দৌর্বল্যের পরিচায়ক। মতের কথা ছেড়ে দিলেও অভিযোগগুলি যে সম্ভবত সত্য সে-সম্বন্ধে ক্রমশই জনমত প্রবল হচ্ছে।

মস্কোতে সম্প্রতি চারটি বড় বিচার হয়ে গিয়েছে। দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন—জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ (অগস্ট্, ১৯৩৬); রাডেক, সকল্‌নিকভ ও পিয়াটোকভ (জানুয়ারি, ১৯৩৭), মার্শাল তুকাচেভ্স্কি ও অন্য কয়েকটি সেনাপতি (জুন, ১৯৩৭); বুখারিন, য়াগোডা, ও রাকভ্স্কি (মার্চ্, ১৯৩৮)। রাডেক ও তুকাচেভ্স্কি ব্যতীত এঁদের প্রভাব বহুদিন আগেই রাশিয়াতে প্রায় ম্লান হয়ে এসেছিল। দেশের মধ্যে স্টালিনের সমর্থক যে অজস্র সে-কথা ভোলাও উচিত নয়। অভিযুক্তেরা বিখ্যাত ও অভিযোগ অপ্রত্যাশিত হলেও এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। উৎপীড়ন বা প্রলোভনের সাহায্যে যে বন্দীদের কাছ থেকে দোষস্বীকার আদায় করা হয়েছিল, এর কোন প্রমাণই নেই। দোষস্বীকার অনিবার্য হয়ে পড়েছিল প্রমাণের প্রাচুর্যে, এ কথাই বরং বিশ্বাসযোগ্য।

পঞ্চবার্ষিক সংকল্পের সাফল্য অপ্রত্যাশিত হওয়াতে রব উঠেছিল যে স্টেটকর্তৃত্ব ও শ্রমিকদের দাসত্বের জন্যই এ সংকল্প ব্যর্থ হয় নি। প্রচলিত অর্থনীতি অথচ বহুদিন বলে এসেছে যে, রাষ্ট্রশক্তি কখনও আর্থিক কর্তৃত্ব সুচারু রূপে চালাতে পারে না এবং দাসশ্রমে উৎপাদন কার্য ভাল চলে না। জগদ্ব্যাপী আর্থিক সঙ্কট রাশিয়াকে বিশেষ বিচলিত করল না, এটাও বিস্ময়ের কারণ। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ানের অগ্রগতি অবাধ বা নিরঙ্কুশ হয় নি। এর ভবিষ্যত আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন। যুদ্ধে পরাজয় হয়তো রাশিয়ার সকল প্রচেষ্টা একদিন ব্যর্থ করবে আর তখন সাম্যবাদীদের আবার প্রথম থেকে পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হতে হবে। ১৯৩৩-এ হিট্‌লারের অভ্যুদয় এই বিপদের সূচনা করল। দুই প্রতিপক্ষ—জার্মানি ও জাপান—রাশিয়ার দুই দিকে অবস্থান করছে। উভয়েই ফাশিস্ট্‌ ও সাম্যবাদের ঘোর শত্রু। উভয়েই সাম্রাজ্যতন্ত্রের অন্তর্নিহিত তাড়নায় প্রসারোন্মুখ। এরা পরিণামে রাশিয়াকে বিধ্বস্ত করবে কিনা, সমসাময়িক কালের প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এই সমস্যা। ট্রট্‌স্কি হয় এ বিপদ বোঝেন না, নয়তো সোভিয়েটের পতন তাঁর কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু রাশিয়ার আত্মরক্ষা পৃথিবীর শ্রমিক সমাজের কাছে সামান্য কথা হতে পারে না।

লেনিনের আমলেও রাশিয়া আন্তর্জাতিক শান্তির প্রয়াসী ছিল। তারপর অস্ত্রহ্রাসের জল্পনার সময়ও রুশ রাষ্ট্রের চেষ্টা ছিল সেই দিকে। ১৯৩৩-এর নাৎসি বিপ্লবের পর শান্তিসংরক্ষণ সোভিয়েট বৈদেশিক নীতির মূলকথা হল আত্মরক্ষার খাতিরেও। লিট্‌ভিনভ ১৯৩৪-এ বৃথাই প্রস্তাব করলেন যে অস্ত্রহ্রাসের বৈঠককে শান্তিরক্ষকসভারূপে পুনর্গঠিত করে আক্রান্ত কোন দেশের তৎক্ষণাৎ সাহায্যের জন্য সকলে অঙ্গীকারবদ্ধ হোক। ১৯৩৪-এ রাশিয়া বিশ্বরাষ্ট্রসংঘে যোগ দেয় আর ১৯৩৫-এ ফ্রান্স্‌ ও রাশিয়া পরস্পরের সাহায্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল। এই চুক্তিতে যোগ দেবার প্রস্তাব জার্মানিই অস্বীকার করেছে। ফ্রান্স্‌ ও রাশিয়া উভয়ে চেকোস্লোভাকিয়াকে রক্ষা করবার কথা দিয়েছে এবং সেই জন্যই হিট্‌লার এদেশ অধিকার করতে

ইতস্তত করছেন। বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ বিকল হয়ে পড়াতে সোভিয়েট রাশিয়া স্পেন ও চীনে ফাশিস্ট্-প্রগতি আটকাবার জন্য সাহায্য পাঠিয়েছে। জগদ্ব্যাপী ফাশিস্ট্ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলাই এখন সাম্যবাদীদের প্রধান লক্ষ্য। ফাশিজ্‌মের অগ্রগতি আটকাতে পারলে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলে তার পতন হবে এই বিশ্বাস সাম্যবাদের মজ্জাগত।

পৃথিবীর সকল দেশের সাম্যবাদীদের উপস্থিত কর্তব্য নির্ধারিত হল ১৯৩৫-এ কমিন্‌টার্নের অধিবেশনে। এই সভায় ডিমিট্রভ ইউনাইটেড ফ্রন্ট্ অথবা একত্রীভূত দলসমষ্টির আদর্শ প্রচার করলেন। প্ল্যানিং-এর মতন এ কথাটিও আজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে অথচ এর প্রকৃত স্বরূপ সর্বদা মনে রাখা হয় না। সম্মিলিত গণশক্তি গঠনের প্রধান আদর্শ ফাশিজ্‌মের প্রতিরোধ; ফাশিস্ট্ আমলের চাইতে গণতন্ত্রে শ্রমিকদের সুবিধা, এই জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষার চেষ্টা এই কর্মপদ্ধতিতে স্থান পায়। শ্রমিকদের মধ্যে গৃহবিবাদ বর্জনই সাধারণ শত্রুকে আটকাবার উপায়; তাই সোশাল ডেমক্র্যাট্‌দের সঙ্গে অযথা কলহের অবসান এখন বিধেয়, কিন্তু তাই বলে সাম্যবাদী দলের পৃথক অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা কোথাও অস্বীকৃত হয় নি। সাময়িক কারণে উদার মতবাদীদের সঙ্গেও এখন সহযোগিতা আবশ্যক ও সম্ভব এই বিশ্বাসও ইউনাইটেড ফ্রন্টের উদ্ভাবনার কারণ। ফ্রান্সে ও স্পেনে পপুলার ফ্রন্ট্ গঠন এ পদ্ধতির প্রধান সাফল্যের নিদর্শন।

॥ চতুরঙ্গ : আশ্বিন ১৩৪৫ (১৯৩৮) ॥

পার্লামেণ্টারি প্রথা

নিয়মতন্ত্রের উদ্ভাবনা ইংরাজদের জাতীয় জীবনের এক বিরাট কীর্তি হিসাবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। মধ্যযুগে দেখা যায় এর প্রস্তুতি, সতেরো শতকে এল তার প্রতিষ্ঠা, তারপর গত আড়াইশ বছরে এই বিধান পরিণতি লাভ করেছে। নিয়মতন্ত্রের গোড়ার কথা হল এই যে, রাষ্ট্রের চালক শক্তি অর্থাৎ এক্‌সিকিউটিভ নানা রূপ বিধিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ফলে তার স্বেচ্ছাচারের ক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ, সেই সঙ্গে জনমতের প্রতীক হিসাবে জাতীয় প্রতিনিধি-সভাই পরিণামে দেশের ভাগ্যবিধাতা রূপে স্বীকৃত হয়। ইংল্যাণ্ডে এই কনস্টিটিউশনাল শাসনের শুধু উৎপত্তি হয় নি, এর পূর্ণ সাফল্য দেখতে হলেও এই দিকে চোখ পড়ে। বিরাট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমেরিকাতে পার্লামেন্টীয় শাসন পদ্ধতি তার যথার্থ রূপানুসারে গড়ে ওঠে নি, ফ্রান্সে তার দেড়শ বছরের ইতিহাস নানা বাধাবিপর্যয়ে বার বার ব্যাহত হয়েছে, আর ইটালি, জার্মানি, ও রাশিয়ার নিয়মতন্ত্র গড়ে উঠতে না উঠতে ভেঙে পড়েছে বলা চলে।

ইংল্যাণ্ডে নিয়মতন্ত্রের উদ্ভাবনা ও সাফল্যের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে অনেকে জাতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের আশ্রয় নিয়েছে। জাতীয় চরিত্রের মূল রূপ যুগে যুগে অপরিবর্তিত না থাকলে অবশ্য কথাটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। অথচ অধ্যাপক ল্যাস্কি দেখিয়েছেন যে ইয়োরোপীয়দের চোখে সতেরো শতকের ইংরাজ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ জাতির বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। বস্তুত জাতীয় চরিত্রের ধারণার সাহায্যে ইতিহাসের গতির বৈচিত্র্য এবং বৈচিত্র্য সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিশেষ

Parliamentary Government in England: a Commentary—by Harold J. Laski (Allen & Unwin)

কোন যুগোপযোগী সাদৃশ্যের সম্যক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। জাতিগত বৈশিষ্ট্যের পৃথক অস্তিত্ব থাকলে তা ইতিহাসের অন্যতম উপাদান মাত্র, ঐতিহাসিক গতির নিয়ন্ত্রক শক্তির পদে তাকে উন্নীত করা চলে না। ঠিক আবার সমগ্র সমাজেব বিবর্তন ধারার দিক্‌নির্ণয় সম্পূর্ণ আকস্মিক বলে স্বীকার করাও কঠিন—কারণ তাহলে ইতিহাসচর্চা অর্থহীন পণ্ডশ্রমে পরিণত হতে বাধ্য। মহাপুরুষ বা ব্যক্তিবিশেষের কার্যকলাপ ইতিহাসের অঙ্গ হলেও তাকেই সামাজিক পবিবর্তনেব মূল প্রেরণারূপে মেনে নিলে ন্যায্যত মানুষেব ইতিবৃত্ত আকস্মিক ঘটনামালার সমষ্টি কিংবা দৈবের লীলায় পযবসিত হয়।

প্রায় একশত বৎসব আগে মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্‌স্ ইতিহাসের যে-বাস্তব ব্যাখ্যাব প্রচাব কবেছিলেন তাতে তাই শ্রেণীব উত্থানপতন ও বিভিন্ন শ্রেণীর পবিবতনশীল সম্বন্ধ সামাজিক জীবনে কেন্দ্রীয় শক্তির মর্যাদা পেয়েছিল। প্রতি যুগের পণ্যোৎপাদন-পদ্ধতি মানুষেব সঙ্গে মানুষের আর্থিক সম্বন্ধ গড়ে তোলে, তাবই বাহ্যিক রূপ প্রতিফলিত হয় সমাজেব শ্রেণীবিভাগেব মধ্যে। শ্রেণীসম্বন্ধই মানুষেব সকল সামাজিক চিন্তা ও কর্মের মূল নিয়ন্তা, অন্য সকল শক্তি মূল ধাবাব সমর্থক বা প্রতিবন্ধক হিসাবে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে মাত্র। এদিকে ডায়ালেক্‌টিকেব মূল বিশ্বাস অনুসারে কোন শ্রেণীই চিবস্থায়ী নয়। আর্থিক সম্বন্ধে, সুতরাং শ্রেণীসম্বন্ধেরও মধ্যে, পরিবর্তনের একটা ঝোঁক স্বভাবতই অন্তর্নিহিত থাকে। তাই সামাজিক প্রগতিব মূল উৎস এইখানেই খুঁজতে হবে।

অর্ধশতাব্দী ধরে বুদ্ধিবাদী পণ্ডিতেবা মার্ক্সেব মতামত বাববার খণ্ডন করেছেন অথচ এই মতবাদ ধীরে ধীবে বতমান যুগেব সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। তাই অমার্ক্সীয় মহলের চিন্তার মধ্যেও এব প্রতিধ্বনি বাব বাব পাওয়া যায়। আজকেব দিনের সাধারণ ঐতিহাসিকও মেনে নেন যে ফিউডাল ইয়োরোপে যারা নগণ্য ছিল, মধ্যযুগের শেষের দিকে সেই বুর্জোয়া বা মধ্যশ্রেণীর অভ্যুদয় আরম্ভ হল।

নূতন নূতন আবিষ্কারের অভিযান, রেনেসাঁসের নবীন দৃষ্টিভঙ্গী, রেফর্মেশনের নূতন পরিকল্পনা ছড়িয়ে পড়ার মূলে রয়েছে এরই প্রেরণা। তারপর মার্কেণ্টাইল যুগের প্রতিপত্তির সোপান বেয়ে উনিশ শতকের যন্ত্রবিপ্লবে বুর্জোয়া সভ্যতা চরমে পৌছল। পৃথিবীময় ব্যাপ্তি লাভের পর আজ তার ক্ষয়োন্মুখ অবস্থার কথাও সকলের মনে ছায়া ফেলে। এই পরিবর্তনধারার মূল যে আর্থিক সম্বন্ধের ক্রমবিকাশ এ কথাও আজ বহুস্বীকৃত। বুর্জোয়া শ্রেণীর বিবর্তনের সঙ্গে যে প্রলেটেরিয়াট বা বিত্তহীন শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয় ও প্রসার ডায়লেক্‌টিকের অঙ্গাঙ্গি যোগে যুক্ত, এই বিশ্বাসও এখন বিস্তার লাভ করেছে।

অধ্যাপক ল্যাস্কি এখন নিজেকে মার্ক্স্‌পন্থী বলেন কিনা জানি না। কিন্তু কিছুদিন থেকে তাঁর লেখায় এই দৃষ্টিভঙ্গী অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। রাষ্ট্রের স্বরূপ এবং ইয়োরোপীয় উদার মতবাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁব বই দুখানি এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে। ইংল্যাণ্ডে পার্লামেন্টীয় শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর সাম্প্রতিক আলোচনাও প্রতি পৃষ্ঠায় মার্ক্সের প্রভাব পরিস্ফুট কবছে। অধ্যাপক ল্যাস্কির পক্ষে এটা কিছুমাত্র অগৌরবের কথা নয়, কারণ চিন্তার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের দাবির প্রকৃতিগত কোন মাহাত্ম্য নেই। পক্ষান্তরে লেখার সরস প্রসাদগুণে এবং বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয়ে তাঁর বর্তমান গ্রন্থ উপভোগ্য এবং সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে অসংখ্য পাঠকের মনে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আলোকপাত করবার সুযোগ পেয়েছে এই পুস্তকের মধ্যে। কোন লেখকের পক্ষে এই সাফল্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। ইংল্যাণ্ডের সুবিদিত নিয়মতন্ত্রের হেতু ও তার দীর্ঘস্থায়িত্বের কারণ, এবং তার বর্তমান সমস্যা ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে ঔৎসুক্য চিন্তাশীল লোকের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ল্যাস্কির এই গ্রন্থের সমকক্ষ কোনও আলোচনা না থাকাতে তাঁর বইখানিকে অবশ্যপাঠ্য বললে কিছুমাত্র অন্যায় হবে না।

আর্থিক সম্বন্ধের যে-রূপকে ধনতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হয় তার ভিত্তি সুদৃঢ় হবার সঙ্গে সঙ্গে যে-মধ্যশ্রেণীর জয়যাত্রা আরম্ভ হল, নিয়মতন্ত্রকে তারই

অন্যতম আদর্শ হিসাবে গণ্য করা যায়। রাষ্ট্রশক্তিকে অভিজাত ফিউডাল শ্রেণীর প্রতিভূ তথাকথিত অবাধ রাজতন্ত্রের হাত থেকে উদ্ধার করাই ছিল নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষ্য। মধ্যযুগে নানা অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতের পুঞ্জীভূত ফল হিসাবে ইংল্যাণ্ড্ই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধনতন্ত্রের প্রগতির পথে অগ্রণী। তাই নিয়মতন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা ইংরাজ জাতির পক্ষেই স্বাভাবিক হয়েছিল। সতেরো শতকে বহুবর্ষব্যাপী প্রকাণ্ড দ্বন্দ্বের পর রাজশক্তি সে-দেশে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে। ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের ফলে নূতন ব্যবস্থার বিজয় ঘোষিত হল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আড়াই শতাব্দী ইংরাজ নিয়মতন্ত্র অব্যাহত থেকেছে। মধ্যশ্রেণীর প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে নিয়মতন্ত্রের স্ফূর্তিলাভ এবং উদার মতবাদের বিস্তার শুধু ইংল্যাণ্ড্ কেন, প্রতি দেশের ইতিহাসেই উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রশক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে না পারলে ব্যবসাবাণিজ্যের পথে নানা বাধাবিঘ্নেব উৎপত্তি হতে পারে, স্বেচ্ছাচারী শাসন অভিজাত সমাজের আত্মরক্ষার অস্ত্ররূপেই ব্যবহৃত হবে, ধনতন্ত্র গঠনের কাজে দেশের শাসকদের যথাযোগ্য সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও একটা স্থির আশ্বাস থাকা প্রয়োজন। নিয়মতন্ত্র ও উদারনীতির উৎপত্তি ও প্রসারের মূলে ছিল এই-জাতীয় প্রেরণা। কিন্তু পরিবর্তনের অমোঘ নিয়মে আঠারো শতকেব উদারনীতি পরিবর্তিত হল উনিশ শতাব্দীর গণতন্ত্রে। তারপব জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্যতন্ত্রের আওতার মধ্য দিয়ে ধনতন্ত্র তার পূর্ণ বিস্তার লাভ করবার পর ভাগ্যে দুর্দিন ও সংকোচনের সময় উপস্থিত হয়েছে। এখন ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার খাতিরেই তাই উদার গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ হবার ব্যাখ্যাও খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়।

কিন্তু ঐতিহাসিক প্রগতি সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। নিয়মতন্ত্রের অভ্যুত্থানের পথে ইংল্যাণ্ড্ অগ্রণী হলেও, তার ক্ষয়োন্মুখ অবস্থায় পরিবর্তনের ঢেউ ইংল্যাণ্ডে প্রথম প্রবল হল না। অর্থাৎ অন্য দেশের তুলনায় ব্রিটিশ রাষ্ট্রে নিয়মতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। ল্যাস্কির প্রধান বক্তব্য এই যে তার মূল কারণ ইংরাজ চরিত্রের সদ্‌গুণাবলী নয়, এর

হেতু খুঁজতে হবে ইংরাজ জাতির নানা আর্থিক সুবিধার মধ্যে। এক কথায় ব্রিটিশ ধনতন্ত্র সুদৃঢ় হতে পেরেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য। ইংরাজ মধ্য-শ্রেণী সে-সাম্রাজ্য গড়ে তুলবার সুযোগ পেয়েছিল প্রধানত এই কারণে যে, মধ্যযুগ থেকে নানা অবস্থার ভিতরে তারা যে-শক্তি, সম্পদ ও সামর্থ অর্জন করেছিল প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিদের ততখানি জোটে নি। তার্কিকেরা হয়তো বলবেন যে তার মানেই হল যে ইংরাজদের সাফল্য আকস্মিক, কিন্তু যুক্তিশাস্ত্র অনুসারে শুধু ক্ষণস্থায়ী ও অপ্রত্যাশিত কোন হেতুকেই আকস্মিক বলা চলে। ইংরাজ ধনতন্ত্রের অগ্রগতি নানা ঘটনাপরম্পরার ফল, তাকে তাই আকস্মিক বলা অসম্ভব। অন্যদিকে জাতীয় সদ্‌গুণ সুযোগ না থাকলে অপ্রকাশিতই থেকে যায় এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও ইতিহাসের উত্থান-পতনের ধারা লোপ পায় না।

ল্যাস্কির মতে সুতরাং ইংল্যাণ্ডে নিয়মতন্ত্রের সাফল্যের প্রধান কারণ হল সেদেশে আর্থিক সুবিধা। সত্তর বছর আগে প্রসিদ্ধ লেখক বেজট তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে পার্লামেন্টীয় শাসন-পদ্ধতির কৃতকার্যতার কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন। তিনি তখনই বলেছিলেন যে এ প্রথা সাফল্য লাভ করতে হলে সমাজের মূলগত সমস্ত ব্যাপারে জনসাধারণের একমত হওয়া প্রয়োজন, সেই ঐক্য না থাকলে অধিক সংখ্যকের কোন সাময়িক ইচ্ছাকে অল্প-সংখ্যকেরা কখনও মেনে চলতে পারে না, অথচ পার্লামেন্টীয় শাসনের অর্থই হল সংখ্যাধিকের নির্দেশ অনুসরণ। ল্যাস্কি দেখিয়েছেন যে, বেজটের পরি-কল্পিত ঐক্য হচ্ছে আসলে ইংরাজ জাতির পক্ষে ধনতন্ত্রকে সর্বান্তকরণে স্বীকার; এই আনুগত্য আবার ইংল্যাণ্ডের বিশেষ আর্থিক সুবিধা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। তাই পার্লামেন্টীয় পদ্ধতির বাঞ্ছিত মূল ঐক্য এ ক্ষেত্রে প্রকৃত-পক্ষে ধনতন্ত্রের অবাধ প্রতিপত্তি ও অপ্রতিহত সাফল্যের প্রতিফলন মাত্র।

বেজট অবশ্য একথাও বলেছিলেন যে পার্লামেন্ট্ সার্থক হয়ে উঠেছে ইংরাজদের বিরুদ্ধ মত সহ্য করবার অভ্যাসের জন্য। ল্যাস্কি দেখিয়েছেন যে এ সহনশীলতা বস্তুত আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভবিষ্যত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে

পারার সৌভাগ্যের উপর নির্ভর করে। দেশের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাবের কথাও বেজট উল্লেখ করেছিলেন ; কিন্তু সে-শ্রদ্ধাও অনেকখানি নির্ভর করে আর্থিক সমৃদ্ধির উপর। ল্যাস্কি তাই সবিস্তারে দেখিয়েছেন যে সতেরো শতকের পর থেকে ধনতন্ত্রকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করাই ইংরাজ জাতির পার্লামেণ্টারি বিধান অনুসরণের প্রকৃত প্রেরণা।

পার্লামেণ্টীয় পদ্ধতির বাহ্যিক প্রকাশের এক প্রধান অঙ্গ হল দল বা পার্টির দ্বন্দ্ব। ইংল্যাণ্ড্ আড়াইশ বছর ধরে কখন উদারপন্থী কখনও বা রক্ষণশীল দল কর্তৃক শাসিত হয়ে এসেছে ; নানা বিষয়ে এই দুই দলের মতভেদ ও তীব্র বাদানুবাদ রাষ্ট্রিক ইতিহাসের পাতা জর্জরিত করে রেখেছে। ল্যাস্কি দেখিয়েছেন যে এত প্রভেদ ও মতান্তর সত্ত্বেও এতদিন ধরে উভয় দলের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য থাকাতেই নিয়মতন্ত্র ইংল্যাণ্ডে অবিচলিত থেকেছে। সে-ঐক্য অবশ্য ধনতন্ত্রকে স্বীকার। সমাজের আর্থিক ভিত্তি সম্বন্ধে কোন মতভেদ এতদিন মাথা তুলে দাঁড়ায় নি। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের প্রয়োগ ও দাবি নিয়ে মতের পার্থক্য দেখা দিলেও, সামাজিক গড়নের মূলসূত্র নিয়ে প্রশ্ন না ওঠাতেই বেজট-বর্ণিত ঐক্য ইংরাজ নিয়মতন্ত্রের সাফল্য সূচিত করেছে।

পার্লামেণ্টীয় শাসন-পদ্ধতির আধুনিক সমস্যা ও সংকট নিয়ে কিছুদিন থেকে অনেকেই মাথা ঘামিয়েছে। কারো কারো মতে পার্লামেণ্টের যন্ত্রে নানা দোষ দেখা গেছে, তার জন্যই এ পদ্ধতি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং জনসাধারণও ক্রমে এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হচ্ছে। গত শতকে এ প্রথার যে-জয়ধ্বনি পৃথিবী মুখরিত করেছিল আজ তার অবসান নাকি এই দুবলতার জন্যই। অধ্যাপক ল্যাস্কি এ গ্রন্থের অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে দেখিয়েছেন যে, পার্লামেণ্টারি শাসন-যন্ত্রের কোন দুর্বলতা এর প্রতিপত্তি হ্রাসের কারণ নয়। আসলে বেজট যে-ঐক্যকে এ পদ্ধতির সাফল্যের মূল কারণ বলে নির্দেশ করেছিলেন আজ ঘটনাচক্রে সে-ঐক্যে ভাঙন ধরেছে। পৃথিবী আজ আবার এক যুগসন্ধিতে পৌছেছে বলেই দেশের পর দেশে পার্লামেণ্টীয় শাসনযন্ত্র বিকল হয়ে পড়েছে।

ইংল্যাণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে আপেক্ষিক আর্থিক সুবিধার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত সংকট সেদেশেও পৌঁছেছে বলে নিয়মতন্ত্রও পরিবর্তনের যুগে সংকটাপন্ন হতে বাধ্য। পার্লামেণ্টীয় পদ্ধতির প্রকৃত সমস্যা ও বিপদ এইখানে।

শুধু তাই নয়, নিয়মতন্ত্রেরও এক স্বাভাবিক গতি আছে। উদারনীতিতে এর উৎপত্তি, গণতন্ত্রে এর ন্যায্য পরিণতি। প্রকৃত গণতন্ত্রে জনসাধারণ নিজেদের মঙ্গল অনুসন্ধান করতে বাধ্য। দেশের অধিকাংশ শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কিম্বা তার সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়লে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনিকদের স্বার্থ-হানির সম্ভাবনা আসে। বেজট অবস্থাপন্ন লোকেদের উপদেশ দিয়েছিলেন দরিদ্রের মঙ্গলসাধন করে দেশের জনসাধারণকে তৃপ্ত রাখতে; তাহলে নিয়মতন্ত্রও সুস্থ থাকতে পারবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। উনিশ শতকে ধনতন্ত্রের প্রসারের সময় এ ব্যবস্থা কার্যকরী হয়েছিল, অন্য দেশের তুলনায় ইংল্যাণ্ডে বেশীদিন ধরে এ নীতি চালানোও ছিল সম্ভব। কিন্তু সংকোচনের সময় ধনতন্ত্র এত ভার বইতে পারে না। তাই গণতন্ত্রে উদ্দীপ্ত জনসাধারণের কামনা এবং আর্থিক সমস্যায় প্রপীড়িত ধনিকদের স্বার্থসন্ধানের মধ্যে বিরোধ ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠতে বাধ্য। জার্মানি আর ইটালিতে এর ফলে এসেছে ফাশিজ্‌মের প্রকোপে নিয়মতন্ত্রের পতন। ফ্রান্সেও অনুরূপ সমস্যা দেখা গিয়েছে। ল্যাস্কি বিশ্বাস করেন যে ইংল্যাণ্ডেও সে-সংগ্রাম সুরু হয়েছে।

বার্নার্ড্ শ লিখেছিলেন যে, সোশালিজ্‌মের উদয়ে এক রুদ্ধ প্রশ্ন মূর্ত হয়েছে। সে-প্রশ্ন অবশ্য সমাজের ভবিষ্যত গড়নের স্বরূপ সম্বন্ধে। ফাশিস্ট্‌দের চাপ সে-প্রশ্নকে চাপবার চেষ্টা মাত্র। শত স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও ইংরাজ সমাজ আজ এ প্রশ্নে আলোড়িত ও মথিত হচ্ছে। ল্যাস্কি দেখিয়েছেন যে, আজকের দিনের মতভেদের তুলনায় হুইগ-টোরির আবহমান দ্বন্দ্ব ছেলেখেলা মাত্র। তাই যুদ্ধান্তে ইংল্যাণ্ডে লিবারেল ও কন্‌সারভেটিভ দল প্রকৃতপক্ষে ধীরে ধীরে এক হয়ে একই ধনিক দলে পরিণত হচ্ছে। তাদের বিরোধ শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে, তাদের আপত্তি সোশালিজ্‌মের আগমনে।

ল্যাস্কি বলেছেন যে মূলগত ঐক্য ভেঙে পড়াতেই নিয়মতন্ত্রের সংকট ঘনিয়ে এসেছে। ব্রিটিশ লেবার পার্টির অবশ্য এখনও বিশ্বাস যে তারা দেশের অধিক সংখ্যক ভোট সংগ্রহ করতে পারলেই নির্বিবাদে নূতন সমাজ গড়ে তুলতে পারবে পার্লামেণ্টারি যন্ত্রের সাহায্যেই। কিন্তু সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা সে-ভরসাকে ক্ষীণ করে রেখেছে। এমন কি ইংল্যাণ্ডেও ১৯১৪ সালে কার্সনের নেতৃত্বে অনেকে সবলে হোম্‌রুল্‌কে বাধা দিতে উদ্যত হয়েছিল। সোশালিজ্‌মের মতন সমাজের বিরাট ও আমূল পরিবর্তনকে কি ধনিকেরা নির্বাচনের পরমুহূর্তে মাথা পেতে মেনে নেবে? ল্যাস্কি ধনিক শ্রেণীর নানা অস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রপাগাণ্ডার কথা ছেড়ে দিলেও থাকে হাউস অব লর্ড্‌সের ক্ষমতা—প্রতিনিধি-সভা কমন্সের নির্ধারিত বিধিবিধান লর্ড্‌স্-সভা দুবছর মুলতবি রাখতে পারে। এর ফলে সমাজের সংস্কার অর্ধপথে স্থগিত কিম্বা পঙ্গু হয়ে পড়া সম্ভব। লেবার পার্টি যদি লর্ড্‌স্-সভা উঠিয়ে দেবার আইন করে, তাহলে বর্তমান ব্যবস্থার শেষ রক্ষক হিসাবে রাজশক্তি হয়ত পথ আটকে দাঁড়াবে।

এছাড়াও রয়েছে ধনিকদের হাতে আর্থিক আতঙ্ক সৃষ্টি করবার ক্ষমতা। ১৯৩১-এ ইংরাজ শ্রমিক দলের পরাজয় অনেকখানি এই অস্ত্রের সাহায্যেই হয়েছিল—সম্প্রতি ফ্রান্সে পপুলার ফ্রণ্টের পতন এই ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। রবার্ট ওয়েন প্রভৃতি ইউটোপিয়ান সোশালিস্ট্‌রা বিশ্বাস করতেন যে, ধনিকদের আন্তরিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে নূতন সমাজ গড়ে তোলা যাবে। ব্রিটিশ লেবার পার্টির এখনও অনেকটা সে-বিশ্বাস থেকে গেছে। এ ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন করাই অধ্যাপক ল্যাস্কির প্রধান লক্ষ্য।

৪। পরিচয় : ফাল্গুন ১৩৪৫ (১৯৩৯)॥

ইতিহাসে শক্তিলিপ্সা

বিংশ শতাব্দীর ইংরাজ মনীষীদের মধ্যে বার্ট্রাণ্ড্ রাসেলের উচ্চ স্থান সর্বজনস্বীকৃত। যুদ্ধান্তের যুগে কিছুদিন তাঁর বিবিধ পুস্তক চিন্তাশীল লোকমাত্রের পাঠ্য ও আলোচ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাঁর খ্যাতি এবং ভক্তবৃন্দ এ দেশে পর্যন্ত তখন ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে-নূতন ভাবধারা পৃথিবীর সর্বত্র প্রবল হয়ে উঠেছে, রাসেল-প্রমুখ নিষ্ঠাবান উদারনৈতিকদের প্রভাবনাশ তার অন্তরঙ্গ অংশ বলেই মনে হয়। আজকের দিনের রাসেল সেই আগেকারই বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল, শুধু ইতিমধ্যে তাঁর অনেক পাঠকের মনের রাজ্যে যে-পরিবর্তন এসে গেছে, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সত্বেও তিনি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন নি।

ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা আজকাল বহুলোকের মনে ছায়া ফেলাতে রাসেল চিন্তিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন, কারণ তাঁর মনের গড়ন ও চিন্তার ধরন সম্পূর্ণ পৃথকগোত্রীয়। তিনি তাই এই গ্রন্থখানিতে মানুষের অতীতের ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যতের ভরসা সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করেছেন। রাসেলের পূর্ব প্রতিপত্তি এত বেশী, তাঁর লেখার সরস প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ এখনও এত অক্ষুন্ন, তাঁর যুক্তিকৌশল এত নিপুণ যে, এই বইখানির বহুল প্রচার অবশ্যম্ভাবী। সেই সঙ্গে তাঁর মূল বক্তব্য সম্বন্ধে আলোচনার দায়িত্ব এড়ানোও অবশ্য কঠিন হয়ে পড়েছে।

রাসেল ইতিহাসের মূল সূত্র খুঁজেছেন মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে, বিশেষ করে যে-সব প্রবৃত্তি মানুষকে অন্য জন্তুর থেকে পৃথক করে রেখেছে। মানুষের বহু ইচ্ছার বৈশিষ্ট্যই নাকি তাদের অসীমতা। এই সীমাহীন

Power—a new social analysis—by Bertrand Russell (George Allen and Unwin).

আকাঙ্ক্ষাগুলির মধ্যে পাওয়ার বা শক্তিলিপ্সাকে রাসেল বেছে নিয়েছেন ইতিহাসের মূল প্রেরণা হিসাবে। খ্যাতি বা কীর্তির অভিলাষকেও অবশ্য এই শক্তিস্পৃহার অন্তর্গত করা হয়েছে।

গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়সিদ্ধির পরও যে মানুষ স্থির থাকে না, রাসেলের মতে এর কারণ শক্তিসন্ধান। জড় জগতে এনার্জি যেমন মূল প্রভাব, মানব সমাজে তেমনই শক্তিলাভ হল চালক-স্থানীয়। আর শক্তি কোন বিশেষ প্রকারের ক্ষমতা নয়। মানুষের ঈপ্সিত এই শক্তির নানা রূপ ও মূর্তি আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন একটি অন্যগুলির চাইতে বেশী প্রধান নয়। অর্থাৎ আর্থিক বিধিব্যবস্থাকে ইতিহাসে মূল বস্তুর পদমর্যাদা দিতে রাসেল একেবারেই প্রস্তুত নন।

শক্তি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি হলেও সকলের মধ্যে এর সমান বিকাশ অবশ্য দেখা যায় না। তাছাড়া সকলেই ক্ষমতার সন্ধান করলে কোনও সংঘবদ্ধ আচরণ বা প্রতিষ্ঠান অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই রাসেল লিখেছেন যে এই মূল প্রবৃত্তি সকলের মধ্যে সমান প্রবল নয়, এবং এর আবার প্রকারভেদ আছে। নেতৃত্বের অভিলাষ হচ্ছে এ প্রবৃত্তির প্রকট রূপ, কিন্তু অসংখ্য লোকের মনে নেতাদের অনুসরণ করবার ইচ্ছাও সেই একই আকাঙ্ক্ষার প্রচ্ছন্ন ছায়া। এই যুক্তির সাহায্যে রাসেল পাওয়ার বা শক্তিলিপ্সাকেই সমাজের নিয়ন্ত্রক বলে ঘোষণা করেছেন। নেতা ও অনুচর ছাড়া আর এক-জাতীয় লোকের অস্তিত্ব তিনি অবশ্য অস্বীকার করেন নি—তারা নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে নিরীহতা কামনা করে। রাসেলের ব্যাখ্যায় হয়তো এও আরেক প্রকারের শক্তির সন্ধান।

রাসেল দেখাতে চেয়েছেন যে ক্ষমতালাভের স্পৃহা সমাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রূপ নিয়েছে। শক্তিপ্রকাশের বিভিন্ন মূর্তি তাই ইতিহাসের মূল কথা। এই প্রকারভেদের প্রকৃতিগত তিনটি পর্যায় আছে বলা যায়। এক প্রকারের শক্তি প্রচলিত ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে—এ ক্ষেত্রে সমাজ তাকে অভ্যাসের বশে বিনা বিচারে মেনে নেয়। দ্বিতীয়

এক পর্যায় হল বিপ্লবী শক্তি—অর্থাৎ সমাজের এক অংশ পুরাতন ব্যবস্থাকে বর্জন করে নূতন শক্তির প্রতিষ্ঠা করে অথচ অন্য অংশগুলি তখনও পুরাতনের মায়া কাটাতে পাবে না এবং তাই তাদের দমন কবতে হয়। তৃতীয়ত, স্থান বিশেষে অল্পদিনের জন্য চালকশক্তি সম্পূর্ণ আবরণহীন স্বেচ্ছাচারী নিছক ক্ষমতাপ্রকাশে পরিণত হতে পারে, রাসেল তাকে উলঙ্গ শক্তি আখ্যা দিয়েছেন। তার পিছনে অবশ্য প্রাচীন ঐতিহ্য কিংবা নবীন দৃষ্টিভঙ্গীব সমর্থন খুঁজে পাওয়া দুর্লভ।

পাওয়ারেব প্রকাশের মূল রূপ হচ্ছে এই তিনটি। কিন্তু যে-সব প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শক্তি ব্যবহৃত হয় তাদের আবার নানা প্রকাবভেদ আছে। অবশ্য এই সব ভিন্ন ভিন্ন রূপগুলি সব সময় সম্পূর্ণ পৃথক বা পরস্পববিরোধী নয়। রাসেল এদের মধ্যে অনেকগুলির বিস্তৃত আলোচনা কবেছেন। পুরোহিতদের শাসন, অবাধ রাজতন্ত্র, অভিজাতবর্গ বা অল্পসংখ্যক লোকের আধিপত্য, অস্ত্রশক্তিব কর্তৃত্ব, আর্থিক প্রভুত্ব, লোকমতেব সংগঠন ও প্রভাব ইত্যাদি নানা-জাতীয় শক্তি এবং তাদেব পাবস্পবিক সম্বন্ধের বিষয়ে রাসেলের অনেক বক্তব্য সুচিন্তিত এবং সুপাঠ্য।

মানুষের অতীত ও বর্তমান এইভাবে আলোচনা করে রাসেল তার ভবিষ্যত সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। পাওয়ারের আকাঙ্ক্ষা, এই প্রবল প্রবৃত্তির তাড়না, ক্রমাগতই ইতিহাসে সর্বনাশী মূর্তি নিয়েছে। শক্তি-সন্ধানের উপর যে-সব দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠিত, তাদেব দোষ নির্ণয়ে তাই তাঁর লেখনী বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু মানুষ তার প্রবৃত্তির হাত থেকে কি করে সম্পূর্ণ উদ্ধাব পাবে? তাছাড়া শক্তির অপব্যবহারই দূষণীয়—মানুষের মঙ্গলসাধন কবতে হলেও তো ক্ষমতার প্রয়োজন আছে। এমন কি অতীতেও অনেক সময় পশুবলের চাইতে শ্রেয়তর আদর্শ শক্তি-হিসাবেই শেষ পর্যন্ত বেশি স্থায়ী হয়েছে। অবশ্য কোন কিছু সবলে প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়া গোঁড়া মনের পরিচয়, এবং রাসেলের বিশ্বাস তিনি গোঁড়ামি সহ্য করতে পারেন না। সুতরাং মানুষের ভবিষ্যত নির্ভর করছে শক্তির

প্রবৃত্তিকে উৎপাটন নয়, তাকে আয়ত্তে আনার উপর। শক্তির আকাঙ্ক্ষাকে মানুষের কল্যাণে লাগাতে হলে অবশ্য কতকগুলি ব্যবস্থার প্রয়োজন। রাসেল সব শেষে সেগুলির নির্দেশ দিয়েছেন।

রাষ্ট্রের মধ্যে চাই গণতন্ত্র এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, বিভিন্ন মত প্রচারের এবং শাসকদের পূর্ণ সমালোচনার অধিকার সেই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে। আর্থিক ব্যবস্থায় সোশালিজমে রাসেলের আপত্তি নেই, কিন্তু তার মধ্যে কোন প্রকার ডিক্‌টেটরি কর্তৃত্ব সাময়িক ভাবেও অগ্রাহ্য—কেন না অবাধ শক্তি হাতে এলেই তার অপব্যবহার হবে। ভবিষ্যতের মানুষকে দায়িত্ববান ও সুখী করে তুলতে আরও দুটি ব্যবস্থার প্রয়োজন। শিক্ষার লক্ষ্য হবে মানুষ যাতে কোনও কথা সহজে বিনা বিচারে মেনে না নেয়—অর্থাৎ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রচার। আর শান্তি ও মঙ্গলের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য মানুষের মধ্যে যে-সব গুণের বহুল প্রচলন রাসেল কামনা করেছেন, নাস্তিক হলেও সেগুলি তাঁর পক্ষে ধর্মের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

উপরের বিবরণ থেকে রাসেলের মূল বক্তব্য সম্বন্ধে একটা ধারণা করা বোধ হয় সম্ভব। সমালোচকের মনে এ প্রসঙ্গে প্রথমেই দুটি প্রশ্ন এসে পড়ে। পাওয়ার গ্রন্থের নাম-পত্রিকাতে দাবি করা হয়েছে যে এর মধ্যে রয়েছে সামাজিক প্রগতির এক নূতন বিশ্লেষণ, কিন্তু এই নূতনত্বের দাবি কতখানি সঙ্গত? ফ্রয়েড এক সময়ে সেক্স্-প্রবৃত্তিকে মানুষের সকল প্রচেষ্টার উৎসে বসিয়েছিলেন, তারপর তাঁর ধারণাকে ক্রমান্বয়ে পরিশুদ্ধ করতে করতে রাসেলের মতের মতনই একটা মূল তাড়নাতে সে-আইডিয়া পর্যবসিত হল। মানুষের বিশেষ কোনও প্রবৃত্তিকে ইতিহাসের চালক হিসাবে গ্রহণ করা কিছু নূতন কথা নয়—ভাববাদী ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা মাত্রই এই গোত্রীয়। দ্বিতীয়ত, তাঁর গ্রন্থের দশ ও তেরো পৃষ্ঠায় রাসেল দাবি করেছেন যে তাঁর ব্যাখ্যা মার্ক্সের মতামতের চাইতে বেশি ব্যাপক, সঙ্গত ও যথার্থ। মার্ক্সের খণ্ডনই তাই বইখানির উদ্দেশ্য মনে করলে নিতান্ত

অন্যায় হবে না। কিন্তু গ্রন্থকারের এ দাবি কতখানি যুক্তিযুক্ত? রাসেলের নিজের কথাতেই বলা যায় যে পাওয়ার-লাভের সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে কি মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের বিশেষ কোন সুবিধা হয়?

ইতিহাসের যে-কোনও ব্যাখ্যার পক্ষে একটা অবশ্যকর্তব্য আছে—সে-কর্তব্য সামাজিক পরিবর্তনের কারণনির্ণয়ের চেষ্টা। পরিবর্তন ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের কোনও বিষয়বস্তু থাকে না। রাসেল নানা ঐতিহাসিক পরিবর্তনের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করবেন যে তার যথেষ্ট হেতুনির্দেশের তিনি চেষ্টা করেন নি। এর কারণ সহজেই বোঝা যায়। মানুষের প্রবৃত্তি মোটামুটি একই অবস্থায় থাকে, তার মূল প্রকৃতিতে কোনও পরিবর্তন বা বিবর্তনের ধারার সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু যুগে যুগে মূল প্রেরণা অবিকৃত থাকলে ভিন্ন ভিন্ন যুগের পার্থক্যের কারণ কি? আবার পাওয়ারের প্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন রূপকে পরিবর্তনের হেতু হিসাবে নির্দেশ করলে প্রশ্ন ওঠে যে সেই প্রকারভেদই বা কেন দেখা যায়? অর্থাৎ এক এক যুগে যদি শক্তি সন্ধান এক এক মূর্তি নেয় তবে সে-ক্ষেত্রে কোনটি কার্য এবং কোনটি কারণ?

বস্তুত রাসেলের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা এই উভয় সংকটে পড়ে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হতে বাধ্য। তাই তিনি সমাজের নানা অবস্থার চিত্র এঁকেছেন মাত্র; সামাজিক পরিবর্তনের কোন ধারার নির্দেশ, যুগ থেকে যুগান্তরে আসবার কোনও হেতু নির্ণয় সম্বন্ধে তাঁকে নীরব থাকতে হয়েছে। এ অবস্থায় তাঁর থিওরিকে ব্যাপক ব্যাখ্যা হিসাবে দাবি করবার কোন অর্থ নেই।

অবশ্য আলোচ্য গ্রন্থখানিতে রাসেল সামাজিক পরিবর্তনের কারণ হিসাবে দুটি কথার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর সে-চেষ্টাকে নিতান্তই ক্ষীণ বলতে হবে। প্রথমত রাসেল লিখেছেন যে, যাদের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে কিছুদিন পর তারা অন্যদের শুভাশুভ সম্বন্ধে আর দৃষ্টি রাখে না এবং তাই বিরোধী শক্তি জেগে ওঠে। কিন্তু তিনি যখন শক্তির অপব্যবহারকে অবশ্যম্ভাবী বলতে রাজি নন, তখন প্রশ্ন থেকেই যায় যে

যুগসন্ধির সময় অকস্মাৎ কেন পূর্বপ্রচলিত বিধিব্যবস্থা অনেকের কাছে অন্যায় মনে হতে থাকে। বিপ্লবের কারণ শুধু শাসকদের নৈতিক দুর্বলতা, এ ব্যাখ্যা কোনও ঐতিহাসিককে তৃপ্ত করতে পারবে না। অন্যত্র রাসেল বলেছেন যে পরিবর্তনের কারণ হল যে, প্রকৃত শক্তিশালী লোকেরা এর মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রকাশ খোঁজে। কিন্তু তারা কেনই বা প্রচলিত ব্যবস্থার রক্ষায় সে-শক্তি নিয়োগ করে না এ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। যদি বলা হয় যে সমাজের সংরক্ষক শক্তিকে পরিবর্তনের সমর্থক শক্তি পরাস্ত করে, তবে প্রকারান্তরে আবার আমাদের মূল প্রশ্ন ফিরে আসে। ভাববাদী ব্যাখ্যা তাই শেষ পর্যন্ত মানুষের ইতিহাসকে আকস্মিক অথবা ভগবানের লীলা বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। রাসেলের সামাজিক বিশ্লেষণের যুক্তিসঙ্গত পরিণাম সেই বহুপ্রাচীন আদর্শবাদের মধ্যেই।

অতীত সম্বন্ধে রাসেলের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা তাই তার স্বভাবজাত পঙ্গুতা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। ভবিষ্যতের ভরসার বিষয়েও তাঁর মতামত খুব বাস্তব নয়। শক্তিলিপ্সাকে মানুষের মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত করতে হলে যে-সব ব্যবস্থা রাসেলের কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে, সেগুলি কার্যকরী করবার উপায় কি? ক্ষয়োন্মুখ ধনিক সমাজে আজ গণতন্ত্র সমূহ বিপন্ন হয়ে পড়েছে, উদার গণতন্ত্রের শুধু মাহাত্ম্য কীর্তন করলেই সে-সংকট কাটবে না। রাসেল সোশালিজম্ বাঞ্ছনীয় বলেছেন কিন্তু ডিক্‌টেটরশিপের উপর তাঁর এতই বিতৃষ্ণা যে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বিশুদ্ধ উদারনৈতিক পদ্ধতির ভিতর দিয়ে সিদ্ধ না হলে তিনি তার প্রতি বিমুখই থাকবেন। এ ক্ষেত্রে অবশ্য সন্দেহ ওঠে অনিবার্য যে রাসেলের পক্ষে সোশালিজম্ কল্পনার বিলাস মাত্র, নূতন সমাজ গঠনের প্রতি আসলে তাঁর আন্তরিক টানের অভাব আছে।

ধনিকতন্ত্রও যে মূলধনীদের ডিক্‌টেটরশিপ এ কথা রাসেল হৃদয়ঙ্গম করেন নি। বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও শিক্ষার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস, অথচ 'নিরপেক্ষ' বুদ্ধিবাদও যে শ্রেণীস্বার্থকে ছাড়িয়ে ওঠে না —এই সন্দেহটুকু তাঁর

মনে উদয় হয় নি। ইউটোপিয়ান বা অবাস্তব-সোশালিস্ট্ কথাটির প্রচলন হয়েছিল বিদ্রূপ হিসাবে, বার্ট্রাণ্ড্ রাসেলকে ইউটোপিয়ান লিবারেল আখ্যা দেওয়া অন্যায় হবে না।

মার্ক্সের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার গোড়ার কথা ছিল শ্রেণী সম্বন্ধে ধারণা এবং ডায়ালেক্‌টিকের নিয়ম অনুসারে শ্রেণীসম্বন্ধের ক্রমবিকাশ। রাসেলের থিওরি কোন অংশেই এর থেকে বেশি ব্যাপক বা সঙ্গত নয়, পক্ষান্তরে মার্ক্সের বক্তব্য পর্যন্ত তিনি ঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারেন নি। আসলে বার্ট্রাণ্ড্ রাসেলের মনোভাব আঠারো শতকের তথাকথিত যুক্তি-বাদের নতুন সংস্করণ। সমাজ তাঁর কাছে কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে **atomistic**। সমাজের প্রকৃতি ও গড়ন যে শ্রেণী-বিভাগের উপর নির্ভর করে, রাসেলের চোখে তার সম্যক রূপ ধরা পড়ে নি। এই-জাতীয় মনোভাব মধ্যশ্রেণীর আধিপত্যের দার্শনিক আবরণ মাত্র। আলোচ্য গ্রন্থের ২১৩ পৃষ্ঠায় তাই রাসেল যখন আধুনিক মানবের জীবন-যাত্রার ছবি এঁকেছেন তখন হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেই সে-ছবিতে ফুটে উঠেছে শুধু ইংরাজ মধ্যশ্রেণীর জীবনের স্বল্প অভিজ্ঞতাটুকু। মার্ক্সের মতবাদ কখনই এতো সংকীর্ণ ও অল্পপরিসর নয়।

রাসেলের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাথমিক দুর্বলতার জন্য তাঁর পুস্তকে এমন অনেক মন্তব্য স্থান পেয়েছে যার যাথার্থ্য গভীর সন্দেহের কথা। রাসেল বোঝেন নি যে মার্ক্সের বাস্তব ব্যাখ্যাকে আর্থিক বলা হয় এইজন্যই যে, শ্রেণীর উৎপত্তি ও প্রকৃতি আর্থিক ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে। শ্রেণীস্বার্থের জন্য সাময়িক অর্থক্ষয় স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে সুতরাং মার্ক্সের থিওরির দুর্বলতা প্রতিপন্ন হয় না। জার্মানি বা ইটালিতে আজ যখন রাষ্ট্রশক্তি স্থানীয় ধনিকদের কাছ থেকে কিছু বেশি দেয় আদায় করতে বাধ্য হয়েছে, তার থেকে প্রমাণ হয় না যে ফাশিস্ট্ শাসন ধনতন্ত্রের বিরোধী। এ কথা বোঝা সহজ যে ব্যক্তিগত স্বার্থের থেকে শ্রেণীস্বার্থের দাবি অনেক বেশি; নয়তো নানা আর্থিক অসুবিধা সহ্য করেও শ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়ান

গড়বার প্রয়াস পেত না। মার্ক্সের কর্মপদ্ধতি ও সামাজিক বিশ্লেষণে রাষ্ট্রিক বা পোলিটিকাল শক্তির উপর জোর দেওয়া হয় নি, ১০৪ পৃষ্ঠায় এই উক্তি এতই অসার যে রাসেলের মতো পণ্ডিতের পক্ষে তা শোভা পায় না। শ্রেণীসংঘর্ষের জন্য দায়িত্ব মার্ক্সবাদের উপর চাপিয়ে রাসেল শুধু এই প্রমাণ করলেন যে, সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীভেদের প্রভাব সম্বন্ধে তিনি অসংখ্য সাধারণ বুদ্ধিবাদীদের মতন একেবারেই সচেতন নন। বার্ল ও মীন্‌স্ নামক দুই মার্কিন লেখকের উপর নির্ভর করে আলোচ্য গ্রন্থে বারবার বলা হয়েছে যে, মার্ক্সের বিশ্লেষণকে ব্যর্থ করেছে আধুনিক ধনতন্ত্রের রূপ; ব্যবসা-বাণিজ্যে নাকি আজকাল চূড়ান্ত কর্তৃত্ব নির্ভর করে মূলধনের মালিকের চাইতেও মুষ্টিমেয় কর্ণধারদের হাতে। রাসেল মনে রাখেন নি যে আর্থিক জগতে এই নূতন এক কর্তৃত্বের ধারার সন্ধান মার্ক্সই প্রথম দিয়েছিলেন। তিনি এ কথাও ভেবে দেখেন নি যে এতে ধনতন্ত্রের প্রকৃতির সবিশেষ পরিবর্তন আসে না, কারণ ব্যবসার কর্তৃপক্ষেরা একই ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি মাত্র—ঠিক যেমন রাষ্ট্রশক্তি শাসকশ্রেণীর প্রতিভূ।

।। পরিচয় : চৈত্র ১৩৪৫ (১৯৩৯) ।।

ফাশিজ্‌মের প্রকৃতি

আজকাল ফাশিজ্‌ম্ শব্দটি বহুলোকের কাছে প্রতিপক্ষকে গালাগালি দেবার, তার স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করবার, একটা নতুন উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কথাটার আসলে একটা বিশেষ অর্থ আছে, তার দিকে আমাদের মন দেওয়া দরকার। কতকগুলি ধারণা ও ব্যবহার সংক্ষেপে নির্দিষ্ট করবার জন্যেই এই নামের সৃষ্টি হয়েছে। ফাশিস্ট্ শাসনের দুটো প্রধান দিক আছে, দুটোই হল অন্যের উপর প্রচণ্ড চাপের কথা। একদিকে দেশের মধ্যে জনসাধারণকে চেপে রাখবার সংকল্প এই ব্যবস্থায় প্রকাশ পায়, অন্যদিকে দেখতে পাই দুর্বল জাতিকে দাবিয়ে রেখে প্রসারের চেষ্টা। এই দুই চাপের মধ্যে আবার একটা গভীর যোগ থাকাই স্বাভাবিক।

ফাশিজ্‌মের আবির্ভাবের ইতিহাস থেকে এর প্রকৃত রূপ বোঝা সহজ হয়। ফরাসী বিপ্লবের যুগে ইয়োরোপে এক নতুন আর্থিক ব্যবস্থা জয়যুক্ত হল, গত একশ বছরে ক্যাপিটালিজ্‌ম্ বা ধনতন্ত্র নামে এই ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মূলধনের সাহায্যে যন্ত্রের ব্যবহারে মজুর খাটিয়ে প্রভূত পরিমাণে জিনিস প্রস্তুত, আর প্রচুর লাভ রেখে তার বিক্রয়—এই হল এ বন্দোবস্তের মূল কথা। এর ফলে পুরানো আমলের রাজা ও জমিদারদের ক্ষমতা কমে গিয়ে দেশে কর্তৃত্ব এল ব্যবসাবাণিজ্য ও কলকারখানার মালিকদের হাতে—যাদের আমরা বুর্জোয়া নামে পরিচয় দিয়ে থাকি। লিবারেল বা উদার মতবাদ এদেরই সৃষ্টি—রাজা ও তার পার্শ্বচরদের হাত থেকে শাসনভার নিয়ে এরা দেশে দেশে ডিমক্র্যাসি স্থাপন করল। তাতে নামে জনসাধারণের হাতে রাজ্যভার এল, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতা স্থাপিত হল—যদিও আসলে আর্থিক ব্যবস্থার মালিকদের হাতেই রইল প্রকৃত কর্তৃত্ব। তবুও সেকালের স্বেচ্ছাচারিতার বদলে নিয়মতন্ত্র অর্থাৎ

কন্‌স্টিটিউশনাল শাসনপদ্ধতি আসাতে খানিকটা লাভ হয়েছিল একথা অস্বীকার করা যায় না।

ধনতন্ত্রের প্রথম যুগে সাধারণ নিয়ম ছিল দেশে দেশে অবাধ বাণিজ্য ও দেশের ভিতর মালিকদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা। কিন্তু ক্রমে আর্থিক অবস্থা বদলাতে বদলাতে ইম্পিরিয়ালিজ্‌মের আকার নেয়। তখন ঝোঁক হল মনোপলি বা একচেটিয়া কর্তৃত্বের দিকে। ফলে, শক্তিশালী কয়েকটি দেশ বা সাম্রাজ্য আপন আপন ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে সারা জগত নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। কিন্তু সাম্রাজ্যগুলির পরস্পরের মধ্যে রেশারেশি এতে বাধ্য হয়ে চরমে পৌছায়। ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধ এরই ফল, এবং এইজন্য তাকে সাম্রাজ্যতন্ত্রী যুদ্ধ নাম দেওয়া হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকটাও তারই পুনরাবৃত্তি।

ইতিমধ্যে দেশে দেশে আর্থিক শোষণের ফলে সাধারণ লোকের মনে অসন্তোষ আর সমাজবাদী বা সোশালিস্ট্‌ মনোভাব দেখা দেয়। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব নূতন আর্থিক ব্যবস্থা ও নতুন সমাজসৃষ্টির চেষ্টায় সোভিয়েট পদ্ধতির সূত্রপাত করল। সেই থেকে সকল দেশের জনসাধারণের আশাভরসা সোভিয়েট দেশের দিকে মুখ ফেরায়, আর সর্বত্রই একটা সম্পূর্ণ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠতে থাকে।

গত পঁচিশ বছর তাই নানা দেশে বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এতে অগ্রণী হয়েছে মজুরেরা, আর তাদের প্রধান সহায় হচ্ছে চাষীরা। তাতে বিপন্ন বোধ করছে মালিকেরা আর তাদের সব বন্ধুবান্ধব। আজকের দিনে পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় কথা হল এই।

এই নতুন বিপদকে ঠেকিয়ে রাখবার শেষ অস্ত্র হিসাবেই ফাশিজ্‌মের উৎপত্তি। তাই যেসব দেশে নানা কারণে পুরানো মালিকী বন্দোবস্ত সবচেয়ে বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ে সেই সব অঞ্চলেই প্রথম ফাশিস্ট্‌দের আবির্ভাব হয়। ছলে ও বলে সাধারণ লোকেদের ভুলিয়ে রাখাই হল এদের উদ্দেশ্য। আগেকার উদার বন্দোবস্তে আর মালিকানা রাখা যাচ্ছে না দেখে নতুন ফন্দি বের

করা এদের কাজের ধরন। ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যতন্ত্রকে কোনও ক্রমে সামলে রাখবার এই নতুন চেষ্টাকেই ফাশিজ্‌ম্ নাম দেওয়া হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইটালিতে বিপ্লব আসন্ন হয়ে পড়াতে সেখানে প্রথম ফাশিজ্‌ম্ দেখা দিল। ১৯২৯-এর আর্থিক সঙ্কটের পর জার্মানিতে অবস্থা কাহিল হওয়াতে তখন সেখানে নাৎসিদের প্রভুত্ব এল। জাপানে অনেকদিন থেকেই মালিকদের অবস্থা দুর্বল হয়ে আসছিল, তাই ১৯৩১-এর পর সেখানেও কার্যত ফাশিস্ট্ কর্তৃত্ব এসে পড়ে। তারপর ছোট বড় অনেক দেশে এর অনুরূপ মনোভাব দেখা দেয়। আমাদের দেশেও যারা ফাশিজ্‌মের দিকে ঝুঁকছে, মুখে যাই বলুক মনে প্রাণে তারা কিষাণ সভা ও মজুর ইউনিয়ানগুলিকে ছলে বলে ভুলিয়ে ও দাবিয়ে রাখতে চায়। সেই জন্যে তারাও আমাদের শত্রু।

এবার ফাশিজ্‌মের ভিতর ও বাইরের চাপের কথা কিছু বলা যাক। দেশের ভিতরে ফাশিস্ট্ লক্ষ্য হল যাতে সাধারণ লোকেরা বিপ্লবের দিকে এগোতে না পারে। তাই ফাশিস্ট্‌দের হাতে ক্ষমতা যাওয়া মাত্র প্রথমেই তারা মজুর ও কিষাণদের স্বাধীন সভাসমিতি আর তাদের নিজস্ব পার্টিগুলিকে ভেঙে চুরে দেয়। দেশে নিয়মতন্ত্র, উদার শাসনব্যবস্থা আর সাধারণ লোকের অবাধ মতপ্রকাশ ইত্যাদির স্বাধীনতা থাকলে অসন্তোষ মুখ ফুটে বের হতে পারে, তাই ফাশিস্টেরা এ সব নিয়মকানুন উচ্ছেদ করে ফেলে। দেশে তখন ছোট বড় নেতার অসীম অবাধ কর্তৃত্ব চলে—রাজ্যশাসন হয় ডিক্টেটরি চালে। বিপ্লবকে সফল করতে ও আত্মরক্ষার জন্য সাময়িকভাবে ডিক্টেটর্-শিপ অনেক সময় দরকার হয় অবশ্য—ফরাসী আর রুশ বিপ্লবের সময় তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ফাশিস্ট্ ডিক্টেটর্‌শিপ সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। এখানে আসলে কোনও বিপ্লবের দেখাই নেই—মালিক শ্রেণীর আর্থিক কর্তৃত্ব, তাদের মালিকানা, আগের মতনই বজায় থাকে। তাই এ ডিক্টেটর্-শিপ হল বিপ্লব ঠেকাবার অস্ত্র। তাছাড়া ব্যবস্থাটা সাময়িক নয়, চিরকালের জন্য—কারণ ডিমক্র্যাসিকে ফাশিস্টেরা বরাবরের মতনই বর্জন করতে চায়। কিন্তু অসংখ্য সাধারণ লোককে শুধু গায়ের জোরে দাবিয়ে রাখা শক্ত কথা,

বিশেষত যখন আর্থিক শোষণ চলতেই থাকে। তাই কৌশলে লোকদের ভুলিয়ে রাখার দরকার পড়ে। এইজন্যে ফাশিস্ট্‌দের খুব জোর প্রচার বা প্রপাগাণ্ডা চালাতে হয়। সব দিক থেকে লোকের মনকে যতদিন সম্ভব অভিভূত রাখবার প্রবল চেষ্টা তাই ফাশিস্ট্‌ চাপের একটা বিশেষ দিক—অতীতের-গৌরব কথা, বর্তমান নেতাদের মাহাত্ম্য, সমস্ত জাতিটার একতা-বোধ, অন্যদের প্রতি বিদ্বেষ, বিপ্লবীদের সম্বন্ধে মিথ্যাপ্রচার, ভবিষ্যতে সৌভাগ্যের সম্ভাবনা—এইরকম নানা অবান্তর কথা বন্যার স্রোতের মতন লোকদের মন আচ্ছন্ন করে ফেলে। সেই সঙ্গে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে যারা সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে বলতে পারে তাদের অবশ্য নির্মম ভাবে শেষ করে দেওয়া হয়।

ফাশিজ্‌মের বাইরের চাপটাও এই লোক-ভোলানোর সঙ্গে জড়ানো। আর্থিক ব্যবস্থায় পুরানো মালিকানা বজায় রাখা শক্ত কথা। কিন্তু যদি আশেপাশের দুর্বল দেশগুলিকে আক্রমণ করে পায়ের তলায় চেপে ফেলা যায়, তাহলে সেঃ লুটের দৌলতে আরও কিছুদিন স্বস্তিতে থাকা অসম্ভব নয়। এমন কি তাতে স্বদেশের সাধারণ লোকদের অবস্থা একটু ভাল করাও চলতে পারে, অর্থাৎ অন্যের সম্পদ কেড়ে এনে তাতে নিজেদের লোকদের কিছু ঘুষ দিয়ে ঠাণ্ডা রাখা যায়। ফাশিজ্‌ম্‌ তাই সর্বদাই যুদ্ধের দিকে ঝোঁকে, আর সেই জন্য ফাশিস্টেরা জগতের শান্তিব প্রধান শত্রু। যুদ্ধের আর এক সুবিধা এই যে, লোকেদের তাতে উত্তেজনা দিয়ে ভোলানো যায়, তাদের বলা চলে যে যুদ্ধের জন্য দায়ী হল প্রতিবেশীরা, নিরীহ আমরা শুধু বাঁচবার জন্য খানিকটা জায়গা চাই মাত্র। অন্যদের চেপে রাখবার স্বপক্ষে তখন ফাশিস্ট্‌ যুক্তি শোনা যায় যে আমবা হলাম সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, রাজার জাত। জার্মানেরা নাকি একমাত্র খাঁটি আর্য, ইটালিয়ানেরা হল মহান রোমের বংশধর, আর জাপানীরা শোনে যে তারা, অন্তত তাদের মিকাডো, সাক্ষাৎ দেবতার সন্তান। ফাশিস্ট্‌ প্রচারের কাজে অভাগা অন্য জাতদের প্রতি কিছু করুণার কথাও থাকে। পৃথিবীটা নাকি কয়েকটা স্বাভাবিক ভাগে বিভক্ত—এ একেবারে

বৈজ্ঞানিক বুলি, এর উপর আর তর্ক চলে না। এক এক ভাগে এক একটি প্রভুর জাত থাকবে—ভগবানের বিধান ছাড়া আর কি। অন্যদের কর্তব্য কর্তাদের সব জোগানো, আর কিছু কিছু প্রসাদ পাওয়া। আপাতত ইয়োরোপ পড়েছে জার্মানির ভাগে, ইটালির বোধহয় ভূমধ্যসাগর আর আশেপাশের ডাঙাগুলি দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া নিশ্চিত জাপানের এলাকা হতে বাধ্য। এই ধরনের কথাবার্তায় ফাশিস্ত্ দেশগুলোর অসন্তোষ কিছুদিন কিছু পরিমাণে চাপা পড়ে বই কি। অবশ্য তার ফল ভুগতে হয় প্রতিবেশীদের।

ফাশিজ্‌মের এই সব মুখোস জোর করে ছিঁড়ে ফেলা ছাড়া আমাদের আর উপায় কি? জনযুদ্ধ হচ্ছে সেই ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টা। যুদ্ধে পরাজয় হওয়া মাত্র ফাশিস্ত্ দেশে জনসাধারণের অসন্তোষ ছাই চাপা আগুনের বদলে দাবানলের আকার নেবে। লোক-ক্ষোভের বিস্ফোরণের উপর পড়ে ফাশিস্ত্ ইমারত তখন ধূলিসাৎ হবে, সমস্ত পৃথিবীর চেহারা যাবে বদলে।

॥ পুস্তিকা জুলাই ১৯৪২ ॥

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

দেশে রাষ্ট্রিক চেতনার যে-নূতন ধারা আজ প্রবাহিত হয়েছে, তার চারটি মূল আদর্শের দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

এর মধ্যে প্রথমটি ফাশিস্ট্-বিরোধী মনোভাব। জগৎজোড়া মহাসংগ্রামে আমরা ফাশিজ্‌মের সম্পূর্ণ পরাজয়, তার সমূল উচ্ছেদের কামনা করি। যুদ্ধের পরে পুনর্গঠিত পৃথিবীতে আমরা চাই ফাশিজ্‌মের ছায়ামাত্র থাকবে না, সমাজ-জীবনের মধ্য থেকে গত কুড়ি বৎসরের বিভীষিকা পরিপূর্ণভাবে লোপ পাবে। এদেশে অনেকে মনে করে ফাশিজ্‌ম্ একটা কথার কথা, ফাশিস্ট-বিরোধী মনোভাব একটা চলতি ফ্যাশন মাত্র, একটা নেগেটিভ বুলি, ফাশিজ্‌মের প্রতিরোধের সঙ্গে আমাদের নাকি কোনও সাক্ষাত সম্বন্ধ নেই। এই বিশ্বাস সারা দুনিয়ার ঘটনাস্রোত থেকে নিজেকে তফাত রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। আর্থিক বাঁধনে আজ সমস্ত জগত এক হয়ে পড়েছে, সেকালের মতন পৃথিবীকে আজ আর টুকরো টুকরো ভাবে দেখা চলে না। সবলে প্রতিহত না হলে ফাশিজ্‌ম্ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য, তার বিরুদ্ধে জগৎজোড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে মানুষের স্বাভাবিক প্রগতির পথে প্রবল অন্তরায় মাথা তুলে দাঁড়াবে। ফাশিজ্‌মের সাধারণ রূপটি চোখে পড়া কি এতই শক্ত? এর প্রধান লক্ষ্য হল জনসাধারণকে সবলে দাবিয়ে অথবা ভুলিয়ে রেখে সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্তনের পথ রুদ্ধ করা। ফাশিস্ট্‌রা তাই সমস্ত গণপ্রতিষ্ঠান ও স্বাধীন চিন্তাকে উচ্ছেদ করেছে মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থের খাতিরে। ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে-আদর্শ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, জনমতের কণ্ঠরোধ করবার জন্য ফাশিস্ট্‌রা চেয়েছে সেই আদর্শের ধ্বংসসাধন। দেশের সাধারণ লোককে ভুলিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে, সকল অসন্তোষ ঢেকে রাখবার জন্য, ফাশিস্ট্‌রা চায় দিগ্বিজয়,

প্রতিবেশী দুর্বল রাজ্য লুণ্ঠন করে সাম্রাজ্যবিস্তার ভিন্ন ফাশিস্ট্ প্রভুত্ব স্বদেশেও টিকে থাকতে পারে না। ফাশিস্ট্ মতবাদ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে দেশের মধ্যে নেতাদের অসীম প্রাধান্য, নিকৃষ্ট জাতিদের শ্রেষ্ঠ জাতির সেবা করবার ভগবদ্দত্ত বিধান। আমাদের রাষ্ট্রিক আদর্শে তাই ফাশিজ্‌মের বিরুদ্ধাচরণকে বাদ দেওয়া একেবারে অসম্ভব। ফাশিস্ট্ আন্দোলন ও ঝোঁকের সঙ্গে কোনও রকম সহযোগ বা সংযোগ, ফাশিস্ট্ মতামতের সঙ্গে আপোসের চেষ্টা, এমন কি সমস্যা এড়িয়ে যাবার কৌশল পর্যন্ত, আমাদের রাষ্ট্রচিন্তায় স্থান পেতে পারে না।

ফাশিস্ট্ শক্তি পশ্চিমে জার্মানি ও পূর্বে জাপানকে অবলম্বন করে পৃথিবী-বিজয়ের অভিযানে উদ্যত হয়েছিল। দেশে দেশে জাগ্রত জনমত আজ তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রাচীর তুলেছে, সেই প্রচেষ্টা মূল প্রেরণা পেয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়ানের অতুলনীয় সংগ্রামের ভিতর। যুদ্ধে ফাশিস্ট্ শক্তি জয়লাভ করলে সারা জগতে এই মতবাদ ছড়িয়ে পড়বে, এমন কি জার্মান ও জাপানী শাসকদের সম্পূর্ণ পরাজয় না এনে যদি যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় তাহলেও ফাশিজ্‌মের বিষ দেশে দেশে থেকে যাবে। আত্মরক্ষা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত উভয় স্বার্থের খাতিরেই এই যুদ্ধে আমাদের নিরপেক্ষ থাকা চলে না। আদর্শের সংগ্রামে নিষ্ক্রিয় থাকা দুর্বল মনের পরিচয়। পৃথিবীর সকল দেশের প্রগতিশীল জনমত থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখা কূপমণ্ডুকতার চিহ্ন। জার্মানি ও জাপানের সামরিক পরাজয় হলেই যে স্বর্গরাজ্য আসবে একথা কেউ বলে না; মানুষের মঙ্গলসাধন এত সরল, এত সহজ নয়। কিন্তু আজকের দিনে অগ্রগতির পথে প্রধান কাঁটাটুকুকে প্রথমে সবলে সমূল উৎপাটন করতেই হবে। ফাশিস্ট্-বিরোধী আদর্শের ন্যায়সঙ্গত পরিণতি হল এই যুদ্ধকে আমাদের পক্ষেও জনযুদ্ধের পর্যায়ে নিয়ে আসার প্রয়াস।

নূতন রাষ্ট্রচিন্তায় দ্বিতীয় যে-আদর্শ চোখে পড়ে তার সাধারণ নাম সমাজবাদ বা সোশালিজ্‌ম্। আধুনিক ইতিহাসের স্বাভাবিক গতি যে এইদিকে, সে-কথা বোধহয় অস্বীকার করা চলে না। ইংরাজ বিপ্লবের উদার-

নীতি ফরাসী বিপ্লবের পর গণতন্ত্রে প্রসার লাভ করেছিল, কালক্রমে সেই ডিমক্র্যাসি আজ সমাজবাদে সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছে। এদেশে অনেকে মনে করে যে সমাজবাদ একটা বিদেশী অস্বাভাবিক কল্পনা, আমাদের মধ্যে একটা সাময়িক কলরব মাত্র। কিন্তু জাতীয়তাবাদও তো একদিন আমাদের কাছে বিদেশী বস্তু ছিল, তাকে নিজস্ব ব্যাপার করে নেওয়া এদেশে কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য হয় নি। নূতন সমাজ গড়বার আদর্শ মঙ্গলজনক মনে হলে তাকে বিদেশী বা বিধর্মী আখ্যা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। গত পঁচিশ বছরে চোখের সামনে রুশ দেশে যে-বিশাল পরিবর্তন এসেছে, সেখানকার সমাজে যে-আশ্চর্য পুনর্গঠন সম্ভব হয়েছে, মহাযুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় যে-সমাজের বিপুল সার্থকতা দেখা গেল, আমাদের রাষ্ট্রচিন্তা থেকে কোন যুক্তিতে তাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে? সমাজবাদের গোড়ার কথা হল দেশে জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন অধিকার প্রতিষ্ঠা, তাদের সম্পূর্ণ আথিক মঙ্গলের সাধনা। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চিন্তাশীল লোকমাত্রই এ আদর্শে আকৃষ্ট হবেন, তাঁদের পক্ষে এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকা সাজে না।

তৃতীয় আদর্শ, ভারতবর্ষের ভবিষ্যত স্বাধীনতা, সমস্ত ভারতীয় জনগণের স্বাধীনভাবে নিজেদের সংগঠিত করবার অধিকার। এই অধিকারের ব্যাপারে দেশে মতদ্বৈধ নেই; এমন কি বিদেশী শাসকেরা পর্যন্ত বার বার আদর্শ হিসাবে আমাদের অধিকার স্বীকার করেছে। ভারতের স্বাধীনতা কবে, কোন উপায়ে আসতে পাবে, তার রূপ কি ভাবে প্রকাশ পাবে, সে-আলোচনা রাষ্ট্রনীতির কথা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রচিন্তায় স্বাধীনতার আদর্শেরও একটা বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে, এই কথাটুকু শুধু মনে রাখা দরকার।

আজকের দিনের রাষ্ট্রচিন্তায় চতুর্থ যে-আদর্শ দেখা দিয়েছে, বিজ্ঞানের ভাষায় তার সাধারণ নাম আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। কোনও অঞ্চলে যদি একটা বিশিষ্ট জাতি গড়ে ওঠে; তাদের মধ্যে যদি এমন চেতনা বিকাশ পায় যে তারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকসমষ্টি থেকে জাতি হিসাবে স্বতন্ত্র; তাদের

নিজেদের ভিতর যদি ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার ধরনে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ঐক্য দেখা যায়;—তবে তাদের নিজেদের ইচ্ছামত স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়বার অধিকার স্বীকার করা এই আদর্শের মূল কথা। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে দেশে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে বলে এ সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার করে নেবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি মূলনীতি হিসাবে বহুদিন থেকে সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়েছে। কথা উঠলেই তাই সকলেই বলে থাকে যে, এ নীতি তো সর্বসম্মত। কিন্তু জাতিবিশেষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তার পরিধি ও সীমানির্দেশ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠলে অনেক সময় দেখা যায় মতভেদ। ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে গোড়া থেকে প্রায় আজ পর্যন্ত এই বিশ্বাস মজ্জাগত ছিল যে, নানা অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ভারতের সকল লোক একই জাতি বা নেশনের অন্তর্গত। সে-হিসাবে সমস্ত ভারতবর্ষ একরাষ্ট্রে সংগঠিত হলেই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে। এতদিন পর্যন্ত সকল দেশপ্রেমিকের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, ভারতের নানা অংশের লোকদের মধ্যে পার্থক্য ধীরে ধীরে লোপ পাবে, ভারতবর্ষ হবে ইংল্যাণ্ড্ বা ফ্রান্সের মতন একটি রাষ্ট্র, তার রাষ্ট্রভাষা হবে এক, তার রাষ্ট্রিক সত্তা থাকবে অখণ্ড। বিভিন্ন খণ্ডরাজ্য ও প্রদেশকে একত্র করে ইটালি ও জার্মানির ঐক্যসাধন আমাদের মুগ্ধ করেছিল, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে নানা দেশাগত লোকের মিলনে মহাজাতির উদ্ভব হয়েছিল আমাদের আদর্শস্থল। বহুদিনের প্রচলিত এই বিশ্বাস কিন্তু আজ আর সকলকে তৃপ্তি দিতে পারছে না। ধীরভাবে ভেবে দেখতে গেলে স্বীকার করতেই হবে যে, এক-জাতীয়ত্বের আদর্শ আজ আর দেশভক্ত সকল লোককে সমানভাবে টানছে না। আত্মনিয়ন্ত্রণের সাধারণ অধিকার নিয়ে তাই তর্ক হয় না, মতভেদ আসে ভারতে এক-জাতীয়ত্বের প্রশ্ন সম্বন্ধে।

নিরাসক্ত দৃষ্টিতে আলোচনা করলে কিন্তু ভারতবর্ষে মাত্র একটি নেশনের অস্তিত্ব, এক অখণ্ড মহাজাতি গঠনের আদর্শ সম্বন্ধে মনে সন্দেহ আসে নাকি?

এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে অনেক দিকে সাদৃশ্য আছে নিশ্চয়, যে-কোনও লোকসমষ্টি প্রতিবেশীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে বাধ্য। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য কি বাস্তব সত্য নয়? বিশাল ভারতের নানা অংশে যে নানা জাতীয় লোক বাস করে তাদের মধ্যে যে-তফাত চোখে পড়ে, ইয়োরোপ অথবা দক্ষিণ আমেরিকার স্বতন্ত্র জাতিগুলির মধ্যে তফাত কি তার চাইতে বেশি? আধুনিক ইতিহাসে আমরা যাকে ন্যাশনালিটি নাম দিয়েছি, তার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি কি আমাদের দেশের নানা জাতির মধ্যে সুস্পষ্ট নয়? বাঙালী ও উড়িয়া, অন্ধ্র ও তামিল, মারাঠী ও গুজরাটী, সিন্ধী ও পাঠান, পাঞ্জাবী ও বিহারী—এদের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ কি এতই সামান্য যে তাদের স্বাতন্ত্রের দাবি উঠলে তাকে অস্বাভাবিক বলে অগ্রাহ্য করতে হবে? ভারতের প্রত্যেকটি জাতির নির্দিষ্ট বাসভূমি আছে, আবহমান কাল থেকে প্রত্যেকে নিজস্ব ভূখণ্ডে পুরুষানুক্রমে থেকে এসেছে। তাদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট ভাষা রয়েছে, একেব পক্ষে অন্যের কথা বোঝা পর্যন্ত দুরূহ ব্যাপাব। বিভিন্ন ভাষাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে স্বতন্ত্র সাহিত্য ও স্থানীয় ঐতিহ্য। প্রত্যেক অঞ্চলে জীবনযাত্রার ধরনের মধ্যে অনেকখানি তফাত অস্বীকার করা যায় না। এদেশেব সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের মনের গড়নও যে ঠিক এক ছাঁচের নয় এ কথাও বলা চলে।

আমাদের রাষ্ট্রিক চেতনায় অবশ্য এতদিন পার্থক্যের চাইতে সাদৃশ্যের উপরই সমস্ত জোরটুকু দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রিক চেতনা একটা স্থির, অবিচল, সনাতন পদার্থ নয়। তার ভিতরেও ইতিহাসের সাধারণ নিয়ম, পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যেতে পারে। এ কথা সুবিদিত সত্য যে, রাষ্ট্রিক জাতি বা নেশনের ধারণা, ন্যাশনালিটির ভিত্তিতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়বার আকাঙ্ক্ষা চিরকাল ছিল না, সম্ভবত চিরদিন থাকবেও না। মানুষের অন্যান্য ধারণার মতন জাতীয় চেতনাও সামাজিক অবস্থা ও আথিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে, তার মধ্যেও ক্রমবিকাশ চোখে পড়া স্বাভাবিক। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তার ধারণা দিকে

দিকে মূর্তিগ্রহণ করেছে, অন্যজাতির প্রভুত্ব ও অত্যাচারের ফলে অথবা তারই আশঙ্কায় জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষে একজাতীয়ত্বের আদর্শ যে বহুজাতির আত্মচেতনায় রূপান্তরিত হবে না, একথা কি কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে? রাষ্ট্রিক আত্মপ্রত্যয় যত এদেশের সাধারণ লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে, ততই বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষে নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠবার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। রাশিয়াতে এর অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে সকলেই জানে। তার আলোচনা প্রসঙ্গে কুড়ি বৎসর আগে স্টালিন লিখেছিলেন যে, ভারতবর্ষেও একদিন বহু জাতির রাষ্ট্রিক চেতনা স্বতন্ত্র মূর্তিতে আবির্ভাব হতে পারে।

ভারতে বহুজাতীয়ত্বের আদর্শ গড়ে ওঠার অনুকূল বাস্তব উপাদানের অস্তিত্বের কথা আগেই বলেছি। এখন যদি আমাদের রাষ্ট্রিক চেতনা এইদিকে প্রবাহিত হয়, তাহলে এই প্রত্যেকটি জাতির সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি? অনেকে মনে করে যে, একজাতীয়ত্বের আদর্শ ছিল প্রগতির কথা, আর বহুজাতীয়ত্বের ধারণা হবে প্রতিক্রিয়ার বাহন। আমার মনে হয়, এই বিশ্বাসের মূলে আছে চারটি অমূলক ভয়।

প্রথম ভয় এই যে, ভারতবর্ষ এক নেশন বলে গণ্য না হলে স্বাধীনতা আসবে না। কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের অর্থই হল স্বাধীন রাষ্ট্র গড়বার দাবি, সুতরাং ভারতবর্ষ এক নেশন হলেও তার স্বাধীন হবার যতটুকু অধিকার আছে, এদেশে বহু জাতি থাকলেও তাদের প্রত্যেকটির সেই একই দাবি থেকে যায়, অধিকার লোপ পায় না।

দ্বিতীয় ভয় এই যে. স্বাধীন ভারতবর্ষ খণ্ড খণ্ড হয়ে আর্থিক ও সামরিক শক্তিতে দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু বিভিন্ন জাতি বা ন্যাশনালিটিগুলি ইচ্ছা করলেই এক ফেডারেশন বা কন্‌ফেডারেশনের মধ্যে সমবেত হতে পারে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের এই প্রয়োগ তো কেউ হরণ করছে না। ভারতবর্ষে সংহত রাষ্ট্র বা ফেডারেশন গড়া নিশ্চয় বাঞ্ছনীয়, কারণ তাতে বিশেষ সুবিধা আছে। কিন্তু বিভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্য মেনে

নিয়েও ভারতব্যাপী ঐক্য গড়া যেতে পারে, শুধু সে-ঐক্যের মূলে থাকবে একের উপর অন্যের জোর প্রয়োগ নয়, প্রত্যেকটি জাতির স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ হবে সে-ঐক্যের ভিত্তি। ভারতের প্রত্যেক জাতির মধ্যে যোগসূত্র যথেষ্ট আছে, তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের স্বার্থের খাতিরে মিলিত হবে না কেন জানি না। আর কোনও জাতি যদি নিতান্তই পৃথক থাকতে চায়, তবে তেমন ক্ষেত্রে জোর প্রয়োগে কোন্ সুফল আসবে? সকল ফেডারেশনের গোড়ায় থাকে কতকগুলি সাধারণ স্বার্থ; আমাদের দেশে সে-স্বার্থ রয়েছে। কিন্তু ফেডারেশন গড়ে ওঠা উচিত বিভিন্ন অংশের স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ থেকে, জোর জবরদস্তি এখানে ঠিক চলে না। আর ফেডারেশন থাকলেই যে সেদেশে একটি মাত্র জাতি বসবাস করবে, একথা নিরর্থক। বরং দেশে একজাতীয়ত্ব নিঃসন্দেহ হলে সেখানে একত্রীভূত ইউনিটারি রাষ্ট্রই স্বাভাবিক।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পূর্ণ মেনে নেবার পথে এদেশে তৃতীয় ভয় এই যে, ভারতীয় ফেডারেশন স্থাপিত হলেও দুর্বল হয়ে পড়বে, কারণ তখন বিভিন্ন জাতির অধিকার থাকবে ইচ্ছামত ফেডারেশনের বাইরে চলে যাবার। এই প্রসঙ্গে আমেরিকায় আশি বৎসর আগেকার গৃহযুদ্ধের উল্লেখ করা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে তখন ঐক্যের খাতিরে বিভিন্ন অংশগুলির ফেডারেশন ত্যাগ করার অধিকার অস্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, যুক্তরাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যগুলি আসলে সম্পূর্ণ কৃত্রিম রাজ্য, তাদের উদ্ভব শুধু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সুবিধার জন্য, নিউইয়র্ক বা ম্যাসাচুসেট্‌সের সঙ্গে ভার্জিনিয়া বা ক্যারোলিনার কোনও জাতিগত পার্থক্য নেই। এদেশের তুলনা আমরা আমেরিকায় পাই না, পাই নানা জাতির বাসস্থল রুশ দেশের মধ্যে। সেখানে রুশ বিপ্লবের সময় সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পূর্ণ স্বীকৃত হয়েছিল, কোথাও একেবারে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রও স্থাপিত হয়, তারপরও সোভিয়েট ফেডারেশন গড়া সম্ভব হয়েছে। সেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও লৌহদৃঢ় ঐক্য গড়ে উঠেছে।

চতুর্থ ভয় এই যে, দেশের কোনও কোনও অংশ বিদেশীদের মুখাপেক্ষী

হয়ে থাকতে পারে, ভারতে আয়ার্ল্যাণ্ডের মতন আলস্টার-সমস্যা দেখা দেবে। কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পূর্ণ স্বীকৃত হলেই বরং বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেষ ও সন্দেহের অবসান আসতে পারে। তখন পরস্পরের মধ্যে সমস্বার্থের বন্ধন আরও জোরালো হবার সুযোগ পাবে, অথচ ঐক্যের পথে প্রধান বাধা, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, লুপ্ত হয়ে আসাই তখন স্বাভাবিক। ঐক্যের নামে অখণ্ড ভারতের যে-দাবি, বাঞ্ছিত ঐক্যের পথে সেই দাবিই প্রধান অন্তরায় হয়ে ওঠা বিচিত্র নয়।

বস্তুত ভেবে দেখতে গেলে স্বীকার করতে হয় যে, অখণ্ড ভারতের সমর্থক যুক্তির মধ্যে অনেক ফাঁক আছে। ভারতের ভৌগোলিক ঐক্যের কথা সর্বদাই শোনা যায়, কিন্তু সমগ্র ইয়োরোপ অথবা ভূমধ্যসাগর ও সাহারা মরুভূমির মধ্যস্থিত উত্তর আফ্রিকার সুস্পষ্ট ভৌগোলিক ঐক্য তো একজাতীয়ত্বের আধার হিসাবে গণ্য হয় না। দক্ষিণ ভারত ভূগোলের হিসাবে অনেকাংশে উত্তর থেকে স্বতন্ত্র, তবুও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় নামক দুইজাতির কথা আমরা কখনও ভাবি না। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র মাত্রেই সাধ্যমত প্রাকৃতিক সীমানার নির্দেশ খোঁজে, কিন্তু প্রাকৃতিক সীমানা সুস্পষ্ট থাকলেই কোনও দেশে মাত্র একটি জাতি গড়ে উঠবে এমন কথা স্বতঃসিদ্ধ নয়। ভারতের অতীত ইতিহাস থেকেও একজাতীয়ত্ব প্রমাণিত হয় না। আমরা যাকে ভারতবর্ষ বলি, আমাদের প্রাচীন কোনও সাম্রাজ্য কখনও ঠিক তার সঙ্গে এক আকার ধারণ করে নি। তাছাড়া সেকালের সামন্ততন্ত্রী সাম্রাজ্যের মধ্যে কোনও দিন এ যুগের নেশনের আত্মচেতনা প্রকাশ সম্ভব ছিল না, তখনকার রাষ্ট্রের প্রকৃতিই ছিল স্বতন্ত্র। ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য নিশ্চয়ই অনেকখানি বাস্তব, কিন্তু যেহেতু সেকালের সকল সংস্কৃতিরই প্রাণ ছিল ধর্ম, সেইজন্য হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি কখনই ঠিক সম্পূর্ণ মিলিত হতে পারে নি, একটা সার্বভৌম ভারতীয় সংস্কৃতির অস্তিত্ব একেবারে নিশ্চিত সত্য নয়। ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে ইয়োরোপের সংস্কৃতির তুলনা চলে, সেখানে খৃস্টান সভ্যতা ধনতন্ত্রের আমলে ভিন্ন ভিন্ন নেশনের অভিব্যক্তিকে চেপে রাখতে পারে নি। ভারতবর্ষের একটি

আর্থিক ঐক্যও নিশ্চয় আছে, কিন্তু সেটা হল স্বার্থ ও সুবিধার কথা, তা দিয়ে একজাতীয়ত্ব প্রমাণ হয় না। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নেবার পরও যে ভারতীয় জাতিগুলি স্বেচ্ছায় ফেডারেশনে সংযুক্ত হতে পারে সমস্বার্থের খাতিরে, আমাদের দেশের আর্থিক ঐক্য শুধু তারই সূচনা করে, তার বেশি কিছু নয়।

ভারতে বহু জাতির জাগরণ ও তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির কথা আমি বারবার বলেছি, কিন্তু অনেকে বলবে যে এদেশে আছে মাত্র দুইটি জাতি, তাদের পার্থক্য হল ধর্মে এবং ধর্মগত সংস্কৃতিতে। ঠিক আজকের দিনের সংঘর্ষে একথা সত্য মনে হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিক থেকে ন্যাশনালিটির যে-বৈশিষ্ট্যগুলির নির্দেশ করা হয়, ধর্মবিশ্বাস তার অপরিহার্য অঙ্গ নয়। একই ধর্ম দেশে প্রচলিত থাকলে জাতির ঐক্যবোধ দৃঢ়তর হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু ন্যাশনালিটির সংজ্ঞা ও ধর্মমত যে সব সময় অভিন্ন নয় তার প্রচুর প্রমাণ উদ্ধৃত করা সম্ভব। ধর্মের পার্থক্য জার্মানিতে একজাতীয়ত্বকে বাধা দেয় নি, আবার একধর্মের বন্ধন ফ্রান্স্, স্পেন ও ইটালিকে একত্র করতে পারে নি। উত্তর আফ্রিকা কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমান জাতিগুলি কখনও একজাতীয়ত্বের আদর্শের মধ্যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে রাজি হবে কিনা সন্দেহ। রুশ দেশে একধর্মে লালিত উজবেক, তুর্ক্‌মান, তাজিক, খিরগিজ, কাজাক প্রভৃতি মুসলমান জাতি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রেই সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। সুতরাং একথা বলা চলে যে, ভারতবর্ষে এক অথবা দুই নয়, বহু জাতির বসবাস আছে, এর মধ্যে অনেকগুলি হিন্দুপ্রধান, কিন্তু মুসলমানপ্রধান জাতিও সংখ্যায় একাধিক। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আমাদের উদভ্রান্ত করে, কিন্তু ভারতের সকল জাতির সমানভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নিলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান অনেক সহজ হয়ে আসবে, এ বিশ্বাস দেশে নূতন রাষ্ট্রচিন্তার ধারায় ক্রমশই প্রবল হচ্ছে সে-সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

অখণ্ড ভারতের যুক্তির দুর্বলতা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু একটির বদলে দুইটি অখণ্ডজাতির আদর্শ স্থাপিত হলে প্রকৃতপক্ষে বেশি দূর অগ্রসর

হওয়া সম্ভব নয়, পুরানো সমস্যা আবার তখন নূতন রূপ নিতে বাধ্য হবে প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক ইচ্ছাকে রোধ করা শক্ত। ভারতবর্ষে একটির বদলে দুইটি ফেডারেশন স্থাপিত হওয়া অসম্ভব মনে করি না, কিন্তু উভয়ের মধ্যেই একাধিক বিশিষ্ট জাতির সমাবেশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যে-ফেডারেশনে প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার অস্বীকৃত হবে সেই ফেডারেশনই দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য। অখণ্ড ভারতের বিরুদ্ধে আজ যত যুক্তি প্রয়োগ করা যায়, তার সবগুলিই তখন প্রযোজ্য হবে সেই অখণ্ড ফেডারেশনের বিরুদ্ধে। ইতিহাসে প্রগতির হাত থেকে সহজে নিস্তার পাবার উপায় দেখি না।

অখণ্ড ভারতের যুক্তি যেমন অচল, খণ্ডিত ভারতের চিরন্তন অটল আদর্শও তেমনি দুর্বল। অর্থাৎ ভারতীয় জাতিগুলি তাদের স্ব-ইচ্ছায় যদি সংযুক্ত হতে চায়, তবে তাদের সে-দাবিও মানতে হবে। আসলে আমাদের এমন মূলনীতির আশ্রয় খোঁজা উচিত যে-নীতি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খায়, যে-নীতি বর্তমান সমস্যা সমাধান করে অথচ ভবিষ্যতকে অযথা শৃঙ্খলিত করবার চেষ্টায় উদ্যত হয় না। জাতির বর্তমান কর্তব্যনির্ধারণ, ভবিষ্যতে তার পথনির্দেশ, জাতির স্বাধীন ইচ্ছা এবং তার নিজস্ব বিচারবুদ্ধির উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের মূল কথা হল এই।

অনেকে মনে করে যে, ব্রিটিশ আমলে রাজ্যশাসনের সুবিধার জন্য যে-সব প্রদেশ গঠিত হয়েছে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকবে সেই সব নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের। কিন্তু জাতি ও প্রদেশ ঠিক এক জিনিস নয়। একটা বিশিষ্ট আত্মবোধকে আশ্রয় করে জাতি গড়ে ওঠে, তার বাসভূমির সীমানা প্রদেশের সীমান্তের সঙ্গে নাও মিলতে পারে। একই প্রদেশে একাধিক জাতির বিকাশ আশ্চর্য কিছু নয়, সেখানে প্রত্যেক জাতিরই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা প্রয়োজন। আর, একজাতির বাসভূমির অন্তঃস্থলে যদি কোন অঞ্চলে অন্য কোনও জাতির স্থানীয় প্রাধান্য প্রকাশ পায়, তবে সেই সব অঞ্চলের অটোনমি অথবা স্বায়ত্ত-শাসনের আলাদা ব্যবস্থার দাবি গ্রাহ্য করতে হবে।

রুশ দেশের অভ্যন্তরে এই রকম আত্মশাসিত ছোট ছোট অনেক অঞ্চলের কথা আমরা জানি।

বস্তুত জাতিবহুল রুশ দেশের সঙ্গে আমাদের স্বদেশের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। সেখানেও একদিন গ্রেট রাশিয়ান জাতির প্রভুত্বের খাতিরে রব উঠেছিল যে, রাশিয়া এক ও অখণ্ড। আমাদের একদল সমাজবাদীর মতন সেখানেও মেন্‌শেভিকেরা বলেছিল যে, জাতি-সমস্যার সমাধান হবে প্রত্যেক জাতির কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবিটুকু মেনে নিলেই। তখন বল্‌শেভিক পার্টি ঘোষণা করে যে, প্রত্যেক জাতিকে দিতে হবে আত্মনিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার। এই অধিকারের প্রতিষ্ঠা সেদেশে জাতিব সঙ্গে জাতির সদ্ভাব আনতে পেরেছে, অবনত জাতিদের আত্মবিকাশের পথ করেছে সুগম। তারই মধ্যে আবার জাতির সঙ্গে জাতির এমন ঐক্য গড়ে উঠল যার প্রতিরোধের প্রাচীব ফাশিজ্‌মের সকল দম্ভকে চূর্ণ করে দিয়েছে রুশ দেশে যেমন জাতি-সমস্যার এইভাবে সমাধান এসেছে, এদেশেও তেমন সমাধান সম্ভব মনে কবা অসঙ্গত নয়।

॥ পুস্তিকা : জুলাই ১০৪৪ ॥

ইয়োরোপে জনজাগরণ

সমসাময়িক ঘটনার আলোড়নের মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক স্বরূপটি সর্বদা আমাদের চোখে পড়ে না, ইয়োরোপে জনগণের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে আমরা তাই সজাগ নই। অথচ ভবিষ্যত ইতিহাস-লেখকের কাছে জনসাধারণের এই জাগরণ নিশ্চয়ই বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকবে। যুদ্ধের প্রথম দিকে যখন দেশের পর দেশ হিট্‌লারের পদানত হল, তখন বিজিত জাতিদের জার্মানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অসম্ভব মনে হত, নাৎসি সামরিক শক্তি অপরাজেয় বলেই লোকে মেনে নিয়েছিল। তারপর এল সোভিয়েট ইউনিয়ানের অতুলনীয় প্রতিরোধ, তখন ক্রমে ক্রমে সমস্ত অধিকৃত ইয়োরোপে মুক্তির যে-প্রবল আগ্রহ মাথা তুলতে লাগল ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া সহজ নয়।

অত্যাচারী দুর্ধর্ষ বিদেশী সৈন্যবলের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকের এই অভিযান সম্বন্ধে বহুদিন পর্যন্ত আমাদের বিশেষ কিছু জানা ছিল না। সাংবাদিক মহল ও যুদ্ধের সরকারী আলোচকেরা এই ব্যাপারে অস্পষ্ট ও অনেক সময় ভ্রান্ত মর্ত প্রচার করতেন। কিন্তু গত কয়েক মাসের মধ্যে ইয়োরোপের অনেক খবর ধীরে ধীরে এদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, তার ফলে আমরা সেদেশে একটা বিশাল পরিবর্তনের সন্ধান পাচ্ছি, তার একটা সমগ্র ছবি আমাদের মনে এখন রূপ নিচ্ছে। জনজাগরণের সম্পূর্ণ চিত্রটুকু ফুটিয়ে তুলবার কাজে তথ্যবহুল ও সর্বাঙ্গসুন্দর এই সাতখানি বই-এর দান অসামান্য।

হিট্‌লারি প্রভুত্ব ও শোষণের বিরুদ্ধে ইয়োরোপব্যাপী প্রতিরোধ-আন্দোলনের মধ্যে কয়েকটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, নাৎসিরা যে-নববিধান প্রবর্তন করেছিল তার মোহ সাধারণ লোককে ভুলিয়ে রাখতে পারে নি, পারলে অসংখ্য নবনারী এ ভাবে শান্তি, আরাম ও প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে উদ্যত হত না। আমাদের মধ্যে অনেকে ফাশিজ্‌মের নগ্ন রূপটুকু দেখেও দেখি না, শিক্ষিত সমাজে হিট্‌লারের স্তাবকেরও অভাব নেই। ফাশিজ্‌ম্‌ যে শুধু জার্মানির একটা ঘরোয়া ব্যবস্থা নয়, পার্শ্ববর্তী সকলকে পদদলিত না করে যে তার চলতে পারে না, এই সিদ্ধান্ত আমরা এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করি। নাৎসি শাসন সম্বন্ধে ভুল ধারণা বা উদাসীন ভাব ইয়োরোপের সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব হয় নি, পুস্তিকাগুলি তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

দ্বিতীয় কথা এই যে, ইয়োরোপে প্রতিরোধ ও বিপ্লবের সূচনা নিতান্তই জনসাধারণের নিজস্ব জিনিস, বাইরের প্ররোচনার ফল অথবা মুষ্টিমেয় লোকের দুঃসাহসিক অভিযান নয়। বিশাল সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে এর অস্তিত্ব বজায় রাখা এবং সাফল্য অর্জন করা অন্যথা সম্ভব হত না। নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সঙ্গে এর তুলনা ঐতিহাসিকের মনে আসতে পারে, কিন্তু দুয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। তখনকার দিনে নেপোলিয়ানের শাসনের খানিকটা অন্তত প্রগতিশীল রূপ ছিল, নানা দেশে প্রাচীন ফিউডাল ব্যবস্থার অবসান নেপোলিয়ান আনতে পেরেছিলেন, সেদিনকার বিদ্রোহের মধ্যে নানা দিকে তাই প্রতিবিপ্লবের ছায়াও দেখতে পাই। কিন্তু হিট্‌লারি নব-বিধানের নূতনত্ব কোনও সামাজিক প্রগতির মধ্যে নয়, তার মধ্যে আছে শুধু সংঘবদ্ধ জার্মান ফিনান্স্‌ক্যাপিটালের ইয়োরোপ-শোষণের আয়োজন। আজকের দিনের অভ্যুত্থানের আন্তরিক সাদৃশ্য পাওয়া যায় কয়েক বৎসর আগেকার পপুলার ফ্রণ্ট্‌ আন্দোলনের মধ্যে। তখন ফ্রান্স্‌ অথবা স্পেনে নূতন সম্ভাবনার যে-উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল, আদর্শবাদের সেই স্পন্দন আজ আবার ইয়োরোপের অন্তরে সাড়া তুলেছে। মাঝে কিছুদিন দেশে দেশে

ভেদ সৃষ্টির ফলে ও তোষণ-নীতির প্রভাবে উৎসাহ ম্লান হয়ে গিয়েছিল, হতাশ নিস্তেজতা লোককে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। হিট্‌লারি শাসনের আগুনে পুড়ে আজ ইয়োরোপের নবজন্ম দেখা দিয়েছে, আলোচ্য পুস্তিকাগুলি তারই বিশদ বিবরণ।

তৃতীয়ত, প্রতিরোধ-আন্দোলনের দুইটা দিকই সমানভাবে লক্ষ্য করা উচিত। অনেকে মনে করে যে ইয়োরোপে বিদ্রোহ শুধু সাম্যবাদীদের কারসাজি, রাশিয়ার স্বার্থসিদ্ধি হল তার উদ্দেশ্য। ফ্রান্স্, যুগোস্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড্ প্রভৃতির ভিতরে আজ যা ঘটেছে তার তথ্য অনুসন্ধান করলে কিন্তু বোঝা যায় যে নাৎসিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এত প্রবল ও ব্যাপক যে কোনও দলবিশেষের বিশিষ্ট অভিসন্ধি দিয়ে তার ব্যাখ্যা চলে না। অপরদিকে অন্যদের মত এই যে ইয়োরোপে আজকের অভিযান শুধু জাতীয় বিদ্রোহ মাত্র, এর মধ্যে আসল প্রগতি অথবা সমাজতন্ত্রের অভিমুখে অগ্রগমনের চিহ্নমাত্র নেই, আছে শুধু বিদেশী বিজেতার প্রতি বিদ্বেষ। অথচ আলোচনা করলে দেখা যায় যে জনসাধারণের এই অভ্যুত্থান শুধু প্রাক্‌সামরিক অবস্থায় ফিরে যাবার প্রয়াস নয়, তার মধ্যে চাষী-মজুরের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যত জীবন গড়বার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সাম্যবাদী নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের সাক্ষ্য পাওয়া যায়, প্রগতি ও বিপ্লবের ছোঁয়াচ প্রত্যেক জাতির আন্দোলনের মধ্যে ফুটে বেরিয়েছে। বিপরীত উভয় ভুলকে এড়াবার কাজে পুস্তিকাগুলি পাঠকদের সহায়ক হবে।

চতুর্থ কথা ইয়োরোপের ভবিষ্যত সম্বন্ধে। আমাদের দেশে বদ্ধমূল ধারণা এই যে, জার্মানির পরাজয় হলেও ইয়োরোপ শুধু আগের অবস্থায় ফিরে যেতে বাধ্য, ফাশিস্ট্ শাসনের বদলে থাকবে সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব। হয়তো বা পূর্ব ইয়োরোপ রাশিয়ার দখলে আসবে, কিন্তু সোভিয়েট শক্তিও নাকি সাম্রাজ্যবাদী হয়ে পড়েছে, কোনও কোনও সমাজবাদী পণ্ডিত এদেশে ফাঁকিটুকু ধরে ফেলেছেন বলে গর্ব অনুভব করেন। অন্যেরা ভাবে অ্যাংলো-আমেরিকান শাসকদের প্রবল প্রতাপ যুদ্ধের পর আর আটকায়

কে। কিন্তু জনসাধারণের জাগরণ ও সফল বিদ্রোহের মধ্যে অন্তত যে-বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে, যুদ্ধের মধ্যে প্রজাশক্তির যে-প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে, তাকে অস্বীকার করব কোন যুক্তিতে? ফাশিস্ট্-বিরোধী শিবিরের মধ্যে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব নিশ্চয় আছে, কিন্তু জনজাগরণের বিপ্লবী সম্ভাবনা ও সুযোগকে অস্বীকার করা বিশ্লেষণের পরিচয় নয়, সেই অস্বীকার প্রতিক্রিয়ারই বাহন। আজকের ইতিহাস যে-সম্ভাবনার দ্বার খুলেছে তাকে অগ্রাহ্য করলে প্রগতিকেই বাধা দেওয়া হবে। এ কথা মন-ভোলানো তর্ক নয়, চোখের সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দিকে দিকে নূতনের আবির্ভাব সম্ভব হচ্ছে। যুদ্ধের সূচনার আগেই ইয়োরোপে নানা দেশে উদারনীতি ও গণতন্ত্রের অবসান হয়েছিল, কিন্তু প্রতিরোধ-আন্দোলনে সর্বত্র দাবি উঠছে সাধারণ লোকের রাষ্ট্রিক ও আর্থিক অধিকারের। পলাতক গভর্ণমেণ্ট্গুলি পশ্চিমের মিত্রশক্তিদের ছায়ায় বসে দাবি করছিল যুদ্ধান্তে তাদের পূর্বতন অধিকারের পুনপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু নাৎসিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-অভিযানের অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রজাসাধারণ পাচ্ছে নিজেদের শক্তিতে আস্থা ও দাবি করবার সাহস। Legitimism আজ তাই দিকে দিকে ভেঙে পড়ছে। তাই পোল্রা লণ্ডনস্থিত সরকারকে অবহেলা করে মুক্তি-সমিতি গড়েছে, যুগোশ্লোভ রাজা পিটার শেষ পর্যন্ত মিহাইলোভিচ্কে ত্যাগ করে মার্শাল টিটো ও তাঁর জাতীয় পরিষদের শরণাপন্ন হচ্ছেন, গ্রীসের রাজা ও মন্ত্রিরা গেরিলাবাহিনীর নেতাদের সংযোগ খুঁজছেন, ইটালির রাজা সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন এবং বাদোলিও হলেন বিতাড়িত, ফরাসী স্বাধীনতা-সংসদ সকল উপেক্ষার বাধা কাটিয়ে স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। সম্ভাবনা ও সাফল্যের সম্পূর্ণ ছবি আমাদের দেশের পাঠকেরা পাবেন আলোচ্য পুস্তিকা কয়টির মধ্যে।

ফাশিস্ট্দের নিজ রাজ্যের মধ্যেও জনজাগরণ আরম্ভ হয়েছে। অর্থ-নীতিবিদ অধ্যাপক ভার্গা ফাশিজ্মের যে-প্রকৃত রূপ খুলে ধরেছেন, অনেক জার্মান নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তার যাথার্থ অনুভব করতে পারছে বলেই

জার্মানিতে শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযানের সূত্রপাত হচ্ছে। জার্মানিতে আবার বিপ্লব আসতে পারে, এলে পরেই জার্মান জাতিকে ধ্বংস করবার ভ্যান্‌সিটার্ট্‌ নীতির পরাজয় ঘটতে বাধ্য। কুসিনেনের লেখায় দেখতে পাই ফিন্‌ল্যাণ্ডের শাসকদের আসল রূপের প্রামাণিক বর্ণনা, তথাকথিত 'স্বাধীন' রাষ্ট্র ও 'গণতন্ত্রের' আসল অভিব্যক্তি, আর তার পিছনে সাধারণ লোকের সুপ্তি-ভঙ্গের নিদর্শন। সামরিক পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফাশিস্ট্‌ দেশগুলিতে প্রজাশক্তির প্রকৃত অভ্যুত্থান ঘটলে ইয়োরোপে নবযুগ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। সে-আশা যে একেবারেই অলীক নয় পুস্তিকাগুলির মধ্যে তার পরিচয় রয়েছে বলা চলে। ভবিষ্যত ঠিক কি ভাবে গড়ে উঠবে জোর করে অবশ্য সে-কথা বলা অনুচিত। কিন্তু ইয়োরোপ আজ মুক্তি ও প্রগতির পথে এখনও পর্যন্ত এগিয়ে চলেছে এই কথাটুকু আমাদের জানাব প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে।

॥ পরিচয় : শ্রাবণ ১৩৫১ (১৯৪৪) ॥

চীন দেশে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া

চীন সম্বন্ধে এদেশে কৌতূহল স্বভাবতই বহুবিস্তৃত, অথচ অজ্ঞতাও নিতান্ত সামান্য নয়। জাপ-বিরোধী সংগ্রামের সাত বৎসর পূর্ণ হল, প্রবল শত্রুদের বিরুদ্ধে এই আত্মরক্ষা সকল দেশের সাধারণ লোকের গৌরবের বস্তু। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশীদের ইতিহাস কোন রূপ নেবে জানবার জন্যও আমরা আগ্রহান্বিত। কিন্তু আগ্রহ মেটাবার উপায় প্রচুর রয়েছে বলা চলে না। চীনের সাম্প্রতিক ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। এদেশী পাঠকসমাজে আলোচ্য পাঁচখানি বই-এর এইজন্য যথেষ্ট সমাদর হওয়া উচিত। চীনের বিষয়ে উৎসাহী সকলেরই বই পাঁচখানি বিশেষ কাজে লাগবে।

সুপ্রাচীন সভ্যতার অন্তরালে চীনে যে এক নূতন জগৎ গড়ে উঠেছে, তার প্রেরণা আসছে পৃথিবীর নবীনতম সমাজের কাছ থেকে, মার্ক্সের মতবাদ যে লাল চীনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে. আট বৎসর আগে কেউ প্রায় সে-খবর রাখত না। দুঃসাহসিক কয়েকজন বিদেশী লেখকের কল্যাণে আমরা প্রথম চীনের পুনর্জন্মের এই বিস্ময়কর দিকটার পরিচয় পাই। এঁদের মধ্যে এড্‌গার স্নো, নিম ওয়েল্‌স্‌, এপ্‌স্টাইন, এ্যাগ্‌নেস স্মেড্‌লি, আনা লুইস স্ট্রং প্রভৃতির নাম স্মরণীয়। ভারতীয় কংগ্রেসের প্রেরিত যে মেডিকাল মিশন পাঁচ বৎসর চীনাবাসীর সেবা করে সম্প্রতি ফিরে এসেছেন, তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও এখন আমাদের জ্ঞান বর্ধন করেছে। চীনের সার্থক আত্মরক্ষায়

New China—by Nym Wales (Eagle Publishers)
Makers of New China—by S. S. Batliwala
Who threatens China's Unity ?—edited by M. Kumaramangalam
Critique of China's Destiny—by Chen Pai-ta
China's New Democracy—by Mao Tse-tung
(People's Publishing House)

সাম্যবাদীরা যে প্রাণস্বরূপ একথা অনেকেরই আর এখন অবিদিত নেই। শ্রীযুক্ত বাট্‌লিওয়ালার বইখানিতে লাল চীনের সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ থেকে সংগৃহীত হয়ে একসূত্রে গাঁথা হয়েছে। নূতন চীন গড়ে তোলার কাজে সাম্যবাদী আন্দোলনের দান যে অমূল্য, এ-সম্বন্ধে যাঁদের সন্দেহ আছে তাঁদের এ গ্রন্থখানি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

নিম ওয়েল্‌সের লেখা Inside Red China বইখানি হয়ত অনেকেরই পরিচিত। এর মধ্যে লাল চীনের উদ্ভব ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত প্রামাণ্য ইতিহাস রয়েছে। লেখিকার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও রচনার প্রসাদগুণ পুনর্মুদ্রিত বইখানিকে তথ্যবহুল ও সুখপাঠ্য করেছে। নূতন পাঠকের সুবিধার জন্য চীনের গত এক শতাব্দীর একটি ছোট বিবরণ সংযোগ করা হয়েছে—তার লেখক শ্রীযুক্ত অমল বসু। বই-এর শেষে আছে চীনদেশে সাম্যবাদী আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জী, ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে এর মূল্য অনেকখানি।

আলোচ্য বইগুলির মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করেছে মাও ৎসে-টুং-এর লেখা নবীন ডিমক্র্যাসির আলোচনা। মাও ৎসে-টুং শুধু লাল চীনের প্রধান স্রষ্টা ও পথপ্রদর্শক নন, পৃথিবীর সেরা মার্ক্সিস্ট্‌দের মধ্যে তিনি নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। নূতন গণতন্ত্রবাদ শুধু চীনে সীমাবদ্ধ স্থানীয় নীতি নয়, পশ্চাৎপদ ঔপনিবেশিক সকল জাতির ভবিষ্যত অবস্থা ও আধুনিক আদর্শের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। থিওরি সম্বন্ধে যাঁদের কিছুমাত্র আগ্রহ আছে, তাঁরা সকলেই বইখানি সযত্নে পড়লে উপকার পাবেন। পাঁচ-বৎসর আগের লেখা এই গ্রন্থ প্রগতিশীল সাহিত্যের একটা উল্লেখযোগ্য সম্পদ।

ধনতন্ত্র যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে আরম্ভ করে, তখনকার রাষ্ট্রিক পুনর্গঠনের ঐতিহাসিক নাম বুর্জোয়া-ডেমক্র্যাটিক বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লবকে তার প্রতিনিধি বলা চলে। ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা গেল সমাজবাদী আন্দোলনে। সেই আন্দোলন পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু

অনুন্নত দেশগুলিতে তখনও ফিউডাল সমাজ ও ফিউডাল রাষ্ট্রব্যবস্থার অবসান হয় নি। ইতিহাসের গতি অসমান হওয়াতে তাই সমাজবাদী আন্দোলনকে অনেক সময় সম্মুখীন হতে হয় আধা-ফিউডাল আধা-ধনতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। মার্ক্সের বিশ্লেষণ-পদ্ধতির সম্যক প্রয়োগ করে লেনিন দেখালেন যে অনুন্নত অঞ্চলে সোশালিজ্‌ম্ এক লাফে আসতে পারে না, সেখানে বিপ্লব আসবে দুই পর্যায়ে। প্রথমে বুর্জোয়া-ডেমোক্র্যাটিক বিপ্লব ফিউডাল ব্যবস্থাকে করবে নির্মূল, তারপর বাস্তব অবস্থা অনুসারে সেই বিপ্লব রূপান্তরিত হতে থাকবে প্রকৃত সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের মধ্যে। লেনিনের উক্তির যাথার্থ প্রমাণ করল রুশ বিপ্লবের ইতিহাস।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের সূচনার পর অন্য অনুন্নত দেশের অবস্থার মধ্যে আর একটি বিশেষত্ব দেখা গেল। এর পর অন্যত্র বুর্জোয়া-ডেমক্র্যাটিক বিপ্লবের উপক্রম হলেও সে-বিপ্লব আর পুরানো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। ফরাসী বিপ্লবের রীতিনীতি আর তার সীমা নির্ধারণ করতে পারবে না, নূতনতর রুশ বিপ্লব তাকে সবিশেষ প্রভাবান্বিত করতে বাধ্য। আজকের দিনে বুর্জোয়া-ডেমক্র্যাটিক বিপ্লব তাই মূলত বুর্জোয়াধর্মী হলেও তার একটা নূতন ভঙ্গী থাকবেই, একটা নবীন স্বকীয়তা তাকে মূর্তি দেবে, কারণ ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্তী জগতে অনেক পরিবর্তন এসে গেছে। এক কথায়, এখন আর রুশ বিপ্লবের ছোঁয়াচ এড়িয়ে বুর্জোয়া-ডেমক্র্যাটিক বিপ্লব সফল করবার সম্ভাবনা নেই। অনুন্নত দেশে আজকের দিনের আসন্ন প্রাথমিক বিপ্লবকে তাই মাও 'নিউ ডিমক্র্যাসি' আখ্যা দিয়েছেন। এর আদর্শ পূর্ণ সমাজবাদ নয়, তার বাস্তব ভিত্তি এখনও সম্পূর্ণ গড়ে ওঠে নি, যদিও নিউ ডিমক্র্যাসির স্বাভাবিক পরিণতি তারই মধ্যে। অথচ গণতন্ত্রের এই নবীন রূপ গত যুগের বুর্জোয়া বিপ্লব থেকেও অনেকখানি স্বতন্ত্র। এর মধ্যে দেখতে পাই বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্ব আর থাকছে না, শ্রমিক শ্রেণীর ত নেতৃত্ব চলে আসছে; বিপ্লবের পর কার্যত আর আগের মতন বিত্তশালী বুর্জোয়াদের একাধিপত্য থাকবে না, অর্থাৎ সেই অধিনায়কত্ব এখন

আসবে শ্রমিক, মধ্যবিত্ত; চাষী ইত্যাদি সকল বিপ্লবী শ্রেণীর হাতে।

উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যতন্ত্রের আশ্রিত দেশে মুক্তি আন্দোলনের এই নূতন বিশেষত্বের দিকে লেনিন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ১৯১৮ সালে। স্টালিনের ১৯১৮ ও ১৯২৫-এর লেখায় এর ব্যাখ্যা আছে। মাও এঁদের অনুসরণ করে নূতন গণতন্ত্রের রূপ নির্দেশ করেছেন। অনুন্নত দেশের বুর্জোয়াদের মধ্যে এখনও একটা বিপ্লবের ঝোঁক আছে; বিদেশী মূলধনের কর্তৃত্ব, সাম্রাজ্য-তন্ত্রের শোষণ তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিবাদ জাগায়। বর্তমান জগতে আসল বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর কর্তব্য এই ঝোঁকের সহায় হওয়া, তার সমর্থন করা। অথচ এই সব অঞ্চলে বুর্জোয়া মহলে দুর্বলতারও অন্ত নেই, সেই দুর্বলতা এদের টানে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোসের দিকে। যে-সাম্রাজ্যতন্ত্র ও প্রাচীন বিধিব্যবস্থা সাধারণ লোকের যুগ্ম শত্রু, বুর্জোয়া শ্রেণীর সাধ্য ও সাহস নেই তার প্রকৃত উচ্ছেদ সাধন করবার। এই আপোস ও পরাজয়পন্থী মনোভাবকে আটকে রাখবার দায়িত্বও তাই এসে পড়ে শ্রমিক শ্রেণীর উপর। আজকের দিনের বুর্জোয়া শ্রেণী দোটানার মধ্যে অবস্থান করছে, তার দুমুখো প্রবৃত্তি এত সুস্পষ্ট যে তার পক্ষে আর আগের মতন বিপ্লবের সফল নেতৃত্ব করা সম্ভব নয়। আসন্ন বুর্জোয়া-ডেমক্র্যাটিক বিপ্লব আর বিশুদ্ধ বুর্জোয়াধর্মী হতে পারে না, তাকে নূতন রূপ নিতে হচ্ছে। 'নিউ ডিমক্র্যাসি' সেই রূপের সংজ্ঞা, ইউনাইটেড ফ্রন্টের সম্মিলিত অভিযান তারই পূর্বাভাস।

বিপ্লবের পথ থেকে চীনে বুর্জোয়াদের পশ্চাদ্গমনের প্রমাণ পাই কুয়োমিনটাং-এর মধ্যে অনেকের দক্ষিণপন্থী মনোভাবে, ওয়াং চিং-ওয়াই-এর জাপানীদের সঙ্গে সহযোগ তারই প্রকাশ্য প্রমাণ। এই মনোভাব ১৯২৯ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত সাম্যবাদী-দলনের প্রচেষ্টার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। এমন কি আজকের দিনেও মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের অন্তরঙ্গ পার্শ্বচরদের মধ্যে এই ঝোঁকের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। চীন থেকে যে সরকারী খবর আসে তার মধ্যে ভিতরের সব কথা জানা যায় না। প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের সন্ধান দিচ্ছে আমাদের আলোচ্য বইগুলি।

চীনের প্রগতিশীল মন মূর্তি পেয়েছে নিউ ডিমক্র্যাসির আদর্শের মধ্যে। নিউ ডিমক্র্যাসির রাষ্ট্রিক আদর্শ এখনই সমাজতন্ত্র গড়বার চেষ্টা নয়, তার সময় পরে আসবে। এই আদর্শের এখনকার লক্ষ্য হল পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রেপাব্লিক স্থাপন, তার নেতৃত্ব করবে বিপ্লবী সকল দলের সম্মিলিত শক্তি। বুর্জোয়া কুয়োমিন্টাং চায় একদলীয় কর্তৃত্ব। কিন্তু সোশালিস্ট্ বিপ্লব আসার আগে পর্যন্ত যখন বিভিন্ন শ্রেণী থেকে যাচ্ছে, তখন তাদের মুখপাত্র হিসাবে বিভিন্ন দলের অস্তিত্ব অনিবার্য, বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সংযোগ ছাড়া রাজ্য চালানো তখন সম্ভব নয়। আজকের দিনেব পপুলাব ফ্রন্ট্ই পবে রেপাব্লিক চালাবে, নিউ ডিমক্র্যাসির রাষ্ট্রিক আদর্শ হল এই। অর্থনীতিব ক্ষেত্রে নিউ ডিমক্র্যাসি চায় মূলধনীদের উচ্ছেদও নয়, তাদেব পবিপূর্ণ স্বাধীনতাও নয়। ক্যাপিটালকে নূতন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত করবে, তাকে হতে হবে সংযত, সীমাবদ্ধ ও কর্তৃত্বাধীন। অন্য দিকে জমিব উপব থেকে সকল বকম ফিউডালি প্রাচীন ব্যবস্থাকে নির্মূল কবতে হবে, জমিতে আনতে হবে আসল চাষীদের কর্তৃত্ব, জমির হবে পুনর্বণ্টন। বাষ্ট্রিক ও আর্থিক উভয় ব্যবস্থাতেই নিউ ডিমক্র্যাসি ঠিক এখনই সমাজতন্ত্র আনতে চাইছে না, অথচ শ্রমিক নেতৃত্বে পুরানো বুর্জোয়া গণ্ডিও অতিক্রম করছে, এর বিশেষত্ব এইখানেই।

১৯২৪ সালে যখন কুয়োমিন্‌টাং-এর পুনর্জন্ম হয় তখন সুন ইয়াৎ-সেন অনেকটা এই পরিকল্পনারই আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'তিন নীতির' যে-ব্যাখ্যা করেছিলেন তার সঙ্গে নিউ ডিমক্র্যাসির সম্পূর্ণ না হলেও আন্তরিক মিল আছে। তিনি তিনটি নির্দেশও দিয়েছিলেন: চীনের মুক্তি আন্দোলনকে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী রেখে চলতে হবে, দেশের মধ্যে সাম্যবাদী দলের সঙ্গে জাতীয় দলের পূর্ণ সহযোগ প্রয়োজন, চাষী মজুরদের উপর নির্ভর করে তাদের সঙ্গে সংযোগ রাখা দরকার। সুন ইয়াৎ-সেনের দূরদৃষ্টির ফলে চীনে মুক্তিআন্দোলন প্রবল রূপ ধাবণ করে। ১৯২৪ থেকে ১৯২৭-এর গৌরবময় যুগ তার ফল, বিজয়ের স্রোত তখন তাঁর নীতিকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিল।

তারপর কুয়োমিন্‌টাং অন্য পথ ধরল, নেতার নির্দেশ লঙ্ঘিত হওয়ায় দশ বৎসর অন্তর্যুদ্ধ দেখা দিল। জাপানী চাপের ফলে ১৯৩৬ সালে আবার ঐক্য ফিরে আসে, তার প্রধান উদ্যোগী ছিল সেই সাম্যবাদী দল যাদের উচ্ছেদের আপ্রাণ চেষ্টায় চিয়াং কাই-শেক অভিযানের পর অভিযান করেছিলেন, মাদাম সুন ইয়াৎ-সেন প্রভৃতির সকল উপরোধ উপেক্ষা করে। বর্তমান জাপানী যুদ্ধের তৃতীয় বৎসর থেকে আবার ঐক্যের মধ্যে ভাঙন লক্ষ্য করা যায়, প্রতিক্রিয়া আবার মাথা তুলতে থাকে। এ খবর এখন আর চাপা নেই, পৃথিবীর সকল দেশের ফাশিস্ট-বিরোধী জনমত তাই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বিদেশী জনমত ও প্রকৃত প্রগতিশীল চীনবাসীদের মিলিত চাপে চিয়াং কাই-শেক তাঁর প্রতিক্রিয়াপন্থী বন্ধুদের হাত থেকে মুক্তি পাবেন আশা করা যায়। নয়তো চীনের দুর্ভাগ্য আবার ঘনিয়ে আসবে।

আমাদের তালিকার তৃতীয় বইখানিতে এই নূতন সংঘর্ষ সম্বন্ধে অনেক মাল মশলা সংগৃহীত হয়েছে। তাতে দেখা যায় যে চীনে জাতীয় ঐক্য ভাঙবার চেষ্টা হয়েছে কুয়োমিন্‌টাং-এর দক্ষিণ-পন্থীদেরই দিক থেকে। সাম্যবাদী দল ১৯৩৬-১৯৩৭-এর চুক্তির সর্ত পালন করে এসেছে, কিন্তু সরকারী তরফ থেকে চেষ্টা চলেছে চতুর্থ আর্মি ধ্বংস করবার, সীমান্তের লাল চীন অঞ্চল করায়ত্ত করবার, গেরিলা বাহিনীকে সাহায্য এবং সীমান্ত অঞ্চলের দিকে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম পাঠাবার চেষ্টা হয় নি, জাপ-বিরোধী সংগ্রামে নিশ্চেষ্টতা এসেছে, অথচ দাবি উঠেছে আবার কুয়োমিন্‌টাং-এর একদলীয় কর্তৃত্ব স্থাপনের। সুন ইয়াৎ-সেনের নির্দেশ লঙ্ঘিত হচ্ছে আগেকার অভিজ্ঞতা অগ্রাহ্য করে। এই প্রতিক্রিয়ার স্রোতকে মার্শাল চিয়াং কাই শেক বাধা দিতে পারবেন, চীনের সকল বন্ধুর আজ এই কামনা।

চিয়াং কাই-শেকের নামে 'চীনের ভবিষ্যত' শীর্ষক যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সম্ভবত সে-বই কোনও দক্ষিণপন্থীর লেখা। পূর্বোক্ত তালিকার চতুর্থ পুস্তক তার সুদক্ষ সমালোচনা। 'চীনের ভবিষ্যত'-এ যে-চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে, সুন ইয়াৎ-সেনের নীতি ও নিউ ডিমক্র্যাসির সঙ্গে তার

পার্থক্য লেখক স্পষ্টভাবে দেখাতে পেরেছেন। 'চীনের ভবিষ্যত' প্রাচীন চীনের গুণগানে পরিপূর্ণ। সেই প্রাচীন চীন যে স্বেচ্ছাচারী ফিউডাল সাম্রাজ্য ছিল, 'চীনের ভবিষ্যত'-এর গ্রন্থকার তা স্মরণ রাখেন নি। বিদেশী চাপ নাকি চীনের সকল অনর্থের মূল, কিন্তু পুরানো সমাজের দুর্বলতাই কি সেই চাপ সফল হবার কারণ নয়? প্রাচীন চীনে সভ্যতার আদর্শের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পড়তে গিয়ে মনে পড়ে না কি যে সেই সভ্যতাও সাধারণ লোকের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত? সমালোচক দেখিয়েছেন যে ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে তারিখে যে-সাংস্কৃতিক আন্দোলন চীনে নবপ্রেরণা এনে দেয় সে-সম্বন্ধে 'চীনের ভবিষ্যত' সম্পূর্ণ উদাসীন। সমাজবাদ দূরে থাক, গণতন্ত্রের আদর্শেও গ্রন্থকারের আস্থা নেই; জনসাধারণের প্রতি গভীর অবজ্ঞা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এক দিকে সনাতন পুরাতনের প্রতি অহেতুকী প্রীতি, অন্যদিকে 'এক দল, এক নীতি, এক নেতা' ফাশিস্ট্-গন্ধী সকল আন্দোলনের এই বুলির আশ্রয় গ্রহণ—বইখানির বিশেষত্ব এইখানে, সঙ্গে আছে লাল চীনের ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা। চিয়াং কাই-শেক দূরদর্শী ও শক্তিমান পুরুষ, চীনের জাতীয় ঐক্য তাঁর উপর নির্ভর করছে। চীনের হিতাকাঙ্ক্ষীদের বিশ্বাস আছে তিনি প্রগতির সহায়ক হতে পারেন, কিন্তু প্রতিক্রিয়ার বাঁধন ছিঁড়তে না পারলে তার সম্ভাবনা নেই।

॥ পরিচয় : আশ্বিন, ১৩৫১ (১৯৪৪) ॥

যুদ্ধান্তের জগৎ

ফাশিজ্‌মের উদ্ধত প্রাসাদ এতদিনে ধূলিসাৎ হতে চলেছে, ইয়োরোপের দিকে দিকে আজ মুক্তির উত্তেজনা, পৃথিবীর দেশে দেশে জনসাধারণের মনে উল্লাস, অথচ সেই আনন্দ আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে প্রকাশ পাচ্ছে না এ কথা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। ঘরে বাইরে, ট্রামে বাসে, অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে, চোখে পড়ে গভীর ঔদাসীন্য ও নির্জীব জড়ভাব, এমন কি মাঝে মাঝে একটা আতঙ্কের ছায়া দেখা যায় বললেও অত্যুক্তি হবে না। প্রশ্ন ওঠে যে সারা জগতের প্রগতি-আন্দোলন থেকে আমাদের ভদ্রলোকদের জীবন কি আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল? এই নিরুৎসুক অবসাদ ও সন্দেহ আমাদের জাতীয়তা-বোধের ঐতিহ্য নয়। বাংলাদেশে নবজাগরণের আদি যুগে রামমোহন রায় ইটালি, স্পেন ও লাটিন আমেরিকায় বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট্-সংস্কারের উদারনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ছিলেন অন্তরঙ্গ ভাবে যুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র সেকালের সোশালিজ্‌মে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। মাট্‌সিনি ও গারিবল্‌ডির বিপ্লবসাধনা বাঙালীকে মুগ্ধ করেছিল। আয়ার-ল্যাণ্ডের মুক্তিসংগ্রামকে আমরা এককালে নিজেদের সংগ্রাম মনে করতাম। রাশিয়ার বিপ্লবে রবীন্দ্রনাথ জগৎজোড়া বঞ্চিতের মিলনের সাফল্য দেখেছিলেন। এই সেদিন পর্যন্ত স্পেনের গৃহযুদ্ধ ও চীনের প্রতিরোধ আমাদের মনকে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু আজকের দিনের শিক্ষিত বাঙালী ইয়োরোপের অধুনাতম জনজাগরণকে অবহেলা বা ভয়ের চোখে দেখেন কেন? জরাগ্রস্ত, পতনোন্মুখ, fin de siecle মনোভাব কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে? বাইরের জগৎ সম্বন্ধে বাস্তব ধারণার

অভাব, কূপমণ্ডুকতা, চিন্তার দৌর্বল্য আমাদের মনকে অসাড় করে রাখছে কেন?

ইতিহাসে যুগে যুগে দেখতে পাই প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব, প্রতি যুগে প্রগতির সাধারণ ঝোঁকের পূর্ণ সমর্থন ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সে-যুগের সুস্থ সবল মনের পরিচয়। প্রতি যুগেই প্রগতির স্রোতে অনেক অসম্পূর্ণতা ও দোষত্রুটি থেকে যেতে পারে, প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও প্রশংসনীয় কিছু চোখে পড়া বিচিত্র না। আদর্শবান মন তাতে বিচলিত না হয়ে প্রগতির সাহায্যেই এগিয়ে যেতে চায়। ফরাসী বিপ্লবের ঘাতপ্রতিঘাত এর প্রামাণিক উদাহরণ। ইতিহাসের কোন্ ছাত্র আজ Reign of Terror-এর কথা মনে রেখে সেদিনের অগ্রগতিকে অসম্মান করবে? যুগসন্ধির সময় প্রগতির ধারার সমগ্র ছবিটা সামনে না রেখে ছোট ছোট ঘটনার বিচ্ছিন্ন বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া সংকীর্ণতার পরিচয়।

যুগে যুগে প্রগতির রূপ বদলে চলে, প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি গ্রহণ করে। বিভিন্ন রূপের আড়াল ভেদ করে দ্বন্দ্বের প্রকৃত সন্ধান পাওয়া, অবান্তরকে ঠেলে ফেলে যুগধর্মকে আবিষ্কার করতে পারা সজীব মনের চিহ্ন। আজকের দিনে সারা পৃথিবী অনেকাংশে এক হয়ে পড়াতে সকল দেশের প্রগতি-আন্দোলনের পরিচয় সহজেই পাওয়া যায়। জাতীয় মুক্তিসাধনাকে আজ বাইরের প্রগতিশীল জগৎ থেকে পৃথক করে রাখা অসঙ্গত ও নিতান্ত অন্যায় বলেই গণ্য করতে হবে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মন আজ সত্য সত্যই পঙ্গু হয়ে পড়বার উপক্রম হলে, আমাদের মানসক্ষেত্রে অন্য শ্রেণীর প্রভাবের প্রবাহকেই স্বীকার করে নেওয়া উচিত।

প্রতিবাদ উঠবে যে আমাদের জাতীয় সমস্যাতেই আমরা অভিভূত, বাইরের দিকে চোখ ফেরাবার অবসর কোথায়, অন্যত্র কি ঘটছে তাতে আমাদের বা কি আসে যায়? কিন্তু জাতীয় সমস্যা আগেও ছিল, জহরলাল নেহরুর মতন লোককে তাতে বিশ্বচিন্তা থেকে নিবৃত্ত করে নি। জাতীয় সাধনাকে বাইরের জগতের প্রগতির ধারার সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে

নিজেদের শক্তি বাড়বে বই কমবে না। স্বদেশের সমস্যার প্রকৃত সমাধানের দিকেই বা আজ কতটুকু আগ্রহ আছে? অগ্রগামী সকল দলের যে-প্রচণ্ড জাতীয় ঐক্য ইয়োরোপে প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে তুলে মুক্তি এনেছে, তার অনুরূপ সাধনা এখানে কোথায়? নূতন ধারণা, নীতি ও আদর্শের প্রতি এত অবহেলা বা সন্দেহ কেন? সামান্য সমাজসংস্কারের কথাতেই যে উচ্চশিক্ষিত লোকেরা সনাতন ব্যবস্থা রসাতলে যাবার রব তোলে, তার কারণ কি? বিদেশী রাজ-সরকার অথবা আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের কাছে দরবার করবার দিকেই কি আমাদের খবরের কাগজ ও আলাপ-আলোচনার দৃষ্টি নিবদ্ধ নয়? আর জাতির আত্মশক্তি যাঁদের মন্ত্র তাঁরাই বা জাতির অঙ্গ অন্ত্যজদের সংস্পর্শ বর্জন করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছেন কেন? যে-জনসাধারণের নামে মুক্তির আরাধনা চলে, ঘোর দুর্দিনে তাদেরই অন্ন অথবা বস্ত্রসংকটের সময় কি দিকে দিকে অটল নিশ্চেষ্টতা দেখা যায় নি? কিসের জন্যই বা দুর্নীতি ও চোরাবাজার আমরা সমাজজীবনে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিই? আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর আজ কঠোর আত্মজিজ্ঞাসার সময় এসেছে। নিজেদের সমস্যার সর্বাঙ্গীনতা বাইরের ইতিহাসের ধারার প্রতি অবজ্ঞার কোনও যুক্তি-সঙ্গত কারণ নয়।

দুই

তর্কের অবশ্য শেষ হয় না, এখানে তাই প্রশ্ন আসতে পারে যে আজকের জগতে কোন্ ঘটনাগুলিকে প্রগতির চিহ্ন বলে মেনে নেব, কাকেই বা প্রতিক্রিয়ার সহায় হিসাবে দেখতে হবে? ব্যক্তিবিশেষের রুচির উপর কি এই নির্বাচন নির্ভর করছে না? এর মধ্যে ধ্রুব সত্য কোথায়? প্রগতি কোনদিকে তার পরিচয় পাবার উপায় কি?

গণিতের স্বতঃসিদ্ধ অথবা ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের মতো সর্ববাদিসম্মত উত্তর এ ক্ষেত্রে মেলে না বটে, কিন্তু লৌকিক জীবনে সত্য নির্ধারণের অন্ত

উপায়কে অস্বীকার করা চলে না। আধুনিক ইতিহাসের আলোচনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি সমাজের অগ্রগতি কোন্ পথে চলেছে। ইংরাজ, আমেরিকান ও ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে আমরা বুঝতে শিখেছি যে উদারনীতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণতন্ত্রের প্রসার এগিয়ে চলার চিহ্ন। সমাজবাদের অভ্যুদয় থেকে আমাদের মনে ধারণা এসেছে যে শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তুলবার চেষ্টা সেই অগ্রগমনেরই পরিণতি। সাম্রাজ্যবাদ জনসাধারণের শত্রু, তাই তার পরিপূর্ণ প্রকাশ যে-ফাশিস্ট্ মতবাদের মধ্যে রূপ পেয়েছে, সেই ফাশিজ্‌মের সহায়ক প্রচেষ্টা মাত্রেই আজকের দিনে প্রতিক্রিয়ার বাহন। রুশ দেশে পঁচিশ বছর যে নূতন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলবার উদ্যম চলছে, তার প্রতি সকল দেশের সাধারণ লোকের আকর্ষণ মানুষের মঙ্গলসাধনারই পথ। সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্য ব্যাখ্যা অসম্ভব নয়, কারণ মানুষের বুদ্ধিকে নানা দিকে খেলানো যায়। কিন্তু এর তুলনায় অন্য ব্যাখ্যা এত সুসঙ্গত ও ব্যাপক নয়, বরং তার মধ্যে দেখি শুধু কষ্ট-কল্পনার আভাস যেমন আধুনিক ইতিহাসের ক্যাথলিক ব্যাখ্যার মধ্যে পাই একদেশদর্শী আংশিক বিচার।

অতীত ইতিহাসের নির্দেশ ছাড়াও আর একটা লক্ষ্যণীয় কথা আছে। প্রত্যেক দেশে প্রতিক্রিয়া ও প্রগতির দ্বন্দ্ব চলেছে, তাই দেশে দেশে প্রগতিশীল আন্দোলনের মধ্যে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করতে পারলে আজকের দিনের অগ্রগতির রূপ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। ফাশিজ্‌মের বিরোধিতা দেশ বিশেষের প্রগতি-আন্দোলনে আবদ্ধ নয় বলেই এই মনোভাবকে অগ্রগতির সাধারণ লক্ষণ হিসাবে মানতে হবে। অগ্রগতির প্রচেষ্টা কোনও বিশেষ জাতির নিজস্ব সাধনা হতে পারে না, অন্য দেশের বঞ্চিত ও নির্যাতিত সাধারণ লোককে টানতে পারা তার সাফল্যের চিহ্ন। আমাদের দেশের মুক্তি আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী প্রগতির স্রোতের সঙ্গে, শুধু কথায় নয়, আন্তরিক কাজের ক্ষেত্রে যুক্ত করতে পারাই সার্থকতার পথ।

তিন

শিক্ষিত বন্ধুবান্ধব মহলে যে-নানা সংশয় চোখে পড়ে তার বিস্তৃত আলোচনা অল্প পরিসরের মধ্যে সম্ভব নয়। এখানে শুধু কয়েকটি প্রশ্নের উল্লেখ করা চলে মাত্র।

অনেকের মনের কথা এই যে ফাশিজ্‌ম্ এমনই বা কি দোষের? হিট্‌লার ও মুসোলীনি নাকি স্বদেশের অনেক উন্নতি করেছিলেন, তাঁদের পতনে তাই মনে সমবেদনা জাগা স্বাভাবিক নয় কি? কিন্তু ফাশিজ্‌মের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতা গর্বের কথা নয়, তার প্রকৃতির লক্ষণ-নির্দেশ আজকের দিনের প্রপাগাণ্ডা নয়। দেশবিদেশে প্রগতিশীল লোক বরাবর তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে এসেছে, এতদিনের ইতিহাস আজ ভুললে চলবে কেন? পুরানো পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে দশ বারো বৎসর আগেও 'পরিচয়' পত্রিকা ফাশিজ্‌মকে প্রতিক্রিয়ার তীক্ষ্ণতম প্রকাশ হিসাবে আক্রমণ করেছিল, মুসোলীনিকে দেখেছিল দুর্দান্ত অত্যাচারী হিসাবে, হিট্‌লারি আমলের চাকচিক্যের আড়ালে ধরতে পেরেছিল জার্মানির দুরবস্থা। আজকের দিনের অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা অপসারণ হিসাবে ফাশিজ্‌মের পতন সকল দেশের সাধারণ লোকের কাছে আশা ও আনন্দের কথা।

গত মহাযুদ্ধের পর জার্মানি ও ইটালিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আসন্ন মনে হওয়াতে তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ফাশিজ্‌মের রূপ নেয়, ধনিকদের সমর্থনেই সে-আন্দোলন পুষ্টিলাভ করেছিল। গণতন্ত্রের আবহাওয়ায় সমাজবাদ শক্তিশালী হবার ভয়েই গণতন্ত্রকে তখন বর্জন করে ফাশিস্ট-দলের একাধিপত্য গড়া হল। মুক্তিকামী মজুরদের সমস্ত স্বাধীন প্রতিষ্ঠান চূর্ণ করে প্রগতিশীল সকল দলকে তখন অকথ্য অত্যাচারে নির্মূল করা হয়। দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সংখ্যা অগণিত নয়; প্রাণদণ্ড, নির্বাসন ও অবরোধের মধ্যে থেকে তারা প্রায় লোপ পেল। জনসাধারণকে ভোলাবার জন্য এল নূতন শিক্ষা দীক্ষা; তার ফলে অসংখ্য লোক আজ অমানুষে পরিণত হয়েছে।

আরো অনেকে হয়ে পড়েছে নির্জীব আজ্ঞাবাহক। প্রতিবিপ্লবকে বলা হল নূতন সমাজগঠন। শ্রেণী হিসাবে ধনিক ও জমিদারদের প্রভুত্ব বজায় রইল, তাদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ন্ত্রিত করল যে-রাষ্ট্রশক্তি পুরানো শাসক শ্রেণীই তার চালক। বেকারদের কাজ দেওয়ার চেষ্টা হল যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের প্রস্তুতিতে। সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার চলল যে ভগবানের বিধানে তাদের জাতিই হল প্রভুজাতি, বিদেশীদের জয় করে তাদের দাবিয়ে রেখে শোষণ করবার দৈব অধিকার স্বজাতির রয়েছে, রাজ্যপ্রসারের মধ্যে রয়েছে প্রত্যেকের স্বার্থ। যে লেবার ফ্রন্ট্ মজুরদের কিছুটা সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করেছিল, তার মধ্যেও দেখি মজুরদের খুশি করে মালিকদের স্বার্থে বিপথে চালাবার দুরভিসন্ধি। এর পরেও কি হিট্‌লার ও মুসোলীনির পতনকে অভিনন্দন করা উচিত নয়? ফাশিস্ট্ আমলে উন্নতি কি দেশের উন্নতি, না শাসক ও শোষক শ্রেণীর আত্মরক্ষার আয়োজন? ফাশিজ্‌ম্ কি জার্মানির উপযোগী একটা নূতন সমাজব্যবস্থা, না সারা জগতের প্রগতির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযান?

ফাশিজ্‌মের নিন্দাকে এ দেশের অনেকে ইংরাজের প্রপাগাণ্ডা মনে করে। কিন্তু বোঝা উচিত যে, ফাশিস্ট্ মনোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়াটা ছিল ইংরাজ নেতা চেম্বারলেনেরই আপোস নীতি। আজ পর্যন্ত বিলাতের টোরি মহলে হিট্‌লারের সমব্যথীর অভাব নেই, অন্যদিকে সকল দেশে প্রগতির শ্রেষ্ঠ একনিষ্ঠ ভক্তেরা ফাশিস্ট্-বিরোধী। নাৎসি শাসনের কুফল সম্বন্ধে এখনও অনেকে সন্দিহান। কিন্তু জানা উচিত যে জার্মান বন্দীদের মধ্যে দেখা গেছে জার্মানির গৌরবময় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অপার অজ্ঞতা, নাৎসি-অধিকৃত দেশে নৃশংস বর্বরতার বিবরণ অবিশ্বাস করবারও কারণ নেই, পৃথিবীর সর্বত্র যাকে প্রগতির ধারণা বলে গণ্য করা হয় হিট্‌লার স্বদেশে তার উচ্ছেদসাধন করেছেন। ফাশিজ্‌মের সম্পূর্ণ ছবিটা দেখতে না চাওয়া চোখ বন্ধ রাখার সামিল, অন্ধ সংস্কার নিয়ে আমরা প্রগতির পথে এগোতে পারব না।

অনেকে ভাবে হিট্‌লারের পতনে আনন্দের কারণ কি? ফাশিজ্‌মের মূল যে ধনতান্ত্রিক ইম্পিরিয়ালিজ্‌মে, সেই সাম্রাজ্যবাদ তো অটুট রয়ে গেল, সেই এখন ফাশিজ্‌মের জায়গা নেবে। এই সাধারণ বিশ্বাসের মধ্যে অসামান্য যুক্তির গলদ রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিকাশ ফাশিস্ট্‌ নীতিতে, তাই ফাশিজ্‌ম্‌ উচ্ছেদ হলে তাতে সাম্রাজ্যতন্ত্রের ভিতই আলগা হয়ে পড়তে বাধ্য। সমাজবাদের দিকে এগোবার পথে ফাশিজ্‌ম্‌ ছিল প্রচণ্ডতম বাধা, বাধা সরে গেলে সে-পথে অগ্রসর হবার প্রেরণাই মোটের উপর জোর পাবে। ইম্পিরিয়ালিজ্‌মের তীক্ষ্ণ শানিত ফলক ফাশিজ্‌ম্‌, তা ভেঙে গেলে ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্‌ই হবে ভোঁতা। ফাশিস্ট বিরোধী যুদ্ধ চালাতে গিয়ে দেশে দেশে জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে হয়েছে, সরকারের উপর জাগ্রত জনশক্তির চাপ এখন বাড়ারই সম্ভাবনা। প্রতিক্রিয়াশীল মহল জনমতের সামনে অনেক দেশে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে, প্রগতিবাদীদের বিরাট ঐক্য গড়ে তাকে আরও কোনঠাসা করে ফেলবার কৌশল এখন আয়ত্ত করতে হবে। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে যুদ্ধের মধ্যে সংঘবদ্ধ মজুরের শক্তি বেড়ে যাবার কথাটা উল্লেখযোগ্য, সারা জগতের ট্রেড ইউনিয়নদের দু' কোটি সভ্যের মিলিত প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান চোখের সামনে গড়ে উঠছে। যেখানে প্রতিক্রিয়ার প্রতাপ এখনও প্রবল, সেখানেই দেখি মূলে রয়েছে জাগ্রত জনমনের ঐক্যের অভাব। ফাশিস্ট্‌-বিরোধী সংগ্রামের দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদকে কোথাও দুর্বল করে ফেলবার পন্থা কার্য্যকরী হচ্ছে না কেন, তা ভেবে দেখা দরকার। ফাশিস্ট্‌ শক্তি যুদ্ধে জয়ী হলে ইংরাজ সাম্রাজ্য খানিকটা ক্ষয় হলেও সাম্রাজ্যতন্ত্র হত আরও প্রবল, পরাধীন মানুষের মুক্তি হত দুস্তরতর, রাশিয়ায় নূতন সমাজ গড়বার পরিকল্পনার মূলে পড়ত কুঠারাঘাত। ফাশিজ্‌মের পরাজয়ের ভিতর দিয়ে আসছে ইয়োরোপে গণতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার, আর সোভিয়েট শক্তির বলবৃদ্ধির ফলে দেখা যাবে সকল দেশে জনসাধারণের জাগরণ ও ক্ষমতার পূর্বাভাস।

চার

বন্ধুমহলে দ্বিতীয় সন্দেহ দেখতে পাই হিট্‌লারি জার্মানির শাস্তিবিধান সম্পর্কে। জার্মানদের পরাজয়ের পর শাস্তির সর্ত সম্বন্ধে মিত্রশক্তিদের যে-প্রস্তাব, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছে বিলাতের উদারনৈতিক মহলে; জোড্‌, ল্যাস্কি, বার্নার্ড্‌ শ, ব্রেল্‌স্‌ফোর্ড্‌ আপত্তি জানিয়েছেন। তার প্রতি-ধ্বনি শুনছি এদেশের জাতীয় কাগজ-পত্রে ও নেতাদের মুখে। জার্মানিকে লঘুদণ্ড দেওয়া উচিত ন্যায়ধর্মের খাতিরে, জার্মান জাতির অধিকার যেন খর্ব না হয়, ভের্সাই সন্ধির সময় যে-অবিচার হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি হলে জার্মানদের মধ্যে প্রতিশোধের ইচ্ছা আবার প্রবল হয়ে শান্তিভঙ্গ করবে, মোটামুটি এই যুক্তির প্রচার চলেছে।

অবস্থা বদ্‌লে গেলে যে ব্যবস্থা বদলানো দরকার, এই সাধারণ সত্যটুকু লোকে সর্বদা মনে রাখতে পারে না। ঘটনার ঐতিহাসিক কারণ খুঁজতে গেলে প্রকৃত অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ করা উচিত। সব সময় সমানভাবে প্রযোজ্য সাধারণ নিয়ম দিয়ে বিচার চলে না। ন্যায়ধর্মের ধারণা পর্যন্ত কিছু অবিচল, সনাতন, সর্বগ্রাহ্য ব্যাপার নয়, ইতিহাস অন্তত এটুকু সাক্ষ্য দিয়ে আসছে।

প্রগতিবাদীদের মনে সন্দেহ নেই যে ফাশিজ্‌ম্‌কে সমূলে উৎপাটিত করা আজকের প্রথম কর্তব্য, নাৎসি নীতিকে পুনরুত্থানের সুযোগ দেওয়া কিছুতেই চলবে না। পৃথিবীর সমস্ত জনসাধারণের মঙ্গল এর উপর নির্ভর করছে, জার্মানির সাধারণ লোকেরও স্বার্থ এইখানে, ন্যায়ধর্মের আজকের দিনের প্রয়োগ এরই মধ্যে। জার্মানির ভিতরে আজ যদি ফাশিস্ট্‌-বিরোধী প্রতিরোধ-আন্দোলন শক্তিশালী হত, তাহলে সেই সংঘবদ্ধ জনগণের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা তুলে দিলেই গোল মিটত। ভবিষ্যতে যে-মুহূর্তে সেই আসল প্রগতিশীল জনমতের প্রভাব নিঃসন্দেহে দেখা যাবে, তখনই অগ্রগামী দেশ ও দলগুলির দাবি উঠবে জার্মানির সমান অধিকার মেনে নেবার : ভান্সিটার্ট্‌ নীতির সঙ্গে আমাদের তফাত এইখানে। ভার্গা তাই লিখেছেন

যে, জার্মান সাম্রাজ্যবাদের মূল জার্মান জাতির বৈশিষ্ট্য ও মনের গড়নের মধ্যে নয়, ঐতিহাসিক অবস্থার সাম্প্রতিক বিকাশের মধ্যেই ফাশিজ্‌ম্‌ মাথা তুলতে পেরেছে। নাৎসিবাদ নির্মূল হতে পারে শুধু জার্মান সমাজব্যবস্থার বিপুল পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে। কিন্তু ঠিক আজকের দিনে জার্মানিতে প্রগতিবাদী সে-শক্তি কোথায়? ইটালিতে পর্যন্ত যে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত নবজাগরণ দেখা গেল তার মতন কিছু তো এখন পর্যন্ত জার্মানির মধ্যে চোখে পড়ছে না। তেমন আন্দোলন প্রবল হওয়া মাত্র জার্মানির ভাগ্য ফিরতে আরম্ভ করবে। বারো বছরের প্রচণ্ড নাৎসি শাসন সেখানে প্রগতিবাদীদের উজাড় করে ছেড়েছে, নাৎসি ধারণা ও বিশ্বাস অগণিত লোকের মন বিষে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, হঠাৎ একদিনে সুস্থ অবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। জার্মানিকে সমান অধিকার দিয়ে সে-দেশীয়দের হাতে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে সেখানে নাৎসিবাদের পুনর্গঠনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ও সুযোগ দেওয়া হবে। গণতন্ত্রের স্বাভাবিক প্রসার, বিপ্লবী চিন্তার স্বাধীনতা, মজুর ও সাধারণ লোকদের অবাধ সংগঠন গড়বার অধিকার, সমাজ পুনর্গঠনের চেষ্টা, এ সবের বদলে তাহলে সেখানে আসবে হিট্‌লারি নব-বিধানের নতুন সংস্করণ প্রচলনের উদ্যম। সাময়িকভাবে বিশেষ ব্যবস্থার তাই প্রয়োজন আছে।

নাৎসি নেতাদের কঠোর শাস্তি, নাৎসি প্রচারের পথরোধ, অস্ত্রশক্তির সরঞ্জাম ও নায়কদের উচ্ছেদ, জার্মান যুঙ্কার জমিদার ও শিল্পপতিদের প্রভাবের অবসান ইত্যাদি ব্যবস্থা সময়সাপেক্ষ; এ সবের অভাবে জার্মানিতে অগ্রসর মতবাদ আজকের দিনে সহজে মাথা তুলতে পারবে না। কিছুদিনের মতন জার্মানির উপর তাই বাইরের নিয়ন্ত্রণ চাই। বর্তমান জার্মান জনসাধারণকেও নূতন করে অনেক জিনিস শিখতে হবে, বিধ্বস্ত ইয়োরোপের পুনর্গঠন হয়তো হবে সে-শিক্ষার অঙ্গ। জার্মানদের নিজস্ব প্রগতিবাদী আন্দোলনকে গড়ে উঠবার সময় ও সুযোগ দেবার দায়িত্ব অন্য দেশের জনসাধারণের; নিয়ন্ত্রণ যাতে সাধারণের শোষণে পরিণত না হয় তার উপায় রয়েছে এরই

মধ্যে। জার্মানির বিশেষ অবস্থায় এ-ছাড়া অন্য কোন্ ব্যবস্থায় জার্মান প্রগতিবাদের প্রতিষ্ঠা হতে পারে?

অনেকে বলবে নিয়ন্ত্রণের অবশ্যম্ভাবী ফল হবে প্রতিশোধের ইচ্ছা, ভের্সাই সন্ধি জার্মানদের সেই উত্তেজনা জাগিয়েছিল। হিট্‌লারের অভ্যুদয়ের কারণ কিন্তু ভের্সাই সন্ধি নয়। যে-সময় ভের্সাই-শৃঙ্খল জার্মানিকে বাঁধতে চেয়েছিল তখন নাৎসি মতের প্রভাব ছিল নগণ্য। তার অনেক পরে এল আর্থিক সংকট। যখন তাই জার্মানিতে সমাজবিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দিল, তখনই বল্‌শেভিক জুজুর ভয় দেখিয়ে হিট্‌লার ত্রাণকর্তা হিসাবে দাঁড়িয়ে গেলেন, মুসোলীনি যেমন সেই একই আতঙ্কের সুযোগ আগেই নিতে পেরেছিলেন। জাতীয় প্রতিশোধ-স্পৃহার চাইতে দেশে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার প্রেরণাই ধনিক শ্রেণীকে ফাশিস্ট্ রীতিনীতির উপর নির্ভর করতে শিখিয়েছিল। সেই জন্যই ফাশিস্ট্ দলের প্রথম কর্তব্য হয়েছিল প্রগতিশীল স্বদেশীদের শেষ করা ও জনসাধারণকে বিকৃত শিক্ষা দেওয়া। তারপর বহুদিন ধরে হিট্‌লার ও মুসোলীনির প্রভাব যখন বেড়েই চলে, সে-যুগে তার সহায় হয়েছিল—ভের্সাই বন্ধনের চাপ নয়, পশ্চিমী মহাশক্তিদের আপোস নীতি ও পৃষ্ঠপোষকতা। এমনকি ১৯১৮-র জার্মান বিপ্লবকে তখনকার মিত্রশক্তিরাই কোনঠাসা করে রাখেন, আর জার্মান ধনিক শ্রেণী পুনর্গঠিত হয়েছিল আমেরিকারই অর্থসাহায্যে। ফাশিস্ট্ অত্যাচার ও প্রসারকে ইংরাজ ও ফরাসী শাসক সম্প্রদায়ই বরাবর প্রশ্রয় দিয়ে আসে, প্রশ্রয়ের পূর্ণ প্রকাশ রূপ পেয়েছিল শেষ পর্যন্ত চেম্বারলেন ও দালাদিয়ে-র নীতিতে। এর কারণ বোঝাও সহজ। প্রথম থেকেই সোভিয়েট ইউনিয়ানের সম্বন্ধে ভয় ও সন্দেহ পশ্চিমী শাসক সম্প্রদায়কে উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল, ফাশিস্ট্ রাষ্ট্রগুলি শক্তিশালী হলে বল্‌শেভিক বন্যাকে বাঁধের মতন আটকে রাখতে পারবে এই ছিল তার ভরসা। হিট্‌লার অবুঝের মতন বড় বেশি দাবি করাতে ১৯৩৯ সালে লড়াই লাগে—ফাশিজ্‌ম্‌কে ধ্বংস করার সংকল্প নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করা হয় নি। লীগ অব্ নেশন্‌স্-এর শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা

ভেঙে পড়ে পশ্চিমী আপোস নীতির চাপে। তখনকার ইতিহাসের দপ্তরের এ সব কথা তখনও সুপরিচিত ছিল, আজ হঠাৎ পুরানো কথা ভুলে যাব কোন নূতন যুক্তিতে ?

পাঁচ

শিক্ষিত সমাজে তৃতীয় ধারণা এই যে প্রগতিবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীর গোড়াতেই গলদ আছে, সোভিয়েট রাশিয়া সমাজবাদ চুকিয়ে দিয়ে এখন অন্য রাস্তা ধরেছে, রুশদের একমাত্র লক্ষ্য এখন জাতীয় স্বার্থসিদ্ধি, নূতন সাম্রাজ্যবাদ রুশ রাজ্য বিস্তারের আকার ধারণ করছে। আমাদের খবরের কাগজের লেখকেরা মানুষের ভবিষ্যত নিয়ে বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র শেষ হয়ে গেল,—মনে পড়ে এ কথা পঁচিশ বছর ধরে শুনে আসছি, এতদিনে সোশালিজ্‌মের কিছুই সেখানে বাকি থাকা উচিত নয়। রুশ বিপ্লব হতে না হতেই কাউট্‌স্কি মাথা নেড়ে বল্লেন যে একে তো সমাজবাদ বলা চলে না, এ আবার কি অদ্ভুত জিনিস। লেনিন যখন নিউ ইকনমিক পলিসি প্রবর্তন করলেন তখন পশ্চিম থেকে রব উঠল যে এবার বল্‌শেভিজ্‌ম্‌ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়েছে। লেনিন যখন একদেশে সোশালিজ্‌ম্‌ গড়ে তুলবার কাজে লাগলেন তখন শোনা গেল যে এখনই বিশ্ববিপ্লব যদি না আসে তবে আর সমাজতন্ত্র কোথায় রইল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যুগে শুনলাম যে রাশিয়ায় এবার ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ এসে পড়েছে। মস্কোর বিচারের সময় বলা হল যে পুরানো বল্‌শেভিকেরা এবার নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সমালোচকদের মতে বল্‌শেভিজ্‌ম্‌ এতবার শেষ হয়ে গেছে যে আজ আবার নতুন করে তার অবসান হচ্ছে বিশ্বাস করা শক্ত। অথচ আশ্চর্য এই যে, বল্‌শেভিজ্‌ম্‌ ছড়িয়ে পড়তে পারে, এ ভয়েরও কোথাও শেষ দেখি না। সোভিয়েট ইউনিয়নকে এক-ঘরে করে রাখবার চক্রান্তও আজ পর্যন্ত বারবার মাথা তুলবার চেষ্টা করছে।

রুশ সমাজব্যবস্থায় সোশালিজ্‌ম্‌ থেকে বিচ্যুতি ধরতে যাঁরা সিদ্ধহস্ত, বিশেষজ্ঞের মতন অভিমত দেবার তাঁদের নিজেদের অধিকার কতটুকু? মার্ক্স্‌বাদের বিপুল সাহিত্যে তাঁদের দখল সামান্য বলেই সন্দেহ হয়। নিজেদের দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনেই বা তাঁদের স্থান কোথায়, স্বদেশী মজুর কিষাণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের যোগ কতটুকু? সোভিয়েটের নিন্দাবাদের অভিযানের প্রথম থেকে প্রতি পর্যায়ে তাঁদের সহযাত্রী হিসাবে দেখি বিলাতে টোরি মহল ও আমেরিকার উগ্রতর রক্ষণশীল শিল্পপতিদের সহচরদল, সকল দেশের অভিজাত সম্প্রদায় ও গোঁড়া ক্যাথলিক নেতাদের সমষ্টি, এবং নানা নামকাটা 'বামপন্থী'। তীব্র প্রতিক্রিয়া ও চরম বিপ্লবীর এই মিলন একদিনের ব্যাপার নয়, এক পুরুষ ধরে এই সমন্বয় বার বার আত্মপ্রকাশ করে এসেছে। অতি-দক্ষিণ ও অতি-বাম মতামত কার্যক্ষেত্রে একই পথ অবলম্বন করে,—মার্ক্স্‌, এঙ্গেল্‌স্‌ ও লেনিন এ কথা বারবার উপলব্ধি করেছিলেন।

একই সমালোচক আবার বিভিন্ন সময়ে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সোভিয়েট ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে থাকেন। রুশ দেশে ধর্মমতের স্বাধীনতা নেই এই অভিযোগের পর হয় তো শোনা গেল সেখানে পুরানো ধর্মকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। সমাজবাদের অবসান হচ্ছে এই অনুযোগের সঙ্গে সঙ্গেই ধনী কুলাক চাষীদের উচ্ছেদের প্রতিবাদও শোনা গেছে। বিশ্ববিপ্লবের চেষ্টা না করা অথবা কমিন্‌টার্ণের অবসান নাকি পশ্চাদগমনের চিহ্ন, আবার ইয়োরোপে রুশ প্রভাব বিস্তার নাকি সোশালিজ্‌ম্‌ ছড়াবার কৌশল। বিপ্লবের আদর্শ ত্যাগ করা হয়েছে শুনবার পর মুহূর্তে জানতে পাই যে পোল্যাণ্ড্‌, রোমানিয়া বা হাঙ্গারিতে জমিদারদের জমি ভাগ করে দেওয়ার মূলে রয়েছে রাশিয়া। অর্থাৎ যুক্তি যাই হোক লক্ষ্য সেই অবিচল এক—সোভিয়েট শক্তির প্রতিকূল সমালোচনা। পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে তাই দেখি আমাদের দেশের ছোট বড় অনেক বিপ্লবী বিলাতী টোরি ও মার্কিনী রেপাব্লিকান দলের সঙ্গে সমস্বরে সুর মিলিয়েছেন। পোলদের মজুর

কিষাণের প্রতিরোধ-আন্দোলনের স্বার্থের কথা ভাববার তাঁদের সময় নেই, তাঁরা ভাবছেন পশ্চিমে আশ্রিত দেশত্যাগী সরকারী নেতাদের কথা যাঁরা পোল্যাণ্ডে গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে যুদ্ধের আগেই আধা-ফাশিস্ট্ রাষ্ট্র গড়েছিলেন। এর পর আশ্চর্য হবার নেই যে, যাঁরা ১৯৪১ সালে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে হিট্লারের হার হলেও রাশিয়া দুর্বল হয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে, তাঁরাই এখন আবাব সোভিয়েটের শক্তি বেড়ে গেল দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

সাধারণ লোকের পক্ষে তাই ভাববার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র শেষ হবার অভিযোগ আসলে অমূলক, কথাটা খানিকটা বোঝার ভুল আর অনেকখানি বিরোধী প্রপাগাণ্ডা মাত্র। রাশিয়ায় সম্পূর্ণ সাম্যতন্ত্র এসেছে, একথা কেউ দাবি করে না; মার্ক্স্ নিজেই বলে গিয়েছেন যে কমিউনিজ্ম্ গড়ে উঠতে সময় লাগবে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মূল লক্ষণগুলি যে রাশিয়ার সমাজব্যবস্থায় পরিত্যক্ত হয়েছে, তার প্রামাণিক বর্ণনা পাই ওয়েব-দম্পতির বিস্তৃত আলোচনায়; তার পরে এমন কোন মৌলিক আর্থিক পরিবর্তনেব সন্ধান পাওয়া যায় নি যাতে রুশ জীবনযাত্রার রূপ বদলে যেতে পারে। পরিশ্রমের গুণ ও স্তরভেদ অনুসারে আয়ের কিছু তফাত রাশিয়ায় আছে, যদিও অন্য দেশের মতন ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য সেখানে চোখে পড়ে না। কিন্তু বেশি উপার্জনের ফলে যদি হাতে উদ্বৃত্ত টাকা আসে, সেই অর্থবলে রাশিয়ায় উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর কর্তৃত্ব চলে না, ব্যক্তিবিশেষ টাকা দিয়ে সেখানে নিজস্ব কলকারখানা বা ব্যবসাবাণিজ্য ফেঁদে বসতে পারে না, টাকার জোরে নিজের লাভের জন্য মজুর খাটানোর উপায় নেই। সমাজে গোটা উৎপাদনের পরিকল্পনা ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের মুনাফার সন্ধানে চালিত হচ্ছে না, যন্ত্রশিল্প বিশেষ কারও নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে পড়ছে না, সমবেত চাষের পদ্ধতিও রয়েছে অটুট। এই অবস্থায় ধনতন্ত্রের ফিরে আসার কথাটা কষ্টকল্পনা মাত্র। দেশের সামাজিক জীবনের উপর সংঘবদ্ধ মজুরদের ট্রেড ইউনিয়ান ও সাধারণ

লোকের প্রতিনিধি সোভিয়েট সমিতিগুলির অধিকার আগের মতনই অক্ষুণ্ণ রয়েছে। যুদ্ধের ক্ষতির কথা বাদ দিলে, জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা উন্নতির দিকেই এগিয়ে চলেছে বলা যায়। ক্যাপিটালিস্ট্ জগতের কাজের অনিশ্চয়তা ও সাধারণের ভাগ্যে অভাবের তাড়না ও আর্থিক দুরবস্থা, এসব রুশ জীবনে ছায়া ফেলে না। নূতন সমাজের প্রাণশক্তি ঘোর বিপদের দিনে সারা পৃথিবীকে স্তম্ভিত করেছে। সমাজতন্ত্রের অবসানের কোন চিহ্নই এসবের মধ্যে দেখতে পাই না।

সাম্রাজ্যবাদকে যখন ধনতন্ত্রের স্বাভাবিক প্রসারপ্রবৃত্তির ফল হিসাবেই দেখা হয়, তখন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার রেড ইম্পিরিয়ালিজ্‌মের কথাটাকে মিথ্যা ভয় বলেই গণ্য করা উচিত। যে যে অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে বলে রব উঠেছে, সেখানে শাসন ক্ষমতা কি সে-দেশী প্রতিরোধ-আন্দোলনের হাতেই আসছে না? নাৎসি অধিকারের মধ্যেই এই আন্দোলন গড়ে ওঠে মুক্তিকামী স্থানীয় সকল দলের মিলনে ও দেশের সাধারণ লোকের সমর্থনে। বিলাতের 'টাইম্‌স্' পত্রিকা পর্যন্ত স্বীকার করেছে যে মুক্ত দেশগুলিতে প্রতিরোধ-আন্দোলনের হাতেই রাজ্যভার থাকা উচিত। Legitimism-এর দোহাই দিয়ে সাম্রাজ্যতন্ত্রী মহলে চেষ্টা চলেছে এর বদলে যুদ্ধপূর্ব যুগের আধ-ফাশিস্ট্ গভর্ণমেণ্টগুলিকে ফিরিয়ে আনা। বাঙালী মধ্যবিত্ত কোন যুক্তিতে সে-প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবে? প্রতিরোধ-আন্দোলনের সহানুভূতি স্বভাবতই আছে রাশিয়ার দিকে, সেজন্য তাকে সোভিয়েটের তাঁবেদার বলা চলে না। দেশের মধ্যে ধনিক প্রভৃতি যারা নাৎসিদের সহায় হয়েছিল, প্রতিরোধ-আন্দোলনের পক্ষে তাদের প্রতি খড়্গহস্ত হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক—এর মধ্যে রুশ চক্রান্তের সন্ধান নিরর্থক। জাতি হিসাবে পোল্যাণ্ডের পূর্ব অঞ্চল যে শ্বেত-রাশিয়া ও ইউক্রেনের সঙ্গে যুক্ত, এ কথা ব্রিটিশ মন্ত্রী কার্জনের নির্দেশেই স্থির হয়েছিল; পোলিশ নেতারা সে-সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে পূর্ব প্রদেশ দখল করেন। আজ সে-ব্যবস্থা উল্টে দিতে আপত্তি উঠছে কেন? ইরানে রুশদের হস্তক্ষেপে ইংরাজ ও মার্কিন তেল-কোম্পানিরা

বিচলিত হয়ে উঠছে, জনমত কিসের স্বার্থে তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে যাবে? লাট্‌ভিয়া বা লিথুয়ানিয়ায় মুষ্টিমেয় শাসক সম্প্রদায়ের অধিকারের দাবি বড়, না সেখানকার জনসাধারণের অভ্যুদয়ের কথা বড়?

পৃথিবীর নানা অংশে আজ যে-সব ঘটনা ঘটছে, সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে আন্তর্জাতিক বৈঠকে যার ঘাতপ্রতিঘাত দেখা যাচ্ছে, তার যথার্থ বিচার করতে হলে এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গী দরকার যার সঙ্গে সারা জগতের প্রগতিবাদের একটা সামঞ্জস্য থাকে। আমাদের দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে সেই দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করতে হবে। যুদ্ধের পর শান্তিরক্ষার কি ব্যবস্থা হতে পারে, একদিকে ধনতন্ত্র ও অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের পাশাপাশি থাকবার যুগে কোন বাস্তব নীতি প্রগতিবাদকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, সকল দেশের জনসাধারণের স্বার্থকে কি উপায়ে রক্ষা করে চলতে হবে,—এ সব আলোচনার জন্য অবশ্য স্বতন্ত্র প্রসঙ্গের প্রয়োজন।

॥ পরিচয়: বৈশাখ, ১৩৫২ (১৯৪৫) ॥

যোগী ও 'কমিসার'

আর্থার কেস্‌লারের লেখা এই প্রবন্ধসমষ্টি গত বৎসর নানা দেশে বুদ্ধিবাদী মহলে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করে। বামপন্থী লেখক হিসাবে কেস্‌লার খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, স্পেনের অন্তর্যুদ্ধে তিনি প্রগতিশীলদের দলে লড়েছিলেন, **concentration camp**-এর নরক-যন্ত্রণা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল। এ-হেন ব্যক্তি যখন ঘোষণা করলেন যে সোভিয়েট রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র নির্মূল হয়ে গেছে, তখন অনেকে চমকে ওঠে, অন্যদের পক্ষে আবার উল্লাস চেপে রাখা শক্ত হয়ে উঠল। সোভিয়েট-বিরোধী একটা মনোভাব গত দুই বৎসরে আবার নানা দিকে মাথা তুলেছে—এ কথা সকলেরই জানা আছে। এর আসল কারণ যাই হোক না কেন, তর্কের রাজ্যে তার প্রধান অবলম্বন বার্ণ্‌হাম্‌-এর লেখা **Managerial Revolution** বইখানি। তবে সে-বই একটু বেশি পণ্ডিতি ধরনের, তাই বহুল প্রচারের জন্য একটি সরস পুস্তকের প্রয়োজন ছিল। বলা বাহুল্য যে, এখন কেস্‌লারের উক্তিগুলি সোভিয়েটের সকল সমালোচকদের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াবে এবং এদেশেও তার অন্যথা হবে না। চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেরই তাই আলোচ্য গ্রন্থটি যাচিয়ে দেখা দরকার।

আর্থার কেস্‌লারের লেখা প্রাঞ্জল, সুখপাঠ্য, চিত্তাকর্ষক। বইখানির অনেক প্রবন্ধই চিন্তার খোরাক জোগায়; কয়েকটিকে লেখা-হিসাবে সার্থক রচনা বলা চলে। কিন্তু তাঁর আসল বক্তব্য যে **Soviet Myth and Reality** নামক রচনাটি তাতে কোনও সন্দেহ নাই, গ্রন্থের মধ্যে এরই দিকে সকলের চোখ পড়বে। কেস্‌লারের সকল যুক্তি ও সিদ্ধান্তের পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা করতে গেলে বই লিখতে হয়। এখানে কেবল কয়েকটি কথার অবতারণা করা সম্ভব।

The Yogi and the Commissar—by Arthur Koestler (Jonathan Cape)

রুশ বিপ্লবের মতন বিরাট ব্যাপারকে কলমের খোঁচায় উড়িয়ে দিতে গিয়ে কেস্‌লার প্রসঙ্গক্রমে ইতিহাস নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করেছেন। প্রথমে তারই কিছু নমুনা নেওয়া যাক।

গত মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ার অত্যাশ্চর্য প্রতিরোধ-শক্তিতে বিস্মিত হয়ে স্বভাবতই লোকের মনে হয়েছিল যে এর মূলে রয়েছে সোভিয়েটের নূতন সমাজব্যবস্থা। এই ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করে কেস্‌লার বলেছেন যে আসলে রুশ সৈন্যেরা বরাবরই খুব ভাল লড়তে অভ্যস্ত—যুদ্ধজয়ের কারণ এই লড়বার শক্তি, দেশের প্রাকৃতিক আবহাওয়া ইত্যাদি (১৩৭-১৪১ পৃষ্ঠা)। তিনি ভুলে গিয়েছেন যে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সমলোচকদের প্রচার চলেছিল যে, সংকট উপস্থিত হলেই সোভিয়েট ব্যবস্থা তাসের ঘরের মতন ভেঙে পড়বে, সাধারণ লোকে বিদ্রোহী হবে, বিভিন্ন অঞ্চল আলাদা হয়ে যাবে ইত্যাদি। ১৮১২ সালে (বই-এ ১৮১৫ লেখা হয়েছে) নেপোলিয়ানকে হারানোর নজির দেখানো হয়েছে কিন্তু ক্রিমিয়া-অভিযান, রুশ-জাপানের যুদ্ধ ও প্রথম মহাযুদ্ধে অত্যাচারী অক্ষম জারতন্ত্রের পরাজয়ের কথা লেখক সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। তাছাড়া ১৯৪১ সালে হিটলারের প্রতাপ ১৮১২ সালের নেপোলিয়ানের যুদ্ধযাত্রার চাইতে যে অনেক বেশি সাংঘাতিক আকার নেয় সে কথা অস্বীকার করা চলে না।

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন যে নেপোলিয়ানের হাত থেকে রাশিয়ার আত্মরক্ষা ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের অভিযান। কিন্তু এ কথা কে না জানে যে ১৮০৭ সালের পর নেপোলিয়ানের যুদ্ধবিগ্রহ আর বিপ্লবের বিস্তার সূচক নয়, ফরাসী বুর্জোয়াদের অন্য দেশ লুণ্ঠনের চিহ্ন মাত্র। স্টালিনকে তাচ্ছিল্য করতে গিয়ে যে-লেনিনের প্রশংসা আজকাল ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছে, সেই লেনিনের **Socialism and War** পুস্তিকায় লেখা আছে যে, নেপোলিয়ানের আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সংগ্রাম ছিল মুক্তিযুদ্ধ, প্রসারশীল ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আজকের দিনের অনগ্রসর জাতির লড়াইয়ের

সামিল। পূর্ব ইয়োরোপে সার্ফ্‌দের মুক্তি দিতে নেপোলিয়ানের কোনই আগ্রহ ছিল না।

১২৮ পৃষ্ঠায় কেস্‌লার লিখছেন যে রুশ বিপ্লবের প্রথম দিকে বাস্তবিক বিপ্লব আনবার চেষ্টা হয়েছিল, স্টালিনের আমলে তার অবসান হয়েছে; প্রথম দিকে তাই লোকে সোভিয়েটকে বিপুল অভিনন্দন জানায়। গ্রন্থকারের কি এই সামান্য সত্যটুকুও জানা নেই যে বিপ্লবের পর বহু বৎসর ধরে বিকৃত ব্যাখ্যা ও অপপ্রচারের স্রোত লোকের মনকে প্লাবিত করে রেখেছিল? জীবদ্দশায় লেনিনকে কি সেদিনের 'বামপন্থী'দের অজস্র আক্রমণ সহ্য করতে হয় নি? বিপ্লবের প্রথম তিন বৎসরের মধ্যে 'নিউ-ইয়র্ক টাইম্‌স্‌' পত্রিকা ৯১-বার খবর দেয় যে সোভিয়েটের পতন আসন্ন। সেই সময়েই প্রথম ধুয়া ওঠে যে বল্‌শেভিজ্‌ম্‌ হার মেনে পিছু হটছে। সাম্প্রতিক ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেরই জানা আছে যে কেস্‌লারের অগ্রগামীদের সংখ্যা অসংখ্য।

লেখকের মতে আর্থিক অবস্থায় অগ্রসর দেশেই প্রথম সোশালিজ্‌ম্‌ প্রতিষ্ঠিত হবে, সমাজবাদের থিওরি নাকি এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত (১৯১ পৃষ্ঠা)। তিনি লেনিনকে সোশালিস্ট্‌ বিপ্লবী হিসাবে অস্বীকার করেন নি, এ বিষয়ে লেনিনের কি মত ছিল তাও কি তাঁর অজানা? মার্ক্স্‌ বা এঙ্গেল্‌স্‌-ই বা কোথায় এমন কথা লিখেছেন?

গত দশ বৎসরে নাকি সোশাল ডেমক্র্যাটেরা অনেকবার বিপ্লবী পথে এগিয়ে গেছে (২০৪ পৃষ্ঠা)। কবে, কোথায়?—লেখক সে-সম্বন্ধে নীরব। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত নাকি সোভিয়েট রাশিয়া মিত্রপক্ষীয় পশ্চিমের দেশগুলির বিরুদ্ধাচরণ করে (১৫১ পৃষ্ঠা)। ইংরাজ ও ফরাসী সরকারের আপোস নীতি, রাশিয়ার সঙ্গে অসহযোগ, স্পেনের ব্যাপার, মিউনিক—ইত্যাদি না হয় অবান্তর কথা। কিন্তু চেম্বারলেন ও দালাদিয়ের ফিন্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ, হিট্‌লারের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে এড়িয়ে যাওয়া, নাৎসিদের পূর্ব ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়ার দিকে উৎসাহ জোগানো—এ সব ব্যাপারে কেস্‌লার চুপ করে থাকাই সঙ্গত মনে করেছেন।

এক প্রসঙ্গে গ্রন্থকার একেবারেই নীরব নন—স্টালিন নাকি সব দিকেই বিপ্লবের আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়েছেন। এমনকি স্বয়ং পোপের দপ্তরের সঙ্গে রুশ সরকারের কথাবার্তা চলে (২০৩ পৃষ্ঠা)। কেস্‌লার হয়তো খবর রাখেন না যে ১৯২২-২৩ সালে, অর্থাৎ লেনিন-ট্রট্স্কির আমলেও, এর অনুরূপ আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। ১৯৩৪-এর পপুলার ফ্রন্ট্ আন্দোলন সমর্থনের কারণ নাকি রুশ-ফরাসী চুক্তিপত্র (২০৩ পৃষ্ঠা)। আসলে পপুলার ফ্রন্ট্ প্রথমেই গড়ে উঠেছিল, ফ্রান্সের সঙ্গে যখন রাশিয়ার সখ্যবন্ধন হয় তারপর—১৯৩৫ সালে।

অন্যপ্রসঙ্গেও, কেস্‌লারের ঐতিহাসিক নজির কম কৌতূহলজনক নয়। হিট্‌লারি জার্মানিতে নাকি জমিদার য়ুঙ্কার ও ধনিকদের ক্ষমতা ধ্বংস পেয়েছিল (১৮৯ পৃষ্ঠা)। সেই জন্যই বোধ হয় মহাযুদ্ধের শেষে হিট্‌লারের পতনের পরও বড় জমিদারী ও বড় ব্যবসা ভাঙা বা নিয়ন্ত্রিত করাই প্রধান সমস্যা দাঁড়িয়েছে। ইংরাজ ও পর্টুগীজদের মধ্যে সন্ধিবন্ধনের পিছনে নাকি শক্তির ভারসাম্য দেখা যায় (২১১ পৃষ্ঠা), পূর্ব-ইয়োরোপের দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়ার চুক্তি অবশ্য সাম্রাজ্যবিস্তারের নামান্তর। এর পর পাঠকের অবশ্য অভিভূত হয়ে পড়া ছাড়া উপায় কি ?

ইতিহাসের আলোচনা আলোচ্যগ্রন্থের আসল বিষয় নয়। এবার তাই সোভিয়েট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নালিশের দিকে ফেরা যাক। কেস্‌লার এসম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেছেন, তাঁর সহায় ছিলেন শ্রীমতী মার্গারেট ভেওয়ার। গবেষণার ধরনটি সুপরিচিত। একটির পর একটি 'ফ্যাক্টের' নজির আছে, কিন্তু কি অবস্থায় কোন ব্যবস্থা হয়েছিল তা বুঝবার চেষ্টা নেই। ফ্যাক্টগুলিও বাছাই-করা, অর্থাৎ যেগুলি সম্বন্ধে বাইরে ভুল বোঝার সম্ভাবনা, সযত্নে শুধু সেইগুলিই উদ্ধার করা হয়েছে। অন্য ধরনের নজির সমস্ত একেবারে বাদ পড়েছে ; বাছাই ইচ্ছাকৃত, নিশ্চয়ই অজ্ঞতাপ্রসূত নয়। সমগ্রভাবে দেখবার বিজ্ঞানী মূলসূত্রের এখানে অপলাপ ঘটেছে, ঐতিহাসিক একদেশদর্শিতার যে-পরিচয় আমরা ইতিমধ্যে পেয়েছি, তার সঙ্গে এর নিশ্চয়ই যোগ আছে।

সামান্য কথা দিয়েই আরম্ভ করছি। গ্রন্থকারের বিশ্বাস যে রাশিয়ার লোককে বিদেশ সম্বন্ধে এমন অজ্ঞ করে রাখা হয়েছে যে তারা ভাবে যে মাটির নিচে রেলপথ পৃথিবীতে এক মস্কোতেই আছে, (১৪৫ পৃষ্ঠা)। অথচ একথা সুবিদিত যে এই রেলনির্মাণের আগে রুশ বিশেষজ্ঞেরা যখন অন্যদেশের নানা সহরে মাটির নিচের রেলব্যবস্থা দেখতে যান তখন তাঁদের অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ নানা রুশ কাগজপত্রে বের হয়। বিদেশের সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে রুশেরা নাকি একেবারে অর্বাচীন (১৪৭ পৃষ্ঠা), ভুল খবর দিয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখা হয় যাতে নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে অসন্তোষ বেড়ে না যায়। অথচ অনেকেই জানে বিদেশী বই রাশিয়ায় হাজারে হাজারে বিক্রয় হয়, বিদেশী নাটক অভিনয় হয়, বিদেশের নানা ঘটনা আলোচনা, আন্দোলন, বাদানুবাদের উল্লেখ রুশ কাগজ-পত্রে পাওয়া যায়। দু'একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দোহাই পেড়ে রুশ দেশ সম্বন্ধে ভুল ধারণার প্রচার করাকে ঠিক সঙ্গত কাজ বলা চলে না।

শুধু বিদেশ সম্বন্ধে অজ্ঞতা নয়, সোভিয়েট সমাজ নাকি এখন অন্য জাতি সম্বন্ধে উদাসীন, আন্তর্জাতিক আন্দোলনের আদর্শ সেখানে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। সোভিয়েট পত্রিকা ও পুস্তিকা যেটুকু এদেশে পৌছায় তাতেই এ নালিশ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। কমিন্টার্ন-এর অবসান নাকি সমাজবাদ ত্যাগের চূড়ান্ত নিদর্শন (১২৬ পৃষ্ঠ.), অথচ অন্যত্র কেস্‌লারের যুক্তি এই যে কমিন্টার্ন ছিল রুশ স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র মাত্র। 'ইন্টারন্যাশনাল' গান এখন আর সোভিয়েটের জাতীয় সঙ্গীত নয়, কিন্তু তার সঙ্গত ব্যাখ্যা কি এই নয় যে গানটির পদগুলিতে ক্ষুধিত অত্যাচারিত জনগণকে বিদ্রোহী হবার যে-ডাক আছে তা সোভিয়েট সমাজের অগ্রগামী পরিবেষ্টনে এখন সেখানে অপ্রযোজ্য হয়ে পড়েছে? পার্টির বৈঠকে বিপ্লব বিস্তারের প্রসঙ্গে সে-গান এখনও গাওয়ার রীতি আছে। প্রাচীন রুশ সেনাপতিদের স্মৃতিপূজায় কেস্‌লারের ঘোর আপত্তি, কিন্তু আততায়ীর বিরুদ্ধে দেশরক্ষার জন্যই তাঁদের খ্যাতি, এবং সুভোরভের রণকৌশল কি তাঁর দেশবাসীর কাছে গর্বের

কথা নয়? দেশরক্ষী বীরদের বন্দনা করতে গিয়ে লোকেরা মার্ক্স্‌, এঙ্গেল্‌স্‌ প্রভৃতিকে ভুলে গেছে (১৯৭ পৃষ্ঠা)—এ কথা মিথ্যা প্রচার; সমাজবাদের প্রামাণ্য লেখাগুলি রাশিয়ায় লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ছাপা ও বিক্রয় হয় তার প্রমাণ আছে।

গ্রন্থকারের মতে সোভিয়েট সৈন্যদলের মধ্যে বিপ্লবী ছাপ এখন মুছে গেছে, প্রমাণ—১৯৪৩ সালে পোলিটিকাল কমিসার পদ উঠিয়ে দেওয়া (১৯৬ পৃষ্ঠা)। রেড আর্মি সংগঠনের প্রথম যুগে সেনাধ্যক্ষদের নজরে রাখার জন্য এই কমিসারদের নিয়োগ হয়েছিল, তারপর শতাব্দীর চতুর্থ দশকে মনে হয় এর প্রয়োজন শেষ হয়েছে, আবার তুকাচেভ্‌স্কির ষড়যন্ত্রের পর কমিসার নিয়োগ হয়, এখন নূতন যুগের নবীন অফিসারদের প্রাচুর্যে এর আর বিশেষ সার্থকতা নেই—এ সব ফ্যাক্ট্‌ অবশ্য কেস্‌লারের কাছে অবাঞ্ছিত। তিনি বলেন যে সাধারণ সৈনিকেরা শোষিত নিষ্পেষিত আজ্ঞাবাহী দাসমাত্র, প্রমাণ—অধ্যক্ষদের তুলনায় তাদের মাহিনা কম (১৬৬ পৃষ্ঠা)। আসলে অফিসারদের অনেকের জীবিকার বৃত্তি সৈন্যদলে স্থায়ী কাজ, বেতনের হারও তাই উচ্চ। পক্ষান্তরে সাধারণ সৈনিকেরা সকলেই অল্পদিনের জন্য সৈন্যদলে আসে, তাদের মাহিনা অনেকটা হাত-খরচের মতন, তাদের পরিবার-পরিজন আলাদা সরকারী বৃত্তি পায়, নির্দিষ্ট সময়ের পর প্রত্যেক সৈনিকের নিজস্ব উপার্জনের সরকারী ব্যবস্থা আছে।

সোভিয়েট আমলে সাধারণ লোকের নাকি দুর্দশার শেষ নাই। কেস্‌লারের প্রধান প্রমাণ এখানে কয়েকটি আমেরিকান হিসাব (১৬৪ পৃষ্ঠা), যাতে মনে হয় যে জারের আমলের তুলনায় পর্যন্ত সাধারণ লোকের খাওয়া-পরার মান এখন নিম্নতর। কেস্‌লার বল্‌ছেন যে এ-হিসাবের কোনও দিন প্রতিবাদ হয় নি। অথচ U.S.S.R. Speaks for Itself নামক সুবিখ্যাত পুস্তিকার জনস্বাস্থ্য প্রবন্ধে সরকারী হিসাবে দেখতে পাই সম্পূর্ণ অন্য সিদ্ধান্ত। কাজের পরিমাণ বাড়ার কারণ তো অতি সুস্পষ্ট, আত্মরক্ষা ও শক্তি বৃদ্ধির আবশ্যকীয় আয়োজনে অন্য উপায় ছিল না। অতঃপর

কেস্‌লার বলছেন (১৮৮ পৃষ্ঠা) জনসংখ্যার দশভাগের একভাগ বন্দী অবস্থায় কঠোর পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত আছে, প্রমাণ, সমালোচকদের অন্তর্দৃষ্টি, আর কিছু নয়। বন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচারের সাক্ষী লুসিয়েন ব্লিট নামক কেস্‌লারের জনৈক বন্ধু (১৮৩ পৃষ্ঠা)। দুঃখের বিষয় এই ব্লিটের স্বরূপ ইতিপূর্বেই চেক, পোল ও আমেরিকান কাগজে প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

কেস্‌লারের বিশ্বাস যে সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বনাশ হয়ে গেছে, কেন না উচ্চশিক্ষার জন্য এখন মাহিনা দিতে হয় (১৫৬ পৃষ্ঠা)। শ্রীমতী কিং-এর প্রসিদ্ধ পুস্তিকায় এসম্বন্ধে যে-বিশদ আলোচনা আছে, কেস্‌লার অবশ্য তার অনুসরণ করেন নি। চৌদ্দ বৎসর পযন্ত সমস্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক, তারপর ফি নেওয়ার ব্যবস্থা—কিন্তু যারা কৃতী ছেলে তাদের মাহিনা লাগে না। অনেক পরিবারের উপার্জন বাড়ার ফলে ফি দেওয়া অনেকখানি সহজ হয়ে এসেছে, নানা দিকে খরচের জন্য সরকারী ব্যয়-সংকোচেরও খানিকটা প্রয়োজন আছে। শুধু টাকার জোরে উচ্চশিক্ষা কারও ভাগ্যে জোটে না, পদে পদে প্রতি বৎসরে যোগ্য ছাত্রদেরই বাছাই করার ব্যবস্থা রয়েছে। সকল ছাত্রের জীবিকা উপার্জনের সরকারী ব্যবস্থার কথাও এখানে ভুললে চলবে না। শিক্ষা-সংকোচের কোন কথাই ওঠে না। সরকারী হিসাবে দেখি যে ১৯৪১-৪২ সালে আয়োজন হয়েছিল (যুদ্ধে বাধাপ্রাপ্তির আগে) যাতে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা একবৎসরে শতকরা সাড়েতিন বাড়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা তের। কেস্‌লারের আক্ষেপ এই যে (১৫৮-১৫৯ পৃষ্ঠা) 'পেডাগগি' শিক্ষা-প্রণালী এখন পরিত্যক্ত হয়েছে, স্কুলে নিয়মানুবর্তিতার উপর এখন ঝোঁক বেশি, স্কুলের উচ্চশ্রেণীতে ছেলেমেয়ের সহশিক্ষা উঠে গেছে। সোভিয়েট শিক্ষকেরা কয়েক বৎসর হাতে-কলমে কাজের পর শিক্ষাপদ্ধতির যদি কিছু কিছু সংশোধন করেন তাতে বিচলিত হবার কিছু দেখি না। শিক্ষাব্যাপারে কি অমোঘ অভ্রান্ত নিয়ম-কানুন আছে? এ-জাতীয় বিশেষ কোনও শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে সমাজতন্ত্রকে অভিন্ন মনে করা কি হাস্যাস্পদ নয়?

তারপর আসে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কথা। উপার্জনের তারতম্য সমাজবাদের বিরোধী—এই প্রচার এক সময়ে চলেছিল, তার উত্তর মার্ক্স্-এর Critique of Gotha Programme এই পাওয়া যায়। কেস্‌লার অগত্যা মেনে নিয়েছেন যে সকলের সমান আয় সমাজতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ নয়। সোভিয়েট দেশে উৎপাদনের উপায় কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় এটাই আসল কথা। উন্নততর কাজের দরুন উপার্জন বেশি হলে স্বচ্ছন্দতর জীবনযাত্রা সম্ভব, কিন্তু উদ্বৃত্ত টাকা সরকারের হাতেই তুলে দিতে হয়, প্রাইভেট ব্যাঙ্ক্ বা ব্যবসা-বাণিজ্যের অবকাশ নেই। কেস্‌লারের আপত্তি এই যে উত্তরাধিকার-প্রথা একসময় বে-আইনী ছিল, এখন সে-বাধা উঠে গেছে (১৫৭ পৃষ্ঠা)। দেশে যতদিন ধনতান্ত্রিক সম্পত্তি, অর্থাৎ জমি, যন্ত্র ইত্যাদি উৎপাদনের উপাদানের উপর ব্যক্তিবিশেষের দখল ছিল, ততদিন উত্তরাধিকার-প্রথাকে দমন করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। এখন আর তার প্রয়োজন নেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একের উপার্জন অন্যকে বঞ্চিত করার পদ্ধতি নয়, উন্নততর কাজের মাত্রার পুরস্কারের অর্থ এ নয় যে সে-সম্পদ অপরকে পরিশ্রম করে জোগাতে হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য শেষ অভিযোগ (১৭১ পৃষ্ঠা) এই যে, সোভিয়েট আইন-কানুন এখন প্রতিক্রিয়াভিমুখী। এখানেও দেখি বিশেষ অবস্থার সন্ধান না রাখা এবং ভুল ব্যাখ্যার পালা। ১৯৩২ সালের কঠোর দণ্ডবিধির কারণ তো সুস্পষ্ট —কুলাকশ্রেণীর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে রাষ্ট্রের সম্পত্তি, কলকারখানা, গরু-ঘোড়া বিপন্ন হয়ে পড়ে। গত দশকের বিপজ্জনক পরিস্থিতি নির্বিঘ্নে কাটানোর এতে সাহায্য হয়েছিল, অপরাধের সরকারী হিসাবে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিবাহবিচ্ছেদ (১৭৫ পৃষ্ঠা) এখন অ-সহজ করা হয়েছে, তার কারণও কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা। বাস্তব জীবনের নানা সমস্যার জন্য আইনের অদল বদল সোভিয়েট-সমাজের পক্ষে কেন যে নিন্দনীয় হবে বোঝা শক্ত। এ জাতীয় আইন-কানুন সর্বদাই সাময়িক, বিশেষ কোনও ব্যবস্থাকে তাই যথার্থ বিচার করতে হলে বিশেষ অবস্থা ও সমাজের সমগ্র

ছবিটুকু মনে রাখা প্রয়োজন। দুঃখের কথা কেস্‌লারের দেখবার ভঙ্গীটুকু বিজ্ঞানসম্মত নয়।

এ-মন্তব্যের আরও প্রমাণ আছে। উপরে যে-নালিশের উল্লেখ করেছি, গ্রন্থকার সে-সম্বন্ধে কিছু প্রমাণ জোগাড়ের চেষ্টা করছেন, শুধু সমস্ত ফ্যাক্ট্‌গুলি খুলে না ধরে কিছু কিছু বাছাই করে ভুল বোঝাবার চেষ্টা করেছেন মাত্র। কিন্তু এবার তাঁর কয়েকটি ব্যাপক সিদ্ধান্তের নমুনা দিই, এখানে দেখি কেবল কল্পনার দৌড়, ফ্যাক্টের সঙ্গে আর সংশ্রবমাত্র নেই।

১৭৬ পৃষ্ঠায় কেস্‌লার লিখেছেন যে বিবাহ হওয়া মাত্র সোভিয়েট নারীর একমাত্র কাজ সন্তান উৎপাদন। অথচ আমরা জানি যে ১৯৩৭ সালেই প্রায় এক কোটি মেয়ে উৎপাদনের নানা কাজে নিযুক্ত ছিল। নারী টেক্‌নিশিয়ান্‌-এর সংখ্যা এক লক্ষের কম নয়, মেয়ে ডাক্তারই ষাট হাজার। উচ্চশিক্ষার্থী মেয়ের সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ, সোভিয়েট-সমিতিগুলিতে প্রায় পনের লক্ষ মেয়ে সভ্য আছে, সোভিয়েট পার্লমেণ্টে প্রায় দুইশত নারী ডেপুটি।

২০৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলেছেন যে সোভিয়েট দেশে মানুষের মর্যাদা নেই সোভিয়েট জীবনের নানামুখী বিকাশ, সেখানে নূতন প্রাণের স্পন্দন সম্বন্ধে বহুলোকের বহু অভিজ্ঞতাকে লেখক এক কথায় উড়িয়ে দিয়েছেন। সোভিয়েট সমাজ নাকি চলছে স্বেচ্ছাচারী শাসকদের গুপ্তপুলিশের ইঙ্গিতে। হাজার হাজার সোভিয়েটের কাজকর্ম, শত শত ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যম, কারখানা ও ফার্মের মধ্যে উৎপাদনের প্রতিযোগিতা, সাধারণ লোকের নানা কাজে অদম্য উৎসাহ, মহাযুদ্ধে জনসাধারণের প্রচণ্ড প্রতিরোধ এই সমস্ত ব্যাপারের এত সহজ কারণনির্ণয় অসাধারণ প্রতিভার নিদর্শন বটে।

রাশিয়ায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা নেই এ-নালিশ অত্যন্ত মামুলী (১৬৮ পৃষ্ঠা)। কাদের স্বাধীনতা এবং কিসের স্বাধীনতার অভাব সে-কথা লেখক অবশ্য বিশদ আলোচনা করেন নি। তাঁর বিশ্বাস যে রুশ ট্রেডইউনিয়ন মজুরের স্বার্থ দেখে না, সেগুলি লোকদেখানো ভড়ং মাত্র। নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি

ছাড়া অন্য দল নেই, অথচ নানা প্রতিষ্ঠান যে অসংখ্য **non-party** লোককে নির্বাচনে দাঁড় করায় সে কথার উল্লেখ দেখি না। নির্বাচকেরা যে প্রতিনিধিকে যে-কোনও সময় পদচ্যুত করবার দাবি করতে পারে, সে সম্বন্ধেও গ্রন্থকার নীরব। স্টালিনের আমলে নাকি সমাজতন্ত্রের অবসান হয়েছে, অথচ আদি যুগে, লেনিন-ট্রট্স্কির সময়, ব্যক্তিস্বাধীনতার ধরনটা কি ছিল লেখক সে-প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মানুষের স্বভাব নির্ভর করে মার্ক্সের এই কথাকে বিদ্রূপ করে তিনি বলেছেন যে তাহলে রুশদেশে ট্রট্স্কিপন্থী প্রতিবিপ্লবীর আবির্ভাব হয়েছিল কি ভাবে (১৭৩-১৭৪ পৃষ্ঠা) ? সোভিয়েটের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কি তাহলে ধনতান্ত্রিক জগতের বিরোধী পরিবেষ্টনীটুকু বাদ পড়ে ?

কেস্‌লারের মূল সিদ্ধান্ত এই, বিপ্লবের প্রথম বছরদশেক অগ্রগতি দেখা যায় ; তারপর, অর্থাৎ ট্রট্স্কির পতনের পর, সমাজতন্ত্রের ক্রমান্বয় দ্রুত অবসান চোখে পড়ে (১৯৪ পৃষ্ঠা)। ফল এই দাঁড়িয়েছে যে সোভিয়েট দেশে অসাম্য ও সাধারণ লোকের উপর শোষণের চাপ ধনতান্ত্রিক দেশের অবস্থাকেও ছাড়িয়ে গেছে (১৬২ পৃষ্ঠা)। বাল্টিক অঞ্চলে নাকি সোভিয়েট শাসন আগেকার ব্যবস্থার চাইতে বেশি অত্যাচারী (২০৮ পৃষ্ঠা)। এমন কি, সাধারণ লোককে দাবিয়ে রাখার বিধি-বিধান ফাশিস্ট শাসনের চাইতেও খারাপ (১৬৬ পৃষ্ঠা)। সুকৌশলে এইসব প্রচারই কেস্‌লারের আসল প্রতিপাদ্য এ-কথা মনে করলে অন্যায় হবে না।

যে-সব তথ্য এই সিদ্ধান্তের পরিপন্থী, কেস্‌লার সযত্নে তাদের পরিহার করেছেন।

সামান্য কিছু নমুনা দিই। ১৯৩২ সালে **insured** মজুরের সংখ্যা ছিল সওয়া দুই কোটির নীচে—১৯৪০-এ তাদের সংখ্যা তিন কোটি ছাড়িয়ে যায়। ১৯৩৭ সালে সরকারী **social insurance budget**-এর পরিমাণ ছিল ৫৬৬ কোটি রুব্‌ল্‌, ১৯৪০-এ ৮৬২ কোটি রুব্‌ল্‌ খরচ হয়। শিশুদের জন্য স্কুলে খাওয়া ইত্যাদি অনেক কিছু বাদ দিয়ে সরকারী খরচ ছিল ১৯৩২-এ এক কোটি

চুরাশি লক্ষ, ১৯৪০-এর পরিমাণ বিয়াল্লিশ কোটি চৌষট্টি লক্ষ। ১৯৩২-এ স্বাস্থ্যাবাসের আরাম পেয়েছিল এগার লক্ষ মজুর, ১৯৪০ সালে তাদের সংখ্যা প্রায় চব্বিশ লক্ষ। মজুরদের খেলাধূলা, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ১৯৩২-এ সরকারী খরচ হয় সাড়ে তিন কোটি রুব্‌ল্‌-এর কিছু বেশী; ১৯৪০-এ খরচের পরিমাণ সাড়ে আঠারো কোটি রুব্‌ল্‌। হিসাবগুলি ট্রেডইউনিয়ন চালকসমিতির সরকারী বিবরণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

আরও হিসাব আছে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০-র মধ্যে মজুরদের মাহিনার তহবিল শতকরা পঞ্চাশভাগ বেড়ে গেছে। উপার্জনের হারও বেড়েছে বই কমে নি। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বাড়ার পরিমাণ হল এক কোটি। ১৯৩৭ সালে চব্বিশ লক্ষ ছোট শিশুকে নার্সারির সেবা দেওয়া সম্ভব হয়…ইত্যাদি।

মনে রাখতে হবে যে সোভিয়েট দেশে বিনামূল্যে সকলে ডাক্তারের চিকিৎসা পায়, বেকার-সমস্যা সেখানে লোপ পেয়েছে, বৃদ্ধ অথবা অক্ষম হয়ে পড়লে সকলেই সরকারী পেন্সন ভোগ করে, মাহিনাসহ মজুরদের ছুটির সুব্যবস্থা রয়েছে। মজুরদের জন্য যে-সব ব্যবস্থা তার অনুরূপ সমস্ত আয়োজন যৌথ-কৃষিফার্মের মধ্যেও দেখতে পাই। নরনারীর সমান অধিকার, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলের সমান মর্যাদা, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতির পরিপুষ্টি, শিক্ষার বিস্তার, প্রত্যেকটি কাজের কেন্দ্রে সহকর্মীদের বৈঠক ও আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি সম্বন্ধে কেস্‌লারের নীরবতা কি রহস্যজনক নয়? মধ্য-এশিয়ার পুনর্জন্ম সম্বন্ধে লেখক এক বর্ণও উচ্চারণ করেন নি।

গ্রন্থকার অবশ্য বলেছেন যে সোভিয়েট-ভক্তির একটা নেশা আছে, ভক্তেরা সত্যকে মানতে চায় না (১৩২-১৩৪ পৃষ্ঠা)। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে অন্তত অন্ধ বিদ্বেষের একটা নেশা আছে, তাতে সত্যের অপলাপ ছাড়া অন্য কিছু হয় না। সোভিয়েট দেশে স্বর্গরাজ্য এসেছে, সেখানে কোনও অন্যায় হয় না, নিন্দনীয় কিছুই নেই এমন কথা বলি না। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা কি এই নয় যে কেস্‌লারের মতন বাছাই-করা গবেষণা মিথ্যাপ্রচার মাত্র? কেস্‌লারের

বিশেষ নালিশের মধ্যে প্রমাণ জোগাড়ের চেষ্টা থাকলেও তাঁর মূল সিদ্ধান্তের দৌলতে ভিতরকার মতলবটুকু প্রকাশিত হয়ে পড়েছে বলা চলে।

তারপর বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা। কেস্‌লার নিজেকে বামপন্থী বলে ঘোষণা করেছেন, তাঁর শেষ কথা সমাজবাদের পুনর্জন্ম চাই (২২৬ পৃষ্ঠা) রাশিয়ায় নাকি সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে, এসেছে শুধু রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব, নতুন ধরনের মালিকিয়ানা; প্রমাণ হয়েছে আর্থিক ব্যবস্থায় সামাজিক অধিকার-প্রতিষ্ঠা আর সমাজতন্ত্র এক জিনিস নয়। সোভিয়েট দেশ আর্থিক সংগঠনে ধনতন্ত্র থেকে এগিয়ে গেছে, অন্য দিকে এমনই পিছিয়ে গেছে যে এখন ইংল্যাণ্ডেই নাকি আসল সোশালিজম্‌ নিকটতর (২২৪ পৃষ্ঠা)। লক্ষ্য করা উচিত যে এখানে ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী রূপ সম্বন্ধে গ্রন্থকার আবার সম্পূর্ণ নীরব। বার্নহামের অনুসরণে মার্ক্সবাদকেও তিনি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়েছেন। ১৮৯ পৃষ্ঠায় তিনি এঙ্গেল্‌স্‌-এর মতের দোহাই যে-ভাবে পেড়েছেন, এঙ্গেল্‌স্‌-এর আসল লেখা পড়ে দেখলে তাতে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হয়।

নূতন 'বামপন্থা'র তা হলে পথ কি? রাশিয়া নাকি সাম্রাজ্যবিস্তারে উদ্যত। গ্রীস, মধ্য-প্রাচ্য, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, চীনে সাম্রাজ্যতন্ত্র সম্বন্ধে কেস্‌লারের অবশ্য দুশ্চিন্তা দেখি না। তিনি প্রচার করছেন যে রাশিয়াকে আটকাবার একমাত্র উপায় হল শক্তভাবে রুখে দাঁড়ানো (২২২ পৃষ্ঠা), আপোস নীতিকে বর্জন করতে হবে (২২১ পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ পৃথিবীব্যাপী আজ যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত চলেছে রাশিয়াকে একঘরে করবার, যার আড়ালে তৃতীয় মহাযুদ্ধের মহড়ার সূত্রপাত হচ্ছে, চার্চিল সাহেব যার পুরোহিত— ধনতান্ত্রিক রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ায় সেই স্রোতে গা ভাসাবার নির্দেশ আসছে নবীন 'বামপন্থী' কেস্‌লারের লেখায়। বামপন্থার একটা বাজার-দর আছে, তার আশ্রয় নেওয়া মন্দ কি।

গ্রন্থকারের দুটি উক্তির প্রসঙ্গে এই সুদীর্ঘ সমালোচনা শেষ করি। ২২০ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন যে নাৎসিপ্রচারের ফলে রাশিয়া সম্বন্ধে লোকের ভক্তি বেড়েছে। কেস্‌লারি অভিমানেরও এই ফল হওয়া বিচিত্র নয়।

১৩৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে মধ্যপথে ঝুলতে গিয়ে আদর্শবাদীরাও অনেক সময় প্রতিবিপ্লবী হয়ে পড়ে। ভদ্রতার সীমানা অতিক্রম করলে বলা যায় যে আর্থার কেস্‌লারের মতন প্রতিভাশালী লেখকেরও সেই পরিণতি প্রায় সুনিশ্চিত।

॥ পরিচয় : শ্রাবণ, ১৩৫৩ (১৯৪৬) ॥

টয়েন্‌বির মতামত

প্রায় পনের বৎসর আগে আর্ণল্‌ড্‌ টয়েন্‌বির বিরাট গ্রন্থের প্রথম তিন খণ্ডের আবির্ভাব ঐতিহাসিকদের জগতে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। আমাদের দেশের ইতিহাসের ছাত্রদের মহলেও তখন তার ঢেউ এসে পৌঁছায়। তারপর ক্রমে ক্রমে সে-স্পন্দন থেমে এসেছে, প্রথম পরিচয়ের বিস্ময় কেটে গেছে। ক্লাসিক বা সনাতনী রচনা সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে সে-রচনা লোকে প্রশংসা করে কিন্তু পড়ে না। টয়েন্‌বির লেখা এখন খানিকটা সেই মর্যাদা পেয়েছে বলা চলে। ইতিমধ্যে আরও তিন খণ্ডের প্রকাশ টয়েন্‌বির দৃষ্টিভঙ্গীকে আরও পরিস্ফুট করে তুলেছে। সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য ছয় খণ্ডের একটা সংক্ষিপ্তসারও এখন পাওয়া যায়—তার সম্পাদক হলেন সামারভেল। মূল পরিকল্পনা তেরটি ভাগে বিভক্ত ছিল, তার মধ্যে মাত্র পাঁচটি ভাগ এখন পর্যন্ত পাঠকের হাতে আসা সত্ত্বেও টয়েন্‌বির বক্তব্য আজ পশ্চিম জগতে সুবিদিত।

দুই

বহুকাল ধরে ইতিহাসকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখার অভ্যাস আমাদের আচ্ছন্ন রেখেছে। এই গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারাটাই আর্ণল্‌ড্‌ টয়েন্‌বির প্রধান কীর্তি। তার বিষয়বস্তু হল মানুষের সমগ্র ইতিহাস। বিপুল আয়োজন ও অদম্য উৎসাহ নিয়ে এমন প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত কোনও ঐতিহাসিক তাঁর জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন নি, যদিও ইতিহাস সম্বন্ধে ব্যাপক দৃষ্টির ইঙ্গিত প্রসঙ্গক্রমে অনেকের লেখাতেই দেখা গেছে। ইঙ্গিতের রেখাকে পূর্ণচিত্রে ফুটিয়ে তুলতে হলে যে অগাধ পাণ্ডিত্য ও চিন্তার

প্রসার দরকার টয়েন্‌বির লেখায় সেই গুণ তাঁকে ইতিহাসে স্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর মতবাদকে গ্রহণ না করেও এ কথা বলা চলে, কেননা চিন্তার জগতে বিরাট পরিকল্পনা মাত্রেরই একটা স্থান আছে; তেমন কীর্তিকে মেনে না নিলেও মনে রাখতে হয়।

ইতিহাসকে সমগ্রভাবে না দেখবার অভ্যাসের মূলে রয়েছে যুগধর্ম—কথাটা টয়েন্‌বিরই নিজস্ব। পণ্যোৎপাদন-প্রণালী বর্তমান যুগে নানাভাগে বিভক্ত হয়ে বিশেষজ্ঞদের কাজ হয়ে দাঁড়ায়, ঐতিহাসিক-বিশেষের আলোচনার ক্ষেত্রও তেমনি ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। যে মম্‌সেন এক সময় এক বিশাল ইতিহাস রচনা করেছিলেন, পরিণত জীবন তিনি কাটালেন রোমান লিপিমালা ও শাসনপদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার মধ্যে। য়্যাক্টনের পরিকল্পনা ছিল স্বাধীনতা বিকাশের সমগ্র ইতিহাস রচনা করবেন, কিন্তু বিশেষজ্ঞের আদর্শ নিয়ে অগ্রসর হতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে উপাদান সংগ্রহের কাজেই জীবন অতিবাহিত হয়ে গেল। কেম্ব্রিজ ইতিহাসমালা অথবা লাভিস-এর গ্রন্থগুলিতে বিশেষজ্ঞরা ফ্যাক্টের পসরা সাজিয়ে বসেছেন, বিস্তারিত জ্ঞানলাভের জন্য তার অপরিহার্য মূল্য আছে, কিন্তু ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সমগ্র ধারণা খুঁজতে গেলে সেখানে হতাশ হতে হয়। ইয়োরোপ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের জ্ঞানকে ফিশার অল্পকথায় আমাদের সামনে তুলে ধরলেন, কিন্তু ভূমিকায় তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে ইতিহাসের সমগ্র রূপ দেখবার রস থেকে তিনি বঞ্চিত। প্রকৃত বিশেষজ্ঞের মতনই তার জন্য তাঁর কোন ক্ষোভ নেই।

অথচ মানুষের মনে ব্যাপক দৃষ্টির একটা আকাঙ্খা থেকেই যায়, থাকাটাই স্বাভাবিক। সাধারণ ঐতিহাসিক তাতে সাড়া দেন না, নিজস্ব বিষয়ে তাঁর জ্ঞান এতো বেশি যে তা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য, আর তার বাইরের ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি উদাসীন। ইতিহাসের ব্যাপক ব্যাখ্যার আবার বিপদ আছে, জ্ঞানের অভাবে সেখানে ব্যাখ্যা অনেক সময় একদেশদর্শিতায় ব্যর্থ হয়ে যায়। টয়েন্‌বির ব্যক্তিগত কৃতিত্ব এই যে, তাঁর মধ্যে বিস্তারিত

জ্ঞান ও মৌলিক প্রতিভার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। অবশ্য জ্ঞান ও প্রতিভা সব সময়েই সীমাবদ্ধ, তাই টয়েন্‌বির ব্যাখ্যায় ভুল হওয়াটা বিচিত্র নয়। কিন্তু যে-পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা তাঁকে দুঃসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত করেছে তার জন্য ইতিহাসের সকল ভক্তই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

তিন

ইতিহাসের ব্যাপক আলোচনার মধ্যে আবার টয়েন্‌বি অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থার অনুসরণ করেন নি, মানবসভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা তাঁর লক্ষ্য নয়। তাঁর লেখাকে এইচ্ জি ওয়েল্‌সের সমগোত্রীয় বলা চলে না, সমাজ-জীবনের বাহ্যিক ঘটনার বিবৃতি অথবা মানুষের কীর্তির কাহিনী তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার বিষয়বস্তু নয়। তাঁর উদ্দেশ্য ইতিহাসের গতির তুলনামূলক বিচার, সভ্যতার উত্থান-পতন সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ সত্য বা নিয়মের নির্ধারণ। তিনি ইতিহাসের বিবরণ লিখতে প্রবৃত্ত হন নি, ইতিহাসের বিশ্লেষণ করেছেন, তার একটা বিশেষ ব্যাখ্যা ফুটিয়ে তুলেছেন। এ পথের বিপদ অশেষ। অল্পজ্ঞানের ফল এখানে মারাত্মক, কিন্তু সারা জীবনের সাধনা তাঁকে অনেকাংশে রক্ষা করেছে। ব্যাপক ব্যাখ্যা অতি সহজেই দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে, কিন্তু টয়েন্‌বির লেখার প্রাঞ্জলতা পাঠকের মন মুগ্ধ করে। অবশ্য ইতিহাসের সমগ্র রূপ অথবা ধারা সম্বন্ধে একমত হবার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প। ইতিহাসের ব্যাখ্যা গড়ে ওঠে বিশেষ কোনও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর, দৃষ্টিভঙ্গী নির্ভর করে ব্যক্তি, জাতি, অথবা শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের উপর।

তাই টয়েন্‌বির উদ্যমের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসার পরও তাঁর বিশিষ্ট মতবাদকে অগ্রাহ্য করা শুধু সম্ভব নয়, স্বাভাবিক-ও। তবে মত খণ্ডনের চেষ্টার আগে মতকে বোঝার চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত।

আজকের দিনে এই ধারণা বদ্ধমূল যে দেশ বা জাতিবিশেষ ইতিহাসের সার্থক আধার। টয়েন্‌বি প্রথমেই দেখিয়েছেন যে, ইংল্যাণ্ডের মতন তথাকথিত স্বতন্ত্র দেশের জীবনেও প্রধান ঘটনাবলী বুঝতে হলে দেশের

বাইরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা না জানলে চলে না। কোনও দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ নয়, অংশবিশেষের পরিচয় পেতে গেলে একটা বৃহত্তর সমগ্রতার রূপ উপলব্ধি করতে হয়। কিন্তু এই বৃহত্তর ক্ষেত্র জগদ্ব্যাপী হবার প্রয়োজন দেখা যায় না। অর্থাৎ, ইংল্যাণ্ড্‌কে বুঝতে গেলে সারা জগতের ইতিহাস জানতে হবে এমন কথা নিরর্থক। এক কথায়, কোনও একটা দেশ বা জাতি ঠিক স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, একটা বৃহত্তর সভ্য সমাজের মধ্যে তার স্থান রয়েছে। কিন্তু সারা জগতে তেমন সমাজ সংখ্যায় একাধিক; একই সময় পৃথিবীতে পাশাপাশি কয়েকটি সভ্য সমাজ থাকতে পারে। প্রত্যেক সভ্য সমাজের একটা বিশেষ সত্তা আছে, পরস্পরের থেকে তারা স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে বোধগম্য। কিন্তু প্রতি সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলি একের সঙ্গে অপরে গভীর যোগসূত্রে বাঁধা, তাদের মিলন অত্যন্ত নিবিড়।

টয়েন্‌বির মতে আজকের দিনে সারা জগতে পাঁচটি সভ্য সমাজের অস্তিত্ব চোখে পড়ে—পাশ্চাত্ত্য জগৎ, পূর্ব ইয়োরোপের সনাতনী খৃস্টীয় সমাজ, মুসলিম জাতিগুলি, হিন্দু সভ্যতা এবং সুদূর প্রাচ্য। তালিকায় দ্বিতীয় ও শেষ সমাজ দুটিকে আবার বিভক্ত করা সম্ভব। খৃস্টান সনাতন সমাজের দুই অংশ—দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপ ও রুশ অঞ্চল। সুদূর প্রাচ্যেরও দুই ভাগ—চীন এবং জাপান-কোরিয়া। বর্তমান সভ্য সমাজের সংখ্যা তাই সাতও বলা চলে। অবশ্য পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা আজ পৃথিবী গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে, আমরাও তাই এখন 'এক জগৎ'-এর কথা বলে থাকি। কিন্তু এই ঐক্য আর্থিক ও রাষ্ট্রিক, তার ঝোঁক নিতান্তই সাম্প্রতিক ও অসম্পূর্ণ। সভ্যতার প্রাণ হল এক বিশেষ ধরনের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতিগত ঐক্য এখনও সুদূরপরাহত।

কিন্তু কোনও সভ্য সমাজ চিরস্থায়ী নয়; সমাজেরও জন্ম, বৃদ্ধি, স্থবিরতা ও ধ্বংস আছে। এখনও য়িহুদি অথবা পার্শীদের মতন গোষ্ঠী চোখে পড়ে যারা আগেকার কোনও সমাজের 'ফসিল' (fossil) মাত্র। সুতরাং

ইতিহাসের বিশ্লেষণে দ্বিতীয় ধাপ এই পূর্বতন সভ্য সমাজগুলির অনুসন্ধান। সভ্য সমাজ কথাটার উপর জোর পড়ে এইজন্য যে এদের নিয়েই ইতিহাসের কারবার। মনুষ্যজাতির জীবনে অবশ্য অগণিত সমাজের সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্যে বেশির ভাগই অসভ্য সমাজ। অসভ্য সমাজের নিদর্শন আজ পর্যন্ত অসংখ্য বর্বর গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তারা ইতিহাসের বাইরে। ইতিহাসের বিষয়বস্তু হল জীবিত কি মৃত সভ্য সমাজের আলোচনা।

টয়েন্‌বি আজকের দিনের সাতটি ছাড়া অতীতে আরও চৌদ্দটি বড় সভ্য সমাজের সন্ধান পেয়েছেন। মোট এই একুশটি সমাজ নিয়ে তাঁর তুলনামূলক আলোচনা। এদের উৎপত্তি, বিকাশ, বার্ধক্য ও মৃত্যু সম্বন্ধে সাধারণ সত্য বা নিয়ম আবিষ্কার তাঁর লক্ষ্য। যে পাঁচ ভাগ অথবা ছয় খণ্ডে তাঁর রচনা এখন পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করেছে তার মধ্যে তাঁর বক্তব্য এই সাধারণ নিয়মেরই সবিস্তার ব্যাখ্যা।

সভ্যতা মূলত এক, এই ধারণাকে টয়েনবি খণ্ডন করেছেন। তাঁর মতে এ ধারণার হেতু হল আজকের দিনে পশ্চিমের জগদ্ব্যাপী আর্থিক ও রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ব। পশ্চিমী ঐতিহাসিকেরা অন্য সভ্যতার খোঁজ রাখেন না, অন্য সংস্কৃতির উপর তাঁদের শ্রদ্ধা নেই কিন্তু সভ্য মানুষের ষাট শতাব্দীব্যাপী ইতিহাসে বিভিন্ন সংস্কৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে এবং আজকের দিনের তথাকথিত ঐক্যও সম্পূর্ণ স্থায়ী হবে কি না সন্দেহ। বলা বাহুল্য যে, টয়েন্‌বির দৃষ্টিভঙ্গীতে এক সাধারণ উৎস থেকে বিভিন্ন সভ্যতার উৎপত্তির ধারণারও স্থান নেই, প্রাচীন মিশর থেকে আদি সভ্যতা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এই **diffusionist** মতবাদ তিনি একেবারেই অগ্রাহ্য করেছেন।

ঠিক আর একদিক থেকে আপত্তি আসতে পারে যে সভ্যতা মূলত বহুধা হলে তাদের মধ্যে কি তুলনা চলে? টয়েন্‌বি বলেন যে মানুষের তিন লক্ষ বৎসর অস্তিত্বের মধ্যে সভ্যতার বয়স মাত্র ছয় হাজার বৎসরের বেশি নয়।

সুতরাং এক হিসাবে সকল সভ্য সমাজই সমসাময়িক। আর মূল্য বিচারের দিক থেকে একদিকে অসভ্য অবস্থা ও অন্যদিকে মানুষের যে-চরম সিদ্ধি সম্ভব এই দুই-এর তুলনায় প্রায় সকল সভ্যতার কীর্তিই প্রায় একই স্তরের ব্যাপার। ইতিহাসে বিভিন্ন ঘটনার পরিবেশ স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু টয়েন্‌বির মতে ঘটনার আলোচনা করতে করতে ঐতিহাসিক একটা সাদৃশ্যজ্ঞান অর্জন করেন, তার উপরই তুলনামূলক বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

চার

ইতিহাসে অনেক সভ্য সমাজের সন্ধান পাওয়া যায়, এবং তাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ সম্ভব। কিন্তু এরা কি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সম্পর্কহীন সত্তা? সামান্য আলোচনা থেকেই বোঝা যায় যে দুটি সভ্য সমাজের মধ্যে নিবিড় যোগ থাকা বিচিত্র নয়। যোগাযোগের প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত ইয়োরোপের ইতিহাসে সুস্পষ্ট। কারণ, প্রাচীন গ্রীস রোমের সঙ্গে আধুনিক ইয়োরোপের অঙ্গাঙ্গি যোগ আছে অথচ এই দুই সভ্যতাকে এক বলা চলে না। এক্ষেত্রে প্রাচীন অথবা হেলেনিক সমাজকে পাশ্চাত্ত্য ইয়োরোপের জননী বলা স্বাভাবিক। সুতরাং এক সভ্যতার পক্ষে অপর এক সমাজের সন্তান বা জননী হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

টয়েন্‌বির মতবাদে একুশটি সভ্য সমাজ ও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধটাই সবচেয়ে সুবিদিত কথা। একুশটির মধ্যে ছয়টি স্বয়ম্ভূ, অর্থাৎ অন্য কোনও সভ্যতা থেকে এদের উৎপত্তির চিহ্ন পাওয়া যায় না। এই ছয়টি সমাজ হল—মিশরীয়, দক্ষিণ আমেরিকার আণ্ডিয়ান, প্রাচীন চৈনিক, ঈজীয় দ্বীপমালার মিনোয়ান, সুমেরীয়, এবং মধ্য আমেরিকার মায়া সভ্যতা। এছাড়া প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা স্বয়ম্ভূ না সুমেরীয় সমাজের সন্তান এ নিয়ে মতভেদ আছে। প্রথম দুটি—অর্থাৎ মিশরীয় এবং আণ্ডিয়ান সমাজ শুধু স্বয়ম্ভূ নয়, সন্তানহীনও বটে। প্রাচীন চৈনিকের সন্তান সুদূর প্রাচ্যের বর্তমান সভ্যতা, সে-সভ্যতা আবার চীন ও জাপান-কোরিয়া এই দুই

ভাগে বিভক্ত। মিনোয়ান সভ্যতা থেকে হেলেনিক ও সিরিয়াক সমাজ অন্ততঃ আংশিকভাবে উত্থিত হয়েছিল। আর সুমেরীয় থেকে আসে ব্যাবিলনীয় ও হিটাইট সভ্যতা। মায়া সভ্যতার সন্তান মেক্সিকো আর য়ুকাটনের দুটি সমাজ—তারা আবার স্পেনের দিগ্বিজয়ের সময় মিশ্রিত হয়ে এক হবার উপক্রম করছিল। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা অবশ্য পরবর্তী হিন্দু সমাজের জননী। অর্থাৎ সাতটি আদি সভ্যতার সন্তান আরও নয়টি সমাজের সন্ধান পাওয়া গেল। এর পর তৃতীয় পুরুষে আরও পাঁচটি সভ্যতা চোখে পড়ে। সিরিয়াক সমাজ থেকে উৎপন্ন হয় ইরাণী আর আরবী সমাজ—ষোড়শ শতকে এই দুই এর সংমিশ্রণে সম্মিলিত মুসলিম সভ্যতার উদয় হল। আর হেলেনিক সমাজ থেকে জন্ম নেয় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সনাতনী খৃস্টীয় সমাজ। শেষেরটি আবার এখন দুই ভাগে বিভক্ত—দক্ষিণ পূর্ব ইয়োরোপ ও রুশ অঞ্চল।

সভ্যতার পূর্ণ তালিকার অবশ্য এখানেই শেষ নয়, কারণ একুশটি বড় সভ্যতা ছাড়াও অন্য সভ্য সমাজের কিছুটা চিহ্ন পাওয়া যায়। টয়েনবি তাদের ব্যর্থ সভ্যতা ও জীবন্মৃত সমাজ এই দুইভাগে ভাগ করেছেন।

প্রথমভাগে পড়ে তিনটি গোষ্ঠী। সুদূর পশ্চিমের কেল্টিক খ্রীস্টান সভ্যতা আয়র্ল্যাণ্ডকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল, পরে পাশ্চাত্ত্য খ্রীস্টান জগতের চাপে তার লুপ্তি ঘটে। তেমনি সুদূর উত্তরে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় ভাইকিং সভ্যতাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার পরমূহূর্তে পাশ্চাত্ত্য জগতের চাপে লোপ পায়। আর সুদূর প্রাচ্যে নেস্টরিয়ান খৃস্টান সমাজ গড়ে উঠতে উঠতে আরব সাম্রাজ্যের চাপে পিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই তিন সমাজের ভাগ্যে নেমে আসে ব্যর্থতার অন্ধকার।

দ্বিতীয় দলে কয়েকটির সন্ধান পাওয়া যায় যারা জীবন্মৃত হয়ে পড়ে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রশান্ত মহাসাগরে পলিনেসীয় সভ্যতা আর মধ্য এশিয়ার যাযাবর সমাজ। এ ছাড়াও টয়েনবি অন্য উদাহরণ দেখিয়েছেন—তাঁর মতে প্রাচীন স্পার্টার বিশিষ্ট সমাজ ব্যবস্থা, মধ্য যুগের ওস্মানলি তুর্কদের

সংগঠন আর তুষারদেশের এস্‌কিমো গোষ্ঠী এই জীবন্মৃত পর্যায়ের অন্যান্য প্রতিভূ।

মৃত সিরিয়াক সভ্যতার 'ফসিল' হিসাবে য়িহুদি ও পার্শী গোষ্ঠী উল্লেখযোগ্য। আর জৈনরা নাকি হিন্দু সমাজের বুকে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের ভগ্নাংশ।

পাঁচ

এক সমাজ অন্য সমাজের সন্তান কথাটার অর্থ কি? এখানে হেলেনিক সভ্যতার থেকে পাশ্চাত্ত্য জগতের উৎপত্তির ইতিহাস বিশ্লেষণ করে টয়েন্‌বি একটা সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। এতে তাঁকে খানিকটা কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে এবং তা সত্ত্বেও মানতে হয়েছে যে সর্বত্র তাঁর সূত্র খাটে না। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস এই অসম্পূর্ণতার কারণ আমাদের ঐতিহাসিক মালমসলার অভাব।

সাধারণ সূত্রটি খানিকটা এই রকম। সমাজের জীবনে যখন আত্মবিকাশ থেমে যায় তখন আসে একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের যুগ, আমাদের সাহিত্যে যাকে মৎস্যন্যায় বলা হত আর টয়েন্‌বি যার নাম দিয়েছেন **times of trouble.** তারপর মুষ্টিমেয় শাসক সম্প্রদায় সমাজে শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় গড়ে তোলে একটা সর্বব্যাপী সার্বভৌম সাম্রাজ্য। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী শুধু সংখ্যাল্প নয়, তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হয় দমনের শাসনদণ্ড চালিয়ে। প্রতিবাদে প্রতিরোধ আসতে থাকে দুই দিক থেকে। একদিকে সমাজের সীমান্তস্থিত বর্বরেরা ক্রমান্বয় আক্রমণ চালিয়ে তাকে ক্ষত বিক্ষত করে তোলে। অন্যদিকে অভ্যন্তরস্থিত পদানত নিম্নশ্রেণীরা শাসকদের সংস্কৃতির মোহ কাটিয়ে নূতন কোনও ধর্মের আশ্রয়ে নবজীবন লাভ করে, নূতন এক সার্বভৌম ধর্মের উদয় হয়। তারপর সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে, একটা অন্তর্বর্তী অরাজকতার যুগ বা **interregnum** আসে। ক্রমে সেই সার্বভৌম ধর্মের আওতায় গড়ে ওঠে নূতন সমাজ, তাকে পুরাতন সভ্যতার সন্তান বলা চলে। বাইরের বর্বরদের

টয়েন্‌বি সাধারণ নাম দিয়েছেন external proletariat, ভিতরের বঞ্চিত নিম্নশ্রেণীদের আখ্যা হলো internal proletariat। এখানে প্রলেটেরিয়াটের অর্থ হল যারা পুরানো সমাজের আওতায় আছে অথচ প্রচলিত সভ্যতাকে যারা নিজস্ব সম্পদ বলে মনে করে না।

সমস্ত ছবিটি হেলেনিক সমাজের রূপান্তরের থেকে গৃহীত হয়েছে। টয়েনবি একে সাধারণ নিয়মের মর্যাদা দিয়ে যেখানেই এক সভ্যতা থেকে অপরের উদয় সন্দেহ করা চলে সেখানেই এর প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে খানিকটা সাদৃশ্য পাওয়াও যায়, কিন্তু সর্বত্রই লক্ষ্য রয়েছে সাধারণ সূত্রের সমর্থক ঘটনা আবিষ্কারের চেষ্টা।

মৎস্যন্যায়ের যুগ হেলেনিক সমাজে পেলপনেসীয় যুদ্ধ থেকে পিউনিক যুদ্ধ পর্যন্ত। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় তার ব্যাপ্তি মৌর্য সাম্রাজ্যের পূর্ববর্তী ছোট রাজ্যগুলির সংগ্রামে। সিরিয়াক সমাজে অনুরূপ অবস্থা আকেমেনীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের আগেকার যুগ, সুমেরীয় সভ্যতায় তার সন্ধান পাই সুমের-আক্কাদ সাম্রাজ্য স্থাপনের আগে, প্রাচীন চীনে তার পরিচয় সিন ও হান সাম্রাজ্য উদয়ের পূর্বাবস্থা। সার্বভৌম সাম্রাজ্যের অনেক দৃষ্টান্ত মেলে—হেলেনিক সভ্যতায় রোমান সাম্রাজ্য, প্রাচীন ভারতে মৌর্য ও (একটা হেলেনিক আঘাতের পর) গুপ্ত রাজত্ব, সিরিয়াক সমাজে আকেমেনীয় সাম্রাজ্য এবং (দীর্ঘস্থায়ী হেলেনিক বাধার পর) আরব খিলাফৎ। ইজিপ্টের দ্বাদশ ও অষ্টাদশ রাজবংশ, সুমেরীয় সভ্যতায় সুমের ও আক্কাদ, চীনে সিন ও হান রাজকুল, আমেরিকায় ইন্‌কা বা আজ্‌টেক সাম্রাজ্য ইত্যাদি একই গোত্রের। এক সভ্যতা থেকে পরবর্তী সভ্যতায় রূপান্তরের সেতু হল সার্বভৌম ধর্ম। তার উদাহরণ হল খৃস্টধর্ম (হেলেনিক থেকে পশ্চিম ইয়োরোপের সমাজ), হিন্দুধর্ম (প্রাচীন ভারত থেকে পরবর্তী হিন্দু সমাজ), মহাযান বৌদ্ধ মত (প্রাচীন চীন থেকে পরবর্তী সুদূর প্রাচ্য সভ্যতা), ইসলাম (সিরিয়াক থেকে আরবী ও ইরানী সমাজ) ইত্যাদি। যেখানে সার্বভৌম ধর্মের সেতু অস্পষ্ট, সেখানে দুই সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক যোগ

নিঃসন্দেহ নয় (মিনোয়ান ও হেলেনিক; সুমের ও প্রাচীন ভারত)। আর যেখানে পুরাতন সভ্যতার বনেদী ধর্মই পরবর্তী সভ্যতায় চালু দেখা যায় সেখানে দুই সমাজের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সন্দেহ আসে (সুমেরীয় আর বাবিলনীয়)। নূতন সার্বভৌম ধর্ম কখনও আসে পুরাতন সমাজের বাইরে থেকে (খৃস্ট ধর্ম, মহাযান), আবার কখনও তার উৎপত্তি পুরাতন সমাজের গর্ভে (ইসলাম, হিন্দু ধর্ম)।

ছয়

মানবজাতির জীবনের প্রায় সবটাই কেটেছে অসভ্যতার অন্ধকারে, ইতিহাসে প্রাচীনতম সভ্যতার উদয়ও ছয় হাজার বৎসরের বেশি আগে নয়। সভ্যতার উদ্ভবের আগেকার অবস্থার মূল প্রকৃতি হল স্থিতিশীলতা ও দীর্ঘস্থায়ী গতানুগতিক ভাব। পক্ষান্তরে সভ্যতার বৈশিষ্ট্য হল গতিশীলতা। স্থিতি ও গতির অর্থে টয়েন্‌বি দুটি চীনে শব্দ ব্যবহার করেছেন—ইন ও ইয়াং। ইন থেকে ইয়াং-এ রূপান্তর সভ্যতার সূত্রপাতের গোড়ার কথা।

সভ্যতার উদয়ের সমস্যা হল এই রূপান্তর ঘটে কেন, বর্বর গতানুগতিকতা ভেঙে পড়ার কারণ কি। টয়েন্‌বি বলেন যে, এ প্রশ্নের উত্তর সাধারণত দেওয়া হয় দুইভাবে আর দুই উত্তরই ভুল। কোন কোন মতে যারা সভ্যতা সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে থাকে জাতীয় বৈশিষ্ট্য, জাতিগত কোন বিশেষ গুণ। এর থেকে উৎপন্ন হয় আর্য রক্তের অভিমান অথবা নর্ডিক 'রেস'-মাহাত্ম্যের মতন অন্ধ বিশ্বাস। অন্য মত অনুসারে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এমন কোনও সুযোগ আসে (নদীকূলের উর্বরতা, আবহাওয়ার সচ্ছন্দতা) যার ফলে সভ্যতা সৃষ্টি সহজ হয়ে পড়ে। টয়েন্‌বির মতে জাতিগত বৈশিষ্ট্য অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সুযোগ কোনটাই আসল কারণ নয়। ইয়োরোপীয় সভ্যতা টিউটন জাতির নূতন রক্তের ফল নয়, তাদের দান কোনও ক্রমেই পুরাতন রোমক প্রজাদের থেকে বেশি ছিল না; প্রাচীন ভারতেও সম্ভবত অনার্যের তুলনায় আর্যের শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসন্দেহ

নয়। ইতিহাসে বিশুদ্ধ 'রেসের' সন্ধান বৃথা। অপর দিকে নীল নদ যদি মিশরীয় সভ্যতার মূল কারণ হয় তবে মিসিসিপির কূলে অনুরূপ সভ্যতার দেখা পাওয়া যায় না কেন ?

সভ্যতার উৎস টয়েন্‌বি খুঁজেছেন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানুষের সংঘাতের মধ্যে আর এখানে পারিপার্শ্বিক অবস্থা শুধু প্রকৃতি নয়, তার মধ্যে আসে অন্য মানুষ এবং সকল ধরনের সমস্যা। বিভিন্ন লোকসমষ্টির জীবনে বারবার সমস্যার উদয় হয়, আকস্মিক পরীক্ষা সামনে এসে পড়ে। সমস্যার সামনে লোকে কেমন আচরণ করবে সে-কথা পরীক্ষার আগে কেউ বলতে পারে না। কখন কখন বিপদ সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে লোকসমাজ নিজের শক্তির বিকাশ লাভ করে। কখনও বা বিপদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। সমস্যার আগমন ও সমাধানের চেষ্টাকে ভাববাদীর ভাষায় টয়েন্‌বি নাম দিয়েছেন challenge and response. এই সমস্যা-সমাধানের দ্বন্দ্ব তাঁর মতে সমস্ত ইতিহাসের মূল ছন্দ। সভ্যতার উদ্ভব তাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিপর্যয় ও মানুষের শক্তির সদ্ব্যবহারের মিলিত ফল।

আদি সভ্যতার উদয়ের মূলে এই পারিপার্শ্বিক বিপর্যয় স্বভাবতই প্রকৃতির খেলার রূপ নেয়। মিশর বা সুমেরের ক্ষেত্রে বোঝা যায়, আদি বাসভূমির উর্বরতাহ্রাস লোকসমষ্টিকে বিপন্ন করে তোলে, তারা নীল নদ অথবা ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের অরণ্য ও জলাভূমিকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টার মধ্যেই সভ্য সমাজের সৃষ্টি করে। পরবর্তী সভ্যতার উদ্ভবের সময় পারিপার্শ্বিক বিপর্যয় শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে আবদ্ধ নয়, সেখানে মানুষের সৃষ্ট সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়। পুরাতন সভ্যতার ইমারৎ ধ্বসে পড়ার ব্যাপারটাই একটা প্রকাণ্ড পরীক্ষা। আত্মশক্তিতে সে-পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার মানেই নূতন সভ্যতার সৃষ্টি।

পারিপার্শ্বিক বিপর্যয় নানাবিধ হতে বাধ্য। তার রূপ কখনও নূতন জমি দখলের সংগ্রাম কিম্বা অনুদার প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনার প্রচেষ্টা। কখনও তার রূপ মানুষের বিরুদ্ধে অভিযানে। বাইরে থেকে আকস্মিক

আক্রমণের আঘাত আসতে পারে, পাশের লোকের দীর্ঘস্থায়ী চাপও কিছু দুর্লভ নয়। কিম্বা সমাজের অভ্যন্তরে অত্যাচার বা শাস্তিবিধানের চাপও আত্মশক্তি বিকাশের উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এ কথা অবশ্য বলা চলে না যে সমস্যা যতই তীব্র হবে, শক্তির বিকাশও তার সঙ্গে তাল রেখে চলবে। এর মধ্যে বাধ্যবাধকতা কিছু নেই, ঘটনার আগে ভবিষ্যদ্বাণীও অচল। মোটের উপর টয়েন্‌বির বিশ্বাস এই যে, কিছু দূর পর্যন্ত বিপর্যয়ের ফলে সমস্যা-সমাধানের শক্তি জোগায়। কিন্তু বিপদ এমন প্রচণ্ড রূপ নিতে পারে যে তা কাটিয়ে ওঠা চলে না। ব্যর্থ সভ্যতার ব্যর্থতার কারণ এইখানে। আবার সমাজের সৃজনীশক্তি রুদ্ধ হয়ে গেলে, জীবনে স্থবিরতা এলে স্বভাবতই সমাধানের ক্ষমতার অভাব হয়।

সাত

জন্মের পর বিকাশ বা বৃদ্ধি। সভ্যসমাজে বিকাশের লক্ষণ হল এক সমস্যা সমাধানের পর অন্য সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার শক্তি। এই ক্রমান্বয় সার্থকতা জীবনের পরিচয়। সভ্যতার প্রগতির মাপ রাজ্যজয়ের মধ্যে নয়, আর্থিক উন্নতিও তার আসল পরিচয় হতে পারে না। টয়েন্‌বির মতে প্রগতির লক্ষণ হল বাস্তব জগতের বাধা অতিক্রম করে ক্রমশই ভাবজগতের সমস্যা উত্তীর্ণ হবার শক্তি-অর্জন। যতদিন পর্যন্ত সভ্য সমাজ এইদিকে অগ্রসর হয় ততদিন তার জীবনীশক্তি অব্যাহত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু আজ পর্যন্ত সকল সভ্যতার ইতিহাসে (পাশ্চাত্ত্য সমাজ সম্বন্ধে টয়েন্‌বি এখনও মন স্থির করতে পারেন নি) কিছুদিন পরই আত্মবিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, বৃদ্ধির শেষ এসেছে। তখন দেখা যায় বার্ধক্য ও স্থবিরতা। টয়েন্‌বি এর নাম দিয়েছেন breakdown ; এখানে কথাটার অর্থ সভ্যতার পতন নয়, তার আত্মবিকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়া মাত্র। তাই breakdown-এর পর বহু শতাব্দী পর্যন্ত সে-সমাজ বেঁচে থাকার মধ্যে নাকি অসঙ্গতি নেই।

হেলেনিক সমাজে breakdown আসে পেলপ নসীয় যুদ্ধের যুগে, হেলেনিক সমাজ শেষ হয়ে যাবার আটশত বৎসর আগে।

বার্ধক্য ও স্থবিরতার কারণ কি? কোনও সভ্যতার পতন অবশ্যম্ভাবী বা প্রাকৃতিক নিয়মের ফল এ কথা টয়েনবি মানতে পারেন না কারণ challenge and response সূত্রের রূপই হল অনির্দিষ্টতা, কোন অবস্থায় মানুষ কি করতে পারে এই মতে তার নিশ্চয়তা নেই। মেসপটেমিয়ার জলসেচনের বিপর্যয় সেখানকার সভ্যতার বার্ধক্যের কারণ নয়, তাকে স্থবিরতার অনিষ্টময় ফল বলাই উচিত। রোমের পতন হেলেনিক সমাজের অচল অবস্থার কারণ নয়—হেলেনিক বিকাশ রোমের সাম্রাজ্যস্থাপনের আগেই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

টয়েনবির মতে সভ্যতার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায় যখন আত্মবিকাশের শক্তি আর ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে পারে না। তিনি বলেন যে অগ্রগতি সকল সময়েই মুষ্টিমেয় সংখ্যাল্পের কাজ, সৃজনীশক্তি তাদেরই আয়ত্তে থাকে। অনির্দিষ্ট কিছুকাল পর্যন্ত সমাজের সাধারণ লোক সৃষ্টিকর্তা সংখ্যাল্পের অনুসরণ করে, কিন্তু সাধারণত অনুসরণের মূলে থাকে অনুকরণ প্রবৃত্তি। কিছুদিন পর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নেতার অনুচরদের যান্ত্রিকতায় নিজের আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, সৃষ্টির কাজে ভাটা আসে। কিম্বা সংখ্যাধিক অনুচরদের উপর নেমে আসে জোর করে মানিয়ে নেবার জুলুম। তার ফলে সৃষ্টিকারী সংখ্যাল্প লোক পরিণত হয় অত্যাচারী শাসক সম্প্রদায়ে। আর সংখ্যাধিক অনুচরেরা প্রলেটেরিয়াটে পরিণত হয়, সমাজের সভ্যতা আর তাদের নিজস্ব সম্পদ মনে হয় না, তারা তখন প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখে, নূতন বিদ্রোহী নেতার সন্ধান করে। মোট ফল দাঁড়ায় যে, সমাজ আত্মবিকাশের শক্তি হারিয়ে ফেলে, জরাগ্রস্ত অবস্থা এসে পড়তে থাকে, নূতন নূতন পরীক্ষা আর সগৌরবে পার হওয়া চলে না। এই পরিণতির নানাবিধ রূপ আছে। সৃষ্টিকার্য কখনও ব্যাহত হয় পুরাতন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে নূতন কাজ চালানোর অসঙ্গতির ফলে। কখনও বা নেতৃস্থানীয়রা সৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে গতানুগতিককে আঁকড়ে থাকার জন্য।

সভ্যতার ইতিহাসে জন্ম, বিকাশ, বার্ধক্যের পরে আসে শেষ পর্ব—পতন অবসান, ধ্বংস বা মৃত্যুর যুগ। এর প্রধান লক্ষণ হল—সমাজের মধ্যে বিরোধী স্তরের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মূল ঐক্যের বিনাশ। একদিকে সৃজনশীল সংখ্যাল্প তখন পরিপূর্ণভাবে অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে, তাদের আত্মরক্ষার প্রতিষ্ঠান হল সার্বভৌম সাম্রাজ্য। অন্যদিকে দুই ধরনের প্রতিরোধ। সমাজের ভিতর নিম্নস্তরের অধিকাংশ আর প্রচলিত সমাজের সভ্যতাকে নিজস্ব মনে করতে পারে না, তারা নূতন জীবনের স্বাদ খোঁজে। আবার বাহির সীমান্তের বর্বরেরা আঘাত হানতে থাকে, প্রতিষ্ঠিত সমাজ তাদের আর মোহমুগ্ধ করে রাখতে পারে না। দুই দিকের চাপে ও শাসকদের দুর্বলতার ফলে শেষ পর্যন্ত সার্বভৌম সাম্রাজ্যের মৃত্যু হয়, তবে পরবর্তী অরাজকতার মধ্যে থাকে নূতন সমাজগঠনের সম্ভাবনা। সমাজের ঐক্য ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখে সমাজ-মানসের অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন পথের সন্ধান, বিচিত্র ধরনের ব্যর্থতা। অবশ্য পতনের পর্বটাও ঠিক সরল রেখায় অগ্রসর হয় না, মাঝে মাঝে সমাজ যেন খানিকটা অবস্থা সামলে ওঠে, আবার তার শক্তি স্তিমিত হয়ে আসে।

আট

টয়েন্‌বির মতামতের সমালোচনা এখানে প্রধান আলোচ্য নয়, কিন্তু উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেও পাঠকের মনে নানা ধরনের আপত্তি জেগে উঠবে। বস্তুত টয়েন্‌বির লেখার প্রধান সার্থকতা এই যে, পাঠকের আলোচনা একে কেন্দ্র করে প্রবাহিত হতে পারে। উপসংহারে মাত্র দু'একটি প্রশ্নের উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

ইতিহাস সম্বন্ধে টয়েন্‌বির ব্যাখ্যা কি অযথা ধর্মভাবাপন্ন নয়? তাঁর ধর্মবিশ্বাস বিশ্লেষণী দৃষ্টিকে অনেকটা অভিভূত করে ফেলেছে। নূতন সমাজ গঠনে পূর্বতন সমাজের শেষ দশার সার্বভৌম ধর্মের কথা শুধু বলছি না। এটা উল্লেখযোগ্য যে, টয়েন্‌বি একদিকে গ্রীস থেকে আজ পর্যন্ত ইয়োরোপকে এক

সমাজ মনে করেন না। আবার অন্যদিকে ইয়োরোপীয় ফিউডাল মধ্যযুগ ও ধনতান্ত্রিক আধুনিক কাল তাঁর কাছে একই সভ্যতার অন্তর্গত। ইয়োরোপের ইতিহাসে প্রাচীন, মধ্যবর্তী ও আধুনিক—প্রচলিত এই তিন বিভাগকে অস্বীকার করে হেলেনিক ও পরবর্তী ইয়োরোপের তফাতের উপর জোর দেওয়ার মধ্যে কি এই কথাই স্পষ্ট হয় না যে এখানে মোটামুটি অখৃস্টান ও খৃস্টান ভেদরেখাটাই বড় কথা? অথচ হেলেনিক সংস্কৃতি কি বর্তমান ইয়োরোপের কাছে মধ্যযুগের সংস্কৃতির তুলনায় এতো বেশী বিজাতীয় বস্তু?

সন্দেহ দৃঢ় হয় যখন দেখি যে শুধু পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বেলা নয়, প্রায় প্রতিটি সভ্যতার আলাদা সত্তা নির্ধারিত হয়েছে সংস্কৃতির ছাপ দিয়ে আর সংস্কৃতি এখানে ধর্মেরই নামান্তর। আড়াই হাজার বৎসর ধরে সিরিয়াক সভ্যতা একই সত্তা বহন করে এসে ইসলামের পূর্ণপ্রসারের পর অন্য সমাজে পরিণত হল। হিন্দু সমাজের আওতার মধ্যেও নাকি জৈন কিম্বা হীনযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় পূর্ববর্তী সভ্যতার ফসিলের অনুরূপ। প্রাচীন সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রাধান্য অস্বীকার করছি না, কিন্তু একমাত্র ধর্মকেই সংস্কৃতির মাপকাঠি মনে করতে দ্বিধা আসে বই কি। মিনোয়ান সমাজে উৎপন্ন কোনও ধর্মে গ্রীকদের মতি ছিল না বলে টয়েনবি এই দুই সমাজের মধ্যে যোগসূত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, সুমেরীয় ও বাবিলনীয় সমাজের মধ্যে ধর্মের পার্থক্য স্পষ্ট না থাকাতে তিনি বলেছেন যে হয়তো এরা স্বতন্ত্র সমাজ নয়।

টয়েনবি পশ্চিমী সভ্যতার বিকাশের পথে বাধা এসেছে কি না বুঝতে পারেন নি, তার কারণ সে-সমাজের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক শক্তি নয়, কারণ বোধ হয় এই যে সে-সমাজ খৃস্টান সভ্যতার আধার। ইয়োরোপ আজ নূতন সভ্যতার দ্বারদেশে এসেছে বলে অনেকের বিশ্বাস, কিন্তু টয়েনবি তা মানতে পারেন না কারণ নূতন সার্বভৌম ধর্মের চিহ্ন চোখে পড়ছে না। সাম্যবাদকে আজকের প্রলেটেরিয়াটের নূতন ধর্ম বলতে পর্যন্ত তাঁর বাধে, কারণ তিনি বাস্তবিকই ধার্মিক লোক, ধর্মহীনতাকে তিনি পরিহাসচ্ছলেও ধর্ম আখ্যা দিতে পারেন না। এমন কি টয়েনবির প্রলেটেরিয়াট পর্যন্ত ধর্মকেই আশ্রয় করে

থাকে। পশ্চিম জগতের প্রলেটেরিয়াট প্রসঙ্গে তিনি তাই বুদ্ধিজীবিদের কথা আলোচনা করেছেন, মজুর শ্রেণীর কথা এড়িয়ে গেছেন।

নয়

টয়েন্‌বি ঐতিহাসিক ভাববাদের নূতন পুরোহিত এ কথা বলাও নিশ্চয় অন্যায় নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন বলছি না, পুরানো ভাববাদের কাঠামোকেও তিনি অবশ্য ত্যাগ করেছেন। কিন্তু নূতন পোষাকের মধ্যে কি পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যাচ্ছে না? আমার বিশ্বাস যে টয়েনবি নিজেও স্বীকার করবেন যে বস্তুতান্ত্রিকতা তাঁর কাছে অগ্রাহ্য, ভাববাদই তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস।

সভ্যতা সৃষ্টি করছে মুষ্টিমেয় সংখ্যাল্প লোক, জনসমাজ তাদের অনুকরণ করে অনুসরণে প্রবৃত্ত। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় লোকের ধ্যান ধারণা সংকল্পের উৎস কোথায়? বিশেষ মত বা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে কেনই বা উদিত হয়, যুগধর্মই বা কি ভাবে গড়ে ওঠে? সেকালের ভাববাদীরা ঈশ্বরের নির্দেশ দেখতে পেতেন, আজকের ভাববাদী ব্যক্তিত্বের কথা তুলেই খালাস। সৃষ্টিকর্তা নেতাদের তাই ভুঁইফোড়ের অবস্থা, জনসাধারণের কাছ থেকে তারা কি পায় সে-কথাটা উহ্য থেকেই যায়।

তারপর কালের চক্রে সৃজনশীল সংখ্যাল্প পরিণতি পায় অত্যাচারী সংখ্যাল্পে, সমাজদেহ চিড় খায়, আর অমনি প্রগতির চাকা বন্ধ হয়। কিন্তু এই ছবির মধ্যে প্রশ্ন থেকে যায় যে, সৃজনশীল যুগে কি সংখ্যাল্পের অত্যাচার থাকে না, তখনকার সামাজিক ঐক্য কি নিখুঁত? ইতিহাস বরং এই সাক্ষ্য দেয় যে সমাজের জীবনে প্রত্যেক যুগেই অন্তর্দ্বন্দ্ব চলে এসেছে—সভ্যতার জন্ম বা বৃদ্ধির সময় অত্যাচার ও প্রতিরোধের কোনই অভাব নেই।

অনেক সভ্যতার তথাকথিত স্বর্ণযুগেও সংঘর্ষের আভাস পাওয়া যায়, যদিও পতনোন্মুখ অবস্থায় নিশ্চয়ই সংঘাত তীব্রতর হয়ে ওঠে। সমাজ-জীবনে অন্তর্দ্বন্দ্বকে শেষ পর্বের লক্ষণ মনে করে টয়েন্‌বি একথাই বলতে চেয়েছেন যে

সভ্যতায় উত্থান ও পতনের যুগের মধ্যে একটা নৈতিক ব্যবধান আছে, নেতাদের একজাতীয় নৈতিক পতনই ধ্বংসের কারণ। পশ্চিমী সভ্যতার বেলা তিনি স্পষ্টই উদ্ধারের পথ খুঁজেছেন ধর্ম ও নীতির শক্তির মধ্যে। সমাজের ওঠা পড়ার মধ্যে আর্থিক কারণ কিছু থাকতে পারে কি না তার সন্ধান পর্যন্ত তিনি প্রয়োজন মনে করেন নি। ভাববাদী প্রভাবের স্পষ্টতর প্রমাণ আর কি থাকতে পারে?

দশ

সমালোচকের চোখে টয়েন্‌বির ধর্ম ও দর্শনই একমাত্র দুর্বলতা নয়। **Analogy** অথবা সাদৃশ্যের সন্ধান মাঝে মাঝে কষ্ট-কল্পনার আভাস তাঁর লেখার মধ্যে এনে ফেলেছে।

হেলেনিক সমাজ থেকে পশ্চিমী সমাজের বিবর্তন তাঁর চোখে যে-রূপ নিয়েছে তার থেকে সাধারণ সূত্রের প্রতিষ্ঠা খানিকটা জোর করেই করতে হয়েছে। প্রথমত এই রূপান্তরের ছবি নিখুঁত নয়। টয়েন্‌বি এখানে বর্বর জাতিগুলির অবদান নিতান্তই তুচ্ছ করে দেখেছেন, রোমান জগতের দাসত্ব প্রথার অবসানও তাঁর কাছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়, আসল কথাটাই হল নূতন ধর্মের স্পন্দন। সেই নূতন ধর্মকে আশ্রয় করেও অবশ্য রোম সাম্রাজ্য টিকতে পারে নি।

যা হোক এই খানিক-বিকৃত ছকটাও সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু টয়েন্‌বি এর মায়া কাটতে পারলেন না—তাই সর্বত্রই অনুসন্ধান চলেছে সার্বভৌম সাম্রাজ্য, সার্বভৌম ধর্ম আর বর্বর অভিযানের। ফলে অন্যদিকে নানা ঘটনা অবহেলিত হয়েছে, না হয়ে উপায় ছিল না।

ছকে ফেলতে গিয়ে অনেক সময় বিপদ গুরুতর হয়েছে। সার্বভৌম সাম্রাজ্যের আগে **times of trouble** আর সেখান থেকেই **breakdown** আরম্ভ করতে হবে। অতএব হেলেনিক সমাজে শেষ আট শতাব্দী, সিরিয়াক সভ্যতার প্রায় সবটাই হল বার্ধক্যের যুগ। **Challenge and**

response—এর স্থূল অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে ইতিহাসে কোন ব্যাখ্যাই চলে না? কোনও কাজ ব্যর্থ হয় আর অন্য চেষ্টা হয় সফল, কিন্তু কেন তা কে জানে। তথাকথিত সাধারণবুদ্ধিকে এমন গভীরভাবে বলবার সার্থকতা কি? সমস্যা আসছে, আর তার সমাধান হচ্ছে অথবা হচ্ছে না, তার কারণ আবার ব্যক্তিবিশেষ কি ভাবে সাড়া দেয় এটুকু মাত্র—ইতিহাসের এ ব্যাখ্যা কি কখনও তৃপ্তি দিতে পারে? সমস্যা আর সমাধানের সাফল্য অথবা ব্যর্থতা, স্থিতি অথবা গতি, ইন ও ইয়াং এর স্পন্দন, ইতিহাসকে এভাবে চিত্রিত করলে সার্থকতা কতখানি?

টয়েন্‌বির সার্থকতা তাই তাঁর বিশিষ্ট মতবাদে নয়। পাঠককে ইতিহাসের বিচিত্র রাজ্যে কৌতূহলী করে তোলাই তাঁর আসল সাফল্য, বিশেষজ্ঞের নির্জীবতার ক্ষেত্রে ব্যাপক দৃষ্টির সরস আবাহন তাঁর কৃতিত্ব, দুঃসাহসিক ব্যাখ্যার **tour de force** তাঁর কীর্তি।

॥ ইতিহাস : ভাদ্র, ১৩৫৭ (১৯৫০) ॥

'অজ্ঞাত ভারতীয়ের আত্মচরিত'

গত কয়েক মাসের মধ্যে শ্রীনীরদ চৌধুরীর আত্মজীবনী দেশী ও বিদেশী পাঠক মহলে উল্লেখযোগ্য খ্যাতি অর্জন করেছে, প্রশংসা ও নিন্দার বাদানুবাদ শোনা গিয়েছে নানাদিকে। তাই বইখানি হাতে আসামাত্র আদ্যোপান্ত দুইবার পড়ে দেখবার লোভ সামলানো গেল না। নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে এই গ্রন্থ অনেকাংশে অসামান্য।

প্রথমেই চোখে পড়ে গ্রন্থকারের ভাষার দীপ্তি, লেখার প্রসাদগুণ, প্রকাশভঙ্গীর বলিষ্ঠতা। অনেকের মতে নীরদবাবুর ইংরাজি ঠিক আধুনিক ইংরাজ লেখকের পর্যায়ে পড়ে না, আমার মনে হয় এখানে সে-প্রশ্ন তোলাটাই অবান্তর। লেখক যদি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে তীক্ষ্ণ ও স্পষ্টভাবে তাঁর বক্তব্য পাঠকের মনে পৌঁছে দিতে পারেন, তাহলেই তাঁর স্টাইল সার্থক, প্রচলিত রীতি থেকে পৃথক হলেও সার্থক। নীরদবাবুর স্টাইলের বৈশিষ্ট্য আছে পাঠককে তিনি স্পর্শ এমন কি অভিভূত করতে পারেন।

মৌলিক স্বকীয় চিন্তার যে-ছাপ আলোচ্য গ্রন্থে পরিস্ফুট হয়েছে তাকেও অসাধারণ বলা উচিত। নির্ভীকভাবে তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন, প্রচলিত সংস্কারকে তীব্র আঘাত হানতে কুণ্ঠিত হন নি, জাত্যাভিমান ও আত্মতুষ্টির ভাবকে করেছেন অগ্রাহ্য, সামাজিক জীবনে পুঞ্জীভূত অনেক গলদকে দিনের আলোতে টেনে আনতে চেয়েছেন। স্তোকবাক্যে আমরা অনেক সময় মন ভোলাই, বক্তৃতা ও কথায় প্ল্যাটিচুডের স্রোতে ভেসে চলি, নির্মম সমালোচনার কশাঘাতকে তাই শ্রদ্ধা করাই সঙ্গত। কিন্তু শুধু বিশ্লেষণ নয়, বর্ণনাতেও নীরদবাবু সিদ্ধহস্ত। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনটি অধ্যায়ের উল্লেখ করব—ভারতীয় রেনেসাঁসের জয়যাত্রা, মহানগরী কলিকাতা, ও জ্ঞানচর্চার উদ্বোধন শীর্ষক রচনাগুলি নিঃসন্দেহেই পরম উপভোগ্য।

---

* **Autobiography of an Unknown Indian—by Niradchandra Chaudhuri (McMillan & Co,)**

ভাষা ও ভাবের বিশেষত্ব ছাড়াও এক বিশেষ ব্যক্তিত্বের স্বপ্রকাশ পাঠককে আকর্ষণ করে। গ্রন্থকার পাশ্চাত্ত্য জগতে 'অজ্ঞাত ভারতীয়' হতে পারেন, শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে তাঁর পাণ্ডিত্য, সঙ্গীতজ্ঞান, রণশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা একেবারে অবিদিত নয়। কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধ মহলের বাইরেও তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নিশ্চয় অপরিচিত পাঠক পর্যন্ত সহজে ভুলতে পারবে না। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সর্বদাই কৌতূহল জাগায়, লোক-চক্ষুর লক্ষ্য বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। আত্মচরিতের উদ্দেশ্য যদি আত্মপ্রকাশ হয় তবে এখানে লক্ষ্যসিদ্ধি হয়েছে, এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিচয় ছাপার অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত নীরদবাবুর লক্ষ্য আরও সুদূরপ্রসারী। মুক্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর এই লেখা আত্মজীবনের ঘটনাসমষ্টি নয়, ব্যক্তিগত নয়, জাতীয় ইতিহাসই তাঁর আলোচনার বস্তু। বহু পরিশ্রমে ও বহু আয়াসে তিনি আমাদের অজ্ঞানতার মোহ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। তাঁর দাবি এই যে, তাঁর সিদ্ধান্তগুলি ভ্রান্তিমেঘমুক্ত স্থির সিদ্ধান্ত। (গ্রন্থের ১২৯, ৪৬৫, ৪৬৬, ৫১৩ পৃষ্ঠা।)।

কিন্তু সুলিখিত মৌলিক ও ব্যক্তিত্বচিহ্নিত হলেই কি সিদ্ধান্ত ধ্রুব সত্য হয়ে দাঁড়ায়? সত্যের মাপকাঠি বস্তুনিষ্ঠা, অসাধারণত্ব নয়। মতভেদ অবশ্য স্বাভাবিক ও অনিবার্য, কিন্তু গ্রন্থকার যখন স্বমত প্রমাণের চাইতে প্রচারের দিকে বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন তখন সমালোচককেও বাধ্য হয়ে বলতে হয় যে, নীরদবাবুর মতবাদ আংশিক একদেশদর্শী ও অনেকটা কল্পনাবিলাসী। তাঁর আত্মজীবনীর সার্থকতা আত্মপ্রকাশে, সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় নয়।

আলোচ্য গ্রন্থের আগাগোড়া একটা সুর ধ্বনিত হয়েছে—বাংলা তথা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সমগ্র জাতীয় জীবন আজ অধঃপতনের পথে চলেছে, নতুন প্রাণের অভ্যুদয়ের চিহ্নমাত্র নেই। ইয়োরোপে স্পেংলার যে-বিভীষিকা দেখেছিলেন তারই অনুবর্তনে গ্রন্থকার তাঁর নিজের দেশে দেখছেন অবসান ও পতনের করাল ছায়া। মাথার উপরে ধ্বংস নেমে

আসছে, পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, যা কিছু মূল্যবান তাই আজ নষ্টপ্রায় (৪৮, ১২৯ পৃষ্ঠা)। প্রকৃত অবনতির যুগে আমরা বাস করছি, পুরুষত্ব আজ নিষ্প্রভ, সমালোচনার শক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়েছে, চারিদিকে ক্ষয়ের চিহ্ন এগিয়ে আসছে (৩৬৪, ৩৩৪, ৪৪৪, ৪৬৯ পৃষ্ঠা)। গ্রন্থকারের চোখে এই অধঃপতন কোনও সাবেকী স্বর্ণযুগের থেকে আধুনিক জগতের বিচ্যুতি নয়। সমাজের স্থিতিশক্তির পতন স্পষ্ট হয়েছে ১৯১৯-এর পর থেকে, ১৯৩০-এর পরে কলিকাতা আর তাঁর মনকে তৃপ্তি দিতে পারে নি (৪০৩, ২৫৯ পৃষ্ঠা)। তাঁর যৌবনের যুগেই বাংলাব জীবনে নেমেছে অভিশাপ, সে-দুর্দশা সারা ভারতে সাম্প্রতিক বর্বরতাব পুনরাবির্ভাবেরই প্রতিচ্ছায়া (১৮৬, ১৮৭ পৃষ্ঠা)। পূর্ববর্তী যে-যুগেব তুলনায় এই অধঃপতন সে-যুগ হল উনিশ শতকের পুনর্জাগরণের যুগ, বাংলার রেনেসাঁসের আমল, যার পূর্ণ-প্রকাশ ঘটেছিল ১৮৬০ থেকে ১৯১০ এই অর্ধ শতাব্দীতে। (২২১ পৃষ্ঠা)।

উনিশ শতকের রেনেসাঁসের এই মূল্যনির্দেশ বস্তুনিষ্ঠার দিক থেকে অতিরঞ্জিত নয় কি? সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় ব্রিটিশ আমলে আমাদের মধ্যশ্রেণীর কীর্তির দুর্বলতার দিকটা অনেকখানি পরিস্ফুট হয়েছে। অর্ধকলোনির জীবনে সাম্রাজ্যবাদের আওতায় যে-জাগরণ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সাম্রাজ্যতন্ত্রের পক্ষপুটে যে-প্রাণস্পন্দন, তাকে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের সমান পর্যায়ে তোলা দুরাশা বৈ কি। জনগণের সঙ্গে বিচ্ছেদ, হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য, জন্মগত স্ববিরোধিতা আমাদের রেনেসাঁসকে পদে পদে ব্যাহত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রেব 'রজনী' থেকে সংস্কৃতিবান বাঙ্গালী ভদ্রলোকের যে-ছবি গ্রন্থকার উদ্ধৃত করেছেন তাতে শ্রদ্ধার চেয়ে উপহাসের ভাবটাই মনে উদয় হয় না কি? তার মধ্যে কি আমরা ইয়োরোপের পনের ষোল শতকের দুর্ধর্ষ মনের পরিচয় পাই? উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক নেতাদের মতন সিপাহী বিদ্রোহকে তিনি পুরাতন প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন। মার্ক্সের দৃষ্টিতে তার যে-সবল দিকটা ধরা পড়েছিল, নীরদবাবুর চোখে তা অজ্ঞাতই থেকে গেছে।

এখানে অবশ্য বলা যায় যে, ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের সমগোত্রীয় না হলেও আমাদের রেনেসাঁসই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলাধার। কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তাহলে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের চিন্তাধারার সঙ্গে একাত্ম করে দেখতে হয়। শুধু তাই নয়, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে মেনে নিলেও তার ক্ষীণপ্রাণভাব, স্ববিরোধিতা, স্বল্পপ্রসার ও মাত্র আংশিক উৎকর্ষের বিচার না করলে চলে না। উনিশ শতকের অবদানের দুর্বলতা উপলব্ধি না করলে আমাদের কেবল কয়েকটা বাঁধা বুলির আশ্রয় নিতে হবে।

বাংলার রেনেসাঁসকে অতিরঞ্জিত করে গ্রন্থকার সাম্প্রতিক অধঃপতনের যে-চিত্র এঁকেছেন তাকেও একদেশদর্শী অতিকথন বলা চলে। গত তিরিশ-চল্লিশ বৎসরে ভারতে নতুন কিছুই মাথা তোলে নি এ হল গায়ের জোরে প্রচার। গান্ধীজীর আমলে জনজাগরণ, দুঃসাহসিক ও স্বার্থত্যাগী বিপ্লবী অভিযান, পরবর্তী যুগে শ্রমিক বা কিষান আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণসংগ্রাম, কোনও কিছু নীরদবাবুর সভ্যতার সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না, তাঁর মতে এ সমস্তই জাতীয় পতনের নির্দেশক। উনিশ শতকের শিক্ষিত ভদ্রলোকের চরিত্র শক্তি গ্রন্থকারকে শ্রদ্ধায় অবনমিত করেছে দেখতে পাই। কিন্তু কোন্ যুক্তিতে আমরা এ যুগের অনেক মানুষের উদ্যম প্রচেষ্টাকে অগ্রাহ্য করব? আদর্শের ডাকে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন, অসীম সাহসে দুঃখকষ্টবরণ, সহযোগিতা, অধ্যবসায়, সংগঠনের শক্তি—এমন সাধনার অভিজ্ঞতা কি আমাদের চোখে পড়ে না, আজ কি তার এমনই অভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে? নীরদবাবুর অভিজ্ঞতায় এমন দৃষ্টান্তের পরিচয় না থাকলে সেটা তাঁরই দুর্ভাগ্য, জাতির নয়। আর সংস্কৃতিকে যদি দেয়াল-ঘেরা সাহিত্য ও চিন্তার রাজ্যেই আবদ্ধ রাখতে হয়, তাহলেও কি বাংলা সাহিত্য ও ভারতীয় চিন্তা গত পঁচিশ বছরে অনেকটা পুষ্টিলাভ করে নি? কেবল কয়েকজন মহারথীর আবির্ভাবেই জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় না—সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞান-ইতিহাস আলোচনা, নতুন ভাবধারা ইত্যাদির বিস্তারও সংস্কৃতির একটা দিক।

ভূমিকাতে গ্রন্থকার অবশ্য বলেছেন যে, তাঁর লক্ষ্য সাধারণ সূত্রের সন্ধান, ব্যতিক্রমের নয়। কিন্তু সমাজের একটা বড় অংশ যার প্রভাবে আসে তা কি ব্যতিক্রম না সাধারণ নিয়ম? গত দুই-তিন দশকের অনেক কিছু আলোড়নকে অযথা স্ফীত করে না দেখলেও দেশে প্রাণশক্তির স্পন্দনকে অগ্রাহ্য করা অসঙ্গত।

নৈতিক, মানসিক ও ব্যবহারিক পতনের যে-দৃশ্য গ্রন্থকারকে ব্যথিত করেছে, তার মধ্যে অনেকটা সত্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে-সত্য গোষ্ঠী বা শ্রেণীবিশেষের অধোগমন, সমস্ত জাতির নয়। উপরতলার একটা স্তরের মধ্যে নীরদবাবু তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ রেখেছেন, প্রকৃত হিউম্যানিস্টের মতন দৃষ্টি প্রসারিত করলে তিনি দেখতে পাবেন যে, একটা গোষ্ঠীর অধোগতি সারা জাতির পতনের সমার্থক নয়। অবশ্য এখানেই আসে দৃষ্টিভঙ্গীর কথা, ইতিহাসকে দেখবার রকমফের।

জনতা সম্বন্ধে নীরদবাবুর অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণা লক্ষণীয়। লোকের ভিড়কে তিনি শুধু অপছন্দ করেন তাই নয় (২৬০ পৃষ্ঠা)। প্রথম যৌবনে তিনি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন গণঅভ্যুত্থানে নয়, সামরিক সুসম্বদ্ধ বিদ্রোহে (২৪৯ পৃষ্ঠা)। গান্ধীযুগে জনবিক্ষোভ তাঁর মনে এনেছিল ক্রোধ (৪০৭ পৃষ্ঠা)। ছাত্রাবস্থায় ফরাসী বিপ্লবের ইতিবৃত্ত তিনি আয়ত্ত করে ফেললেও মনে হয় যে সাবেকী কোনও ঐতিহাসিকের মতন জনতা তাঁর কাছে canaille মাত্র। শুধু ব্যক্তিগত পছন্দের কথা নয়, ইতিহাস আলোচনাতেও তিনি এই দৃষ্টি নিয়ে এসেছেন।

ইতিহাসে দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনায় গ্রন্থকার বাস্তবনিষ্ঠ পন্থার আদর্শ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠাও যে অচল অনড় পদার্থ নয়, আদর্শ যে শুধু কথায় কাটে না সে-সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সজাগ নন। তিনি এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন যেন গ্রীক ঐতিহাসিক থিউকিডিডিস জাতি বা দলমত প্রভাবের ঊর্ধ্বে (৩৪৫ পৃষ্ঠা) কিম্বা যেন বিশপ স্টাব্‌স্‌কে দলীয় মনোভাব স্পর্শ করতে পারে নি (৩৫১ পৃষ্ঠা)। বলা বাহুল্য, আজকের দিনে কোনও ঐতিহাসিক

একথা জোর দিয়ে বলতে পারেন না। যে ফরাসী ঐতিহাসিকের বাণী তিনি একাধিকবার উদ্ধৃত করেছেন, যিনি বলেছিলেন যে তাঁর মুখ দিয়ে স্বয়ং ইতিহাস কথা বলছে, তাঁর সেই দম্ভ আজ আর কেউ শিরোধার্য করে না। দেশ-কাল-শ্রেণী-নির্বিচারে ইতিহাসের এই অমোঘ বিচারের দাবি নীরদবাবু মেনে নিয়েছেন, কিন্তু এটা উনিশ শতকের একটা বিশেষ অবস্থার প্রতিচ্ছায়া মাত্র, যে-মতে মনে হত যে রাষ্ট্র একটা গোষ্ঠী বা শ্রেণীনিরপেক্ষ শক্তি অথবা বুদ্ধিবাদ বুঝি সামাজিক পরিবেশের ঊর্ধ্বস্থিত সনাতনী এক প্রক্রিয়া। বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রণালীকে অগ্রাহ্য করবার কথা উঠছে না, কিন্তু ঐতিহাসিকের ফতোয়া মাত্রকেই বিচারের বাইরে রাখা চলে না।

সুতরাং নীরদবাবুর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে বস্তুনিষ্ঠার কষ্টিপাথরে যাচাই করা প্রয়োজন। আধুনিক যুগে ইয়োরোপের যে-জয়যাত্রা শুরু হল তার পিছনে ইসলাম-বিরোধী ধর্মযুদ্ধের প্রভাব গ্রন্থকার বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন (৫০৬ পৃষ্ঠা), অথচ তার চেয়ে অনেক বেশী প্রবল আর্থিক প্রেরণা যে ইয়োরোপীয়দের মুসলিম-বর্জিত আমেরিকায় টেনে নিয়ে গেল তার উপর তিনি জোর দিলেন না। স্পেংলারের প্রতিধ্বনি করে তিনি গোটা ইয়োরোপীয় সভ্যতা ধ্বংসপ্রায় বলে মাঝে মাঝে ভয় পেয়েছেন (৩৪১ পৃষ্ঠা, কিন্তু ইয়োরোপের অনেকাংশে প্রাণশক্তির জোয়ার তাঁর নজরে পড়ে নি কেন না ইয়োরেশিয়ার অনেকটাই নাকি আজ সভ্যভ্রষ্ট—বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের এই নমুনা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর চার্চিলের মতন 'জিনিয়াস নাকি ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে চিরদিনের জন্য চূর্ণ করে দিতে পারতেন (৫২০ পৃষ্ঠা)। আর আমাদের ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হল সূর্যস্বরূপ আমেরিকার চারিদিকে গ্রহের মতন প্রদক্ষিণ (৫১০ পৃষ্ঠা)। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত আশা ভরসার কথা বোঝা সহজ, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস আলোচনার পাদটীকা হিসাবে এমন ভবিষ্যদ্বাণীর নির্বিচার অবতারণা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক।

দেশের ইতিহাসের আলোচনাতেও তেমনি বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের অভাব দেখি না। গ্রন্থকার ধরে নিয়েছেন যে গোষ্ঠীগত হিন্দু আত্মপ্রত্যয় জাতীয়তা-

বোধের নামান্তর (৪০৯ পৃষ্ঠা); সেই যুক্তিতে তাহলে মধ্যযুগের ইয়োরোপে ক্রিশ্চান সত্তাকেও জাতীয় মনোভাব আখ্যা দিতে হয়। হিন্দু-সাধারণের চোখে নাকি দেবদেবীরা মানুষের উৎকোচের নাগালের বাইরে নয় (৪৫০ পৃষ্ঠা), অথচ সকল ধর্মের ব্যবহারিক প্রয়োগের বিরুদ্ধেই এ অভিযোগ আনা সম্ভব। হিন্দু-মুসলিম বিরোধ লেখকের কাছে স্বাভাবিক সত্য, এ দেশে দুই জাতির তত্ত্ব তিনি ঐতিহাসিক 'ফ্যাক্ট্' বলে গণ্য করেছেন (২৩১ পৃষ্ঠা), আবার বাংলাদেশের সাম্প্রতিক দ্বিখণ্ডন তাঁর কাছে মনে হয়েছে অন্যায় ও অস্বাভাবিক—এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? নবজাগরণের যুগে জাতীয়তা-বোধ তাঁর কাছে যুক্তিসঙ্গত ও উদার মনে হয়েছে, গান্ধীবাদকে তিনি দেখেছেন প্রাচীন প্রতিক্রিয়া ও অন্ধসংস্কারের স্তূপ হিসাবে, দ্বিতীয়ের প্রভাবে তাঁর মতে প্রথমটির সুকুমার ঔদার্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে (৩৩৫, ৪৪১ পৃষ্ঠা)। কিন্তু জাতীয় মধ্যশ্রেণীর বিবর্তনের দুই পর্যায়ের প্রতীক এই দুই যুগের মধ্যে যে-সুস্পষ্ট যোগসূত্র রয়েছে তাব দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে নি। ব্যাপক বস্তুনিষ্ঠার নামে এই ভাবে পদে পদে চোখে পড়ে ভাববাদী বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ।

নীরদবাবুর ইতিহাসে আমাদেব নবজাগরণ হয়েছে অতিরঞ্জিত, সামাজিক স্তরবিশেষের সাম্প্রতিক অধোগতি সমগ্র জাতির পতনে রূপান্তরিত হয়েছে, আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতায় সমাজবাদী চিন্তা ও কর্ম হয়েছে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত, স্বদেশের সমাজবিবর্তন বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে তিনি আবার ভারতের ইতিহাসের ধারার এক স্বকীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। এখানে তাঁর গুরু টয়েন্‌বি।

ইতিহাসে বিভিন্ন সমাজের পার্থক্য খুঁজতে গিয়ে টয়েন্‌বি মূলত ধর্মগত সংস্কৃতির প্রভেদের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর মতে তাই ইয়োরোপে মধ্যযুগ ও আধুনিককাল একই পশ্চিম ইয়োরোপীয় সমাজের রূপ গ্রহণ করেছে। এইরূপে নির্দিষ্ট সমাজগুলির উত্থান-পতনের বিশ্লেষণে সাধারণ সূত্র নির্ণয় তাঁর লক্ষ্য। নীরদবাবুও ভারতের ইতিহাসে তিনটি সংশ্লিষ্ট অথচ তাঁর মতে স্বতন্ত্র সভ্যতার

সন্ধান পেয়েছেন—হিন্দু, ইসলামি ও ইয়োরোপীয়। প্রত্যেক সভ্যতার লীলাস্থল ভারতের মাটি হলেও সৃষ্টিকর্তা হল বহির্জগতের একটা প্রবল আলোড়ন—অর্থাৎ আর্যজাতির দিগ্বিজয়, ইসলাম ধর্মের প্রসার এবং ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবিস্তার। সুতরাং ভারতে পর পর তিনটি সভ্যতার চালক ও শাসক-শক্তি হল বৃহত্তর বিদেশী সংস্কৃতি। সংস্কৃত, ফারসি, ইংরাজি পর পর তিন পর্যায়ের তিন সংস্কৃতির বাহন। খাস সংস্কৃতির দিক দিয়ে ভারতের তিন সভ্যতাকে ক্রমশ নিম্নগামী বলা চলে, রাষ্ট্র-সংগঠনের দিক দিয়ে তারা আবার ধাপে ধাপে উচ্চতর হয়েছে—কিন্তু আসল সত্তা ও স্বভাবের বিচারে প্রত্যেকেই বিদেশী, শুধু বহিরাগত নয়। প্রতি পর্যায়ে সভ্যতার বাহন হল বিদেশী শাসক ও সংশ্লিষ্ট পার্শ্বচর ও অনুচরেরা। দেশের অধিকাংশ লোক মনে মনে তখনকার সভ্যতাকে গ্রহণ করতে পারে নি, তাই সর্বদাই সভ্যতার সঙ্গে 'অসভ্যতা'র একটা লড়াই চলেছে। এখানে অমার্জিত অসভ্য লোকেরা অবশ্য হল জনসাধারণ, টয়েনবির ভাষায় আভ্যন্তরীণ প্রলেটেরিয়াট। কালক্রমে এক একটি সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে—প্রধানত দেশের নির্মম জলবায়ু আবহাওয়ার চাপে, খানিকটা বিদেশী সৃষ্টিকর্তার অবসাদ ও শক্তিক্ষয়ে। চালক ও শাসক শক্তির পতন এসেছে 'অসভ্য' জনসাধারণের চাপে নয়, কারণ এই সাধারণ লোক সর্বদাই সভ্যতার বাহনদের তুলনায় নিকৃষ্টতর, দেশের গুণে তারা আরও বেশী নির্জীব। তবে একটা সভ্যতার যখনই সংকট এসেছে তখনই এই সাধারণ লোকে হট্টগোলের সৃষ্টি করে, সে-বিশৃঙ্খলা যেন সিংহচর্মাবৃত গর্দভের আস্ফালন। সভ্যতার পুনর্জন্ম আসতে পারে আবার কোনও বিদেশী সংস্কৃতির প্রসারে। গ্রন্থকার-নির্দিষ্ট ভারতীয় ইতিহাসের ছক বা প্যাটার্ন্ হল এই।

প্যাটার্নের মাহাত্ম্যই এই যে তাতে একটা মনের মতো ছবি আঁকা চলে, যে-তথ্য ছকে পড়ে না তাকে অগ্রাহ্য করাই যথেষ্ট, বিপরীতমুখী তথ্যের আপেক্ষিক বিচারের প্রয়োজন থাকে না। তাই বিদেশী প্রভাব ও দেশীয় অবস্থার মিশ্রণে ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তির সম্ভাবনা গ্রন্থকার এক কথায়

উড়িয়ে দিয়েছেন। আর্যজাতির আগমন পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই লক্ষণীয়, তবু হিন্দু সভ্যতা হল বিদেশী আর্যমার্কা অথচ অন্যান্য অনুরূপ অঞ্চলে টয়েন্‌বি নির্দিষ্ট হেলেনিক, পশ্চিম ইয়োরোপীয়, পূর্ব ইয়োরোপীয়, ইরানী ইত্যাদি সমাজে আর্যপ্রভাব আর বিদেশী রইল না—এও কম বিচিত্র নয়। বৈদিক ও পরবর্তী হিন্দু সংস্কৃতি, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃত ভাষা সবই বহিরাগত এক ধাক্কার ফল—দেশের মাটি ও সাধারণ লোকের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধটা বিরোধের —এ তত্ত্বও চমকপ্রদ। গোটা বৌদ্ধ সংস্কৃতির উৎপত্তিটা কোন্ বিদেশী অনুপ্রেরণায় তাও রয়ে গেল অব্যক্ত। নীরদবাবুর ব্যাখ্যায় ভারতে বহিরাগত ধাক্কাগুলি বিশ্বপ্রকৃতির ব্যাখ্যার First Causeকে মনে আনে। ভারতীয় আর্য সমাজে বহির্বিশ্বের উপর নির্ভর নগণ্য, ইসলামিক ভারতে অবশ্য বাইরের সঙ্গে ধর্ম ও আইনগত যোগটা প্রত্যক্ষ কিন্তু সেইজন্য টয়েন্‌বি পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান সমষ্টিকে এক সমাজের অন্তর্গত করতে ভরসা পান নি। খাঁটী মুসলমান ধর্ম, ভাষা, রীতিনীতি যদি মধ্যযুগীয় ভারতসভ্যতার প্রধান নির্দেশক হয়, তবে সে-যুগের মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব ইয়োরোপ থেকে ভারতকে স্বতন্ত্র করে দেখবার প্রয়োজন কোথায়? মধ্যযুগের ভারতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের পাশাপাশি অবস্থান ও পারস্পরিক প্রভাবকেও এভাবে তুচ্ছ করে দেখবার অর্থ কি?

হিন্দু ও মুসলমান আমলকে ব্যাপ্ত করে এক ভারতীয় সভ্যতার অস্তিত্ব ও স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ গ্রন্থকার-কল্পিত দুই পৃথক সমাজের থিওরির চাইতে কম শক্তিশালী নয়। কারণ ভারতীয় জনগণের জীবন যাত্রার ধরন, গ্রামসংগঠন, সমাজসংস্থান মোটামুটি একই ধরনের থেকে যায় বহুদিন ধরে। প্রচলিত মতে সে-সভ্যতা বিবর্তিত হয়ে আজও বিদ্যমান। আর যদি বিরাট আর্থিক পরিবর্তনে সামাজিক আকৃতি ও প্রকৃতি বদলে যায় বলে স্বীকার করি, তবে ব্রিটিশ শাসনের প্রকোপে পুরাতন কাঠামো ভেঙে পড়ায় নূতন ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছে এ কথা বলা চলে। গ্রন্থকারের নির্দিষ্ট তিনটি পৃথক সভ্যতার অস্তিত্ব তাই এক চমকপ্রদ মত হিসাবেই চিহ্নিত হবার সম্ভাবনা।

আসলে মনে হয় ভারত-ইতিহাসের ব্যাখ্যা এ গ্রন্থে গৌণ কথা। গ্রন্থকারের মনের নিবিড় অনুভূতিকে একটা বৈজ্ঞানিক রূপ দেবার ইচ্ছা থেকে তার উৎপত্তি। কাম্য আদর্শের সন্ধানে প্রথম যৌবনে তিনি নিজেকে একটা চিন্তাজগতের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন, তার দেশীয় উপাদান ছিল বাংলার নবজাগরণের রঙীন ছবি আর বিদেশী আশ্রয় ও পটভূমিকা হল ইয়োরোপীয় ধ্যানধারণার পুরাতন আংশিক একটা দিক। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সে-জগৎ ভগ্নপ্রায়, নবজাগরণের বাহকশ্রেণী অবনত ও অবসন্ন, নূতনের পদক্ষেপে ইয়োরোপও আজ আবর্তের মধ্যে এবং গ্রন্থকারের চোখে পথভ্রষ্টপ্রায়। এ অবস্থায় ভারতের ক্ষেত্রে তাঁর মনে বাজছে যুগাবসানের সুর। যেহেতু সাধারণ লোক নীরদবাবুর কাছে মূর্খ বর্বর জনতা মাত্র, সেই জন্য ভারত কিম্বা ইয়োরোপে আশার রেখা তাঁর কাছে অজ্ঞাত। নিজস্ব প্রাথমিক স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খায় এমন প্রাণশক্তির সন্ধান তিনি তাই অনিবার্যভাবে দেখতে পান একমাত্র ধনিকতন্ত্রী আমেরিকায়। নীরদবাবু তাই পথ চেয়ে আছেন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক্ষায়—এই বিদেশী শক্তিই নাকি ভারত-উদ্ধারের একমাত্র উপায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ইতিহাস-দর্শন রচিত। ভারতীয় সভ্যতার অনুপ্রেরণা যদি বিদেশী সংস্কৃতিতে আরোপ করা যায় তাহলে ত্রাণকর্তা আমেরিকার আগমন একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু আমেরিকা তো ইয়োরোপীয় সভ্যতারই সন্তান। সুতরাং গ্রন্থকারকে বলতে হয়েছে যে প্রকৃতপক্ষে ভারতের তৃতীয় অর্থাৎ ইণ্ডো-ইয়োরোপীয় সভ্যতার এখনও সমাপ্তি ঘটে নি, তারই মধ্যে আমরা জোয়ার-ভাঁটার খেলা দেখছি মাত্র। আমেরিকার ইন্‌জেক্‌শনে আমাদের নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হবে। অতএব মাভৈঃ।

নীরদবাবু সান্ত্বনালাভ করুন, ক্ষতি নেই। কিন্তু ইতিহাসের গতি বিচিত্র, এবং বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় তাঁর স্থিরসিদ্ধান্ত ভেঙে পড়ার সম্ভাবনাই বেশী।

॥ পরিচয় : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯ (১৯৫২) ॥

অতীত ও বর্তমান

দেশ বিদেশে ইতিহাসচর্চার অগ্রগতি সম্বন্ধে ইতিহাস-অনুরাগী পাঠকদের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। আমাদের ইতিহাস-পরিষদের আদি পরিকল্পনার মধ্যেও বাংলা ভাষায় এই বিষয়ে আলোচনার একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল। 'অতীত ও বর্তমান' নামে এক নূতন ইংরাজি ঐতিহাসিক পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যা কিছুদিন আগে আমাদের হাতে আসে, প্রকাশের তারিখ গত বৎসরের ফেব্রুয়ারি ও নভেম্বর মাস। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ইংল্যাণ্ডে ইতিহাস আলোচনায় এই কাগজটির আত্মপ্রকাশ একটি স্মরণীয় ঘটনা, তাই এর কিছুটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

অন্যান্য বহু পত্রিকার মতন 'অতীত ও বর্তমানের' সঙ্গেও লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতেরা সংশ্লিষ্ট আছেন। সম্পাদক মণ্ডলীর অনেক নামই সুপরিচিত—যেমন, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাগৈতিহাসিক-বিদ্যার অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপক জোনস্, লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যযুগের ইতিহাসের অধ্যাপক ব্যারাক্লো, লণ্ডনে মধ্য-ইয়োরোপীয় ইতিহাসের অধ্যাপক বেট্‌স্, কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজের শিক্ষক মরিস ডব, এবং অক্সফোর্ড্ বেলিয়ল কলেজের শিক্ষক ক্রিস্টফার হিল। কিন্তু 'অতীত ও বর্তমানে'র বৈশিষ্ট্য এখানে নয়। এর উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও গবেষণার নির্বিশেষ প্রচার নয়, অন্য কিছু। পত্রিকার পরিচালকদের মতে ইতিহাস-আলোচনায় আমরা আজ একটা সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছি, অস্বাস্থ্যকর ও অবৈজ্ঞানিক ঝোঁক বর্জন করবার চেষ্টার সময় এসেছে, ইতিহাসের মৌলিক প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্টতর চিন্তার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বিচ্ছিন্ন নানা বিষয়ে নানা তথ্য আবিষ্কারে ঐতিহাসিকের কর্তব্য

শেষ হয় না, বিজ্ঞানসম্মত বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের গতি ও ধারার স্পষ্টতর ধারণা গড়ে তোলার প্রচেষ্টার ভিতরেই ইতিহাসের সার্থকতা।

বিশেষ কোনও মতবাদ প্রচার 'অতীত ও বর্তমানে'র লক্ষ্য নয়, সম্পাদক ও পরিচালকেরা সকলেই এক মতাবলম্বী মনে করলে অন্যায় হবে। কিন্তু এই নূতন পত্রিকার প্রকাশের পিছনে একটা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী আছে, প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে ও প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সাধারণ দৃষ্টির আলোতে নানা যুগের ইতিহাসে অনেক প্রশ্ন মূর্ত হয়ে ওঠে। সম্পূর্ণ উত্তরের চাইতে প্রশ্নগুলির উপস্থাপনাতেই পত্রিকাটির বিশেষত্ব চোখে পড়বে।

দুই

ইতিহাসের প্রকৃত রূপ কি? 'অতীত ও বর্তমান' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মুখবন্ধে সম্পাদক মণ্ডলী এই মূল প্রশ্নের অবতারণা করেছেন।

ঐতিহাসিক-মহলে একটা সাধারণ বিশ্বাস আছে যে কোনও অতীত যুগ সম্বন্ধে যথা সম্ভব 'ফ্যাক্ট্' সংগ্রহ করে তার একত্র পরিবেশনই ঐতিহাসিকদের একমাত্র কর্তব্য, অর্থাৎ ইতিহাস অতীত মুহূর্তের ফোটোগ্রাফ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সহজেই বোঝা যায় যে অতীতের সমস্ত ঘটনা জানতে পারা কখনোই সম্ভব হয় না, এবং সম্ভব হলেও সকল ফ্যাক্ট্ই যে তুল্যমূল্য এ বিশ্বাসেরও কোনও যথার্থ হেতু নেই। বস্তুত, তথ্যের সমাবেশ ইতিহাসের মালমশলা সংগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়, তথ্যের বিশ্লেষণেই ইতিহাসের আসল সার্থকতা। রোমের প্রাচীন ঐতিহাসিক পলিবিয়াস ঠিকই বলেছেন যে ফ্যাক্ট্ সংগ্রহ চিত্তাকর্ষক প্রয়োজনীয় কাজ, কিন্তু সে-কাজ কখনও যথেষ্ট হতে পারে না, কার্যকারণ নির্ণয়ই হল ইতিহাসের প্রকৃত লক্ষ্য।

বিশ্লেষণই ইতিহাসের প্রধান কাজ হলে কিছু কিছু সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছোনোও অপরিহার্য। ইতিহাসের গতির বিষয় খানিকটা সাধারণ ধারণা এইভাবে আমাদের মনে এসে পড়তে বাধ্য। ধারণা অবশ্য মনগড়া ধারণা

হলে চলবে না, জানা ফ্যাক্টের কষ্টিপাথরে তাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, সংগৃহীত তথ্যের সামগ্রিক বিচার চাই, নূতন আবিষ্কৃত তথ্যের আলোতে ধারণাকে সংশোধিত করে চলার প্রয়োজন আছে। তবুও ফ্যাক্টের উপযোগী সাধারণ সূত্রের অনুসন্ধান ব্যতীত ইতিহাসের বিশেষ সার্থকতা থাকতে পারে না। ইতিহাস কেবলমাত্র অতীতের বর্ণনা নয়, অন্যান্য বিজ্ঞানের মতন এখানেও বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগসূত্রের অন্বেষণই আমাদের উদ্দেশ্য।

সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের অনেকের মধ্যে কিন্তু ইতিহাসের মূল প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করবার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। স্বয়ং ফিশার প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ঘটনা পরম্পরার স্রোত মাত্র, ঘটনার পর ঘটনা ঘটেছে এইটুকুই সত্য, প্রকৃত যোগসূত্রের সন্ধান অথবা ঐতিহাসিক ধারার রূপ নির্ণয় পণ্ডশ্রম। ক্রোচের মতে ইতিহাসের গতিধারার রূপ আমাদেরই মনের রচনা ছাড়া আর কিছু নয়। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে যে-রোমান্টিক ভাবধারা প্রবাহিত হয়েছিল, যার মূলমন্ত্র ছিল বাস্তবকে উপেক্ষা করে কল্পনার অনুসরণ, এই লেখকদের মধ্যে আমরা যেন তারই নূতন প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। কিন্তু সকল বিজ্ঞানের গোড়ার কথা হল এই বিশ্বাস যে, বাইরের জগতের একটা বাস্তব অস্তিত্ব আছে, ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার উপর তা নির্ভর করে না। বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ হতে পারে, তবুও সেই গণ্ডির মধ্যে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। মানুষের সমাজ-জীবন একটা বাস্তব জগৎ, সুতরাং তারও বৈজ্ঞানিক অনুশীলন হতে পারে, এবং সেই অনুশীলন অথবা ইতিহাসকে মনগড়া ছবি-আঁকা কিম্বা সাহিত্যের কল্পনা বিলাসের সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলা উচিত নয় পৃথিবীর প্রথম বড় ঐতিহাসিক থিউকিডিডিসের সময় থেকে ইতিহাসের যে-আদর্শকে কখনও ধ্বংস করা সম্ভব হয় নি সে-আদর্শ হল বিজ্ঞানসম্মত পথে আংশিক হলেও বাস্তব সত্যের সন্ধান। সকল অপূর্ণতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও প্রত্যেক খাটি ঐতিহাসিকই এই পথে চলবার চেষ্টা করেছেন।

ইতিহাসের আসল বিষয়বস্তু হল পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনার বিবরণী নয়,

ঘটনাস্রোতের সাধারণ রূপ নির্ধারণ। সেই রূপ নির্ধারণ আবার ব্যক্তিবিশেষের কল্পনাবিলাস নয়, বাস্তব জীবনের যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক অনুশীলনই তার প্রকৃতি। কিন্তু অতীতের প্রত্যেকটি ঘটনার তাৎপর্য কখনও সমান নয়, সেখানে বর্জন ও বিচারের প্রশ্ন এসে পড়তে বাধ্য। আলোচ্য পত্রিকার সম্পাদকেরা তাই চৌদ্দ শতকের সুবিখ্যাত আরব ঐতিহাসিক ইব্‌নে খাল্‌দুন লিখিত ইতিহাসের সংজ্ঞাটিকে গ্রহণ করেছেন। ইব্‌নে খাল্‌দুনের মতে ইতিহাস মানব সমাজ ও সভ্যতার বিবরণ, সমাজের রূপে যে-পরিবর্তন আসে তার কাহিনী, সমাজের এক অংশের বিরুদ্ধে অপরের সংঘাত ও বিপ্লবের বৃত্তান্ত, সমাজের পুনর্গঠন অথবা এক যুগ থেকে যুগান্তরের আলেখ্য। অর্থাৎ সমাজের রূপান্তরেই ইতিহাসের গতি, সেই রূপান্তরের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণই ইতিহাসের প্রাণ। 'অতীত ও বর্তমানে'র প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধ তাই বিভিন্ন যুগসন্ধির আলোচনার দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। সাধারণত ঐতিহাসিক পত্রিকাগুলিতে যে-সকল ধরনের প্রবন্ধ নির্বিচারে স্তূপীকৃত হয়, এখানে তার অন্যথা সহজেই চোখে পড়ে। এই বৈশিষ্ট্য ইতিহাসে উৎসুক সাধারণ পাঠককে তাই বিশেষ আকৃষ্ট করবে।

অবশ্য ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে অতি-সরল ব্যাখ্যা নিশ্চয় নিন্দনীয়। সমাজের গতি ও পরিবর্তন যান্ত্রিকভাবে আসে না, মানুষ বাইরের কোনও শক্তির পুতুল নয়, বাস্তবজীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে মানুষ নিজেই ইতিহাস রচনা করে। ইতিহাসের গতি সম্পূর্ণ আকস্মিক, কিম্বা কোনও দৈবশক্তির অজ্ঞেয় ইচ্ছা বা খেয়াল তাকে চালিত করছে—এমন ভাববাদী বিশ্বাস তাই বিজ্ঞানসম্মত চর্চার মধ্যে আসতে পারে না। তেমনি অনেক তথাকথিত বস্তুবাদী ব্যাখ্যাও নিতান্ত যান্ত্রিক ও অতি-সরল বলেই অগ্রাহ্য। উনিশ শতকে কোনও কোনও মহলে ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে ভৌগলিক অবস্থা, জলবায়ুর প্রভাব, অথবা জাতিগত চরিত্রকে স্বীকার করা হয়েছিল। কিন্তু এই 'স্বাভাবিক শক্তি'গুলি অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও সমাজ-জীবনে প্রচুর পরিবর্তন ও রূপান্তর লক্ষ্য করা মোটেই বিচিত্র

নয়। আসলে মানুষের ইতিহাস গড়ে ওঠে নানা সংঘাত ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। সেগুলি সমাজ-জীবনের বাইরের কোনও শক্তির সাক্ষাৎ ফল নয়। আবার তাদের আকস্মিক কিম্বা ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল হিসাবেও ব্যাখ্যা করা চলে না, মানুষের কাজের পিছনে থাকে বাস্তব অবস্থার চাপ। অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের মতন ইতিহাস-চর্চার পক্ষেও সেই বাস্তব অবস্থার অনুশীলন কাম্য এবং সম্ভবপর।

তিন

ইতিহাসে ব্যক্তিবিশেষের জীবনীর স্থান কোথায়? মার্টিন লুথারের অধুনাতম জীবনবৃত্তান্ত সমালোচনা-প্রসঙ্গে বার্মিং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রয় প্যাস্‌কাল দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন।

জীবনচরিতের লেখকেরা অনেক সময়েই আলোচ্য ব্যক্তির চিন্তা ও কর্মের উপর সমস্ত দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা তখন নিতান্তই গৌণ হয়ে ওঠে। ব্যক্তিবিশেষ তখন ইতিহাসের নায়করূপে চিত্রিত হন, ফলে সত্যের অনেকটা অপলাপ ঘটে এবং ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের ভারসাম্য নষ্ট হয়। মহাপুরুষ নায়ক যখন তাঁর প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন, তখন তার দায়িত্বও আরোপিত হয় তাঁরই চারিত্রিক কোনও দুর্বলতার উপর, অথবা পার্শ্বচর ও অনুচরবর্গের অক্ষমতা বা পদস্খলনে। বীরপূজার একটা স্থূলভ প্রবৃত্তি আমাদের মনে আছে, কিন্তু ইতিহাসে তার এই প্রয়োগ এক ধরনের অতি-সরল ব্যাখ্যা।

নায়ক-সর্বস্ব ইতিহাসের ধারণা ইতিহাসের বিকৃতি ছাড়া কিছু নয়। সমগ্রকে খণ্ডিত করে অংশবিশেষের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া এর স্বভাব। নায়কের চিন্তাকে যখন আমরা ইতিহাসের চালক হিসাবে দেখি তখন সেই চিন্তা যে কি করে উদিত ও গঠিত হল তার কথা মনে রাখি না, তার উপর অন্য চিন্তা বা পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও অবস্থার প্রভাবের কথা বিস্মৃত হই, মহাপুরুষ তখন যেন স্বয়ম্ভূরূপে দেখা দেন। নায়কের কর্মকে যখন আমরা

যুগান্তকারী আখ্যা দিই তখন কাজের মধ্যে অন্যের অবদান ও অনুকূল অবস্থার যোগাযোগকে আমরা উপেক্ষা করি, অথচ উপযুক্ত সহকর্মী বা সৈন্যদল ছাড়া মহান সেনাপতিও যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন না, পূর্বগামীদের প্রয়াস ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সুযোগ ব্যতীত মৌলিক প্রতিভাও সফল হয় না। আসলে মহান ব্যক্তি নিঃসঙ্গ নন, ইতিহাসের কোন মুহূর্তেই একজন কর্তা ও অপর সকলে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না, এবং ঘাত-প্রতিঘাতের নিয়ম অনুসারে ব্যক্তিবিশেষের কৃতিত্ব অথবা অক্ষমতার ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে আসে। এই সত্য বিস্মৃত হলে জীবনচরিতে ঐতিহাসিক মর্যাদার ক্ষয় হতে বাধ্য।

জীবনচরিত-লেখকের তাই তাঁর নায়কের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ঘটনার আলোচনা করলে চলে না, তাঁকে বিচার করতে হয় বাইরে থেকে সব দিকের প্রতি নজর রেখে। নায়কের নিজের অথবা ভক্তের কাছে তার চিন্তা সম্পূর্ণ মৌলিক অথবা নিজস্ব মনে হতে পারে, ঐতিহাসিক সে-ভুল করবেন না। মহাপুরুষ সার্থকতা খোঁজেন নিজের আদর্শের মধ্যে, ব্যর্থতার দোষ পড়ে অন্যের উপর। ঐতিহাসিক দেখবেন, সে আদর্শের উৎস কোথায়, আদর্শ সময় ও অবস্থার উপযোগী কি না, সাফল্য বা বিফলতার বাস্তব কারণই বা কোন খানে। ব্যক্তির সংকল্প ও ফলাফলের মধ্যে ইতিহাসে দুস্তর পার্থক্যের কথা সর্বজনবিদিত। ইতিহাসের প্রবাহ মহাপুরুষের সৃষ্টি, এই বিশ্বাসের ভুল এতেই প্রমাণিত হয়। প্রকৃত জীবনচরিত-লেখক নায়কের ধ্যানধারণায় অভিভূত হয়ে পড়েন না, তিনি খোঁজেন তার প্রকৃত উৎস ও প্রকৃতি, এবং তার প্রধান লক্ষ্য হল নায়কের কাজের বাস্তব ফলাফলের আলোচনা। সমগ্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝতে না পারলে তাই কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে ঐতিহাসিক যথাযোগ্য মূল্য দিতে পারেন না, তার প্রকৃত বিচার সম্ভব হয় না।

যুগমানব বলে একটা কথার বহুল প্রচলন আছে। নেতৃস্থানীয় মানুষকে যুগস্রষ্টা হিসাবে কল্পনা করা কিন্তু আংশিক সত্য ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃত যুগমানব সর্বদা যুগেরই উপযোগী লোক, যুগের বাস্তব গতির সঙ্গে তাঁর নিবিড় মিল থাকে। কোনও সময়ে ইতিহাসের প্রবাহ যেদিকে, বহুলোকের

চিন্তা ও কাজে যে-প্রবাহ গড়ে ওঠে, যে-প্রবাহের শক্তি ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে মহাপুরুষের মাহাত্ম্যও যে ম্লান হয়ে আসে এব প্রমাণ ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে।

চার

'অতীত ও বর্তমান' কাগজটিতে কেবল ইতিহাসের মূল প্রশ্নের আলোচনা আছে তা নয়। অতীতের অনেক সন্ধিক্ষণ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ রচনার পরিচয় ও সমস্যার উত্থাপন প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় সংখ্যায় গডন চাইল্ডের লেখার বিষয়বস্তু হল মানব-সভ্যতার আদি জন্ম। প্রথম সভ্যতার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য কি, এ সম্বন্ধে অমীমাংসিত সমস্যাই বা কোন্‌গুলি?

বেশির ভাগ ঐতিহাসিক স্বীকার করবেন যে যাকে আমরা মানব-সভ্যতা বলি তার প্রথম উদয় মিশরের নীল নদ ও মধ্যপ্রাচ্যে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস এই দুই নদীর উপকূলে। সভ্যতার উন্মেষের আনুমানিক তারিখ তাঁদের মতে পাঁচ হাজার বছর আগে। প্রথম সভ্যতার প্রতিষ্ঠা মানুষজাতির জীবনে একটা বিশিষ্ট স্মরণীয় ঘটনা বলা চলে, একে ইতিহাসের প্রথম সন্ধিক্ষণ মনে করলে নিতান্ত অন্যায় হয় না। দু'টি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় একই সময়ে যে-সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করল, অধ্যাপক চাইল্ড্ তার ছ'টি বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছেন। (১) অনুমান করা যায় যে সমাজে মোট লোকসংখ্যা উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এটা অনুমান হলেও ভিন্ন ভিন্ন লোকালয়ের আয়তন যে বেড়ে গেল তার কোনও সন্দেহ নেই। প্রাগৈতিহাসিক গ্রাম যে বহুস্থলে এই প্রথম নগরের আকার গ্রহণ করল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। নগরের উদ্ভব তাই সভ্যতার প্রথম লক্ষণ। (২) দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল বিরাট সৌধ নির্মাণ, যেমন বড় বড় মন্দির ও সমাধি। অতি প্রাচীন আবাসের তুলনায় এদের আকার যে অনেক বড় তার প্রমাণেরও কিছু অভাব নেই। (৩) জনসংখ্যা যে অনেক বেড়ে গেল শুধু তাই নয়। সামাজিক কাজে নানা ধরনের বৈচিত্র্য দেখা গেল। সুমের ও মিশর দুই দেশেই শুধু

কৃষিকার্যের বদলে জীবিকা উপার্জনের নানাবিধ উপায়ের সন্ধান পাওয়া যায় এই প্রথম, সমাজ-জীবনে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত বিশেষজ্ঞের সৃষ্টি হল বলা চলে। (৭) এই শ্রমবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শাসিত শ্রেণীদের উপর শাসক শ্রেণীর কর্তৃত্ব স্থাপন একটা লক্ষণীয় ব্যাপার। গোটা সমাজের উৎপন্ন দ্রব্যের একটা উদ্বৃত্ত অংশ সঞ্চিত হয়ে প্রথমটা শাসকদের হস্তগত হতে থাকে, তারপর তাদের নির্দেশমত সেই উদ্বৃত্ত খরচের ব্যবস্থা হতে পারে। উৎপাদন বৃদ্ধি (আগের তুলনায়) ছাড়া অবশ্য এটা সম্ভব হয় না, আর এমন বন্দোবস্ত চালু রাখতে হলে আমরা যাকে রাষ্ট্র বলি তার সংগঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। (৫) সভ্যতার পঞ্চম চিহ্ন লিপির প্রচলন। পৃথিবীর প্রাচীনতম লেখার নিদর্শন মিশর ও সুমের-এর এই যুগেই পাওয়া যায়, লেখার উদ্ভাবনার ফলে নামধামের উল্লেখ ও হিসাব-পত্রের ব্যবস্থা এই প্রথম স্থায়ীভাবে সম্ভব হল। (৬) ষষ্ঠ বিশেষত্ব আর্টের এক নূতন পর্যায়, যার উদাহরণ দেখা যায় মানুষের দেহের প্রথম সার্থক প্রতিকৃতির মধ্যে।

মিশর ও সুমেরে যখন সভ্যতা শুরু হয় তখন দুই দেশের মধ্যে কিছু কিছু তফাত সহজেই চোখে পড়ে। সুমেরে অসংখ্য নগর ছিল, মিশরে তাদের সংখ্যা অল্প। মিশরে সৌধগুলি প্রধানত সমাধি, সুমেরে মন্দির। কারিগরী বিদ্যায় দুই দেশে ব্যবহৃত হাতিয়ারের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যায়। উৎপন্ন মালের উদ্বৃত্ত সংগ্রহের ব্যবস্থাও ছিল ভিন্ন ধরনের। দুই অঞ্চলের লিপি অনেকটা স্বতন্ত্র। আর্টের রীতিও ঠিক এক ছিল বলা যায় না। কিন্তু তফাত সত্ত্বেও মিল ছিল এত বেশি, আগেকার জীবনযাত্রার তুলনায় পরিবর্তন এতই বিরাট, ঠিক এক সময়ে দুই সমাজের সাধারণ চেহারা এত এক ধরনের যে, মানবজাতির ইতিবৃত্তে এক নূতন পর্যায় অর্থাৎ সভ্যতার উৎপত্তি এইখানেই এ কথা অত্যুক্তি হবে না।

তবুও প্রশ্ন থাকে যে মিশর ও সুমেরে একই সময়ে দু'টি পৃথক সভ্যতার উত্থান হয়েছিল, না তারা মূলত এক? মিশর থেকে সুমেরে সভ্যতা ছড়িয়ে

পড়েছিল, ও সুমের থেকে সভ্যতা মিশরে প্রবেশ করে, পরস্পরবিরোধী আগেরকার এই দুই মতই অধ্যাপক চাইল্ড্ বর্জন করেছেন। অজানা কোনও অঞ্চল থেকে উভয় দেশ সভ্যতা ধার করেছিল এ মতও অগ্রাহ্য। মনে হয় একই ধরনের বাস্তব অবস্থার চাপে একই সময় দুই দেশ সভ্যতার স্তরে উন্নত হয় এবং প্রথম থেকে দুই-এর মধ্যে যোগাযোগ ও আদান-প্রদান চলতে থাকে। এই বিশ্বাস সত্য হলে সভ্যতার আগমন মূলত একই ঘটনা, কারণ পরবর্তী প্রায় সকল সভ্য সমাজই অনেকাংশে মিশর-সুমেরের কাছে ঋণী। 'সভ্যতার জন্ম' তাহলে নিতান্ত নিরর্থক কথা নয়।

সামাজিক উৎপাদনের উদ্বৃত্ত অংশ হস্তগত করে শাসক শ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রকৃতিটা কি-ধরনের ব্যাপার সে-প্রশ্নও মনে আসতে পারে। একদিক থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে উৎপাদনের শক্তির বিকাশ না হলে এই নূতন ব্যবস্থা সম্ভব হত না, এবং সে-ব্যবস্থা না এলে ব্যাপকভাবে জলসেচের বন্দোবস্ত, ধাতুর ব্যবহার, বসতির বিস্তার, চারুকলার উৎকর্ষ ইত্যাদি মানুষের আয়ত্তে আসত না। এই দিকটাকে উন্নতি বলা চলে। অপরদিকে এ-ও সত্য যে অধিকতর সামাজিক সম্পদ জনসাধারণের ভোগে আসা, তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যাপারে বিশেষ উন্নতি হয়েছিল মনে করা শক্ত, লাভটা অনেকখানি ছিল কেবল অল্পলোকের সৌভাগ্যবর্ধনের হেতু। কাজেই সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন অংশের বিরোধ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে মনে করলে বিশেষ অন্যায় হবে না।

পাঁচ

চীনের ইতিহাস সম্পর্কে কোনও মন্তব্যের বিচার অবশ্য আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, প্রতিবেশী হলেও চীনদেশ আমাদের অজ্ঞাতপ্রায়। তবুও পিকিং-এর অধ্যাপক উ টা-কুন চীনা আর্থিক সংস্থার বিকাশের বিষয়ে যে-প্রবন্ধ লিখেছেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

পাথরের উপর নির্ভর ছেড়ে অন্তত ব্রঞ্জের আশ্রয় না নিলে সভ্যতার সূচনা হওয়া শক্ত। শাং অথবা ইন বংশের আমলে আন্দাজ খ্রীস্টপূর্ব চৌদ্দ শতকের মধ্যে চীন এই অবস্থায় উপনীত হয়েছিল বলা চলে। অজস্র নদীর কূলে কূলে অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্যের অস্তিত্ব তখন চোখে পড়ে। এদের প্রকৃতি ট্রাইবাল রাষ্ট্রের, অর্থাৎ প্রত্যেক জনপদে লোকসমষ্টির একটা বংশগত ঐক্য ছিল অথচ সাধারণ লোকের উপর শাসক শ্রেণীর কর্তৃত্বও ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে। চু বংশের আমলে, আন্দাজ খ্রীস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে, দেশব্যাপী ঐক্য স্থাপিত হলেও চক্রবর্তী রাজার অধীনে খণ্ড খণ্ড রাজ্যের রাজাদের অস্তিত্ব থেকে যায়, প্রধান রাজার আত্মীয়েরাই এই সম্মান লাভ করে।

এই ব্যবস্থার নাম ফেং-চিয়েন। কথাটা আধুনিক কালে ইয়োরোপের ফিউডালিজ্‌মের প্রতিশব্দ হলেও ঠিক একার্থক নয়। ফেং-চিয়েন প্রথায় সমস্ত জমি ও সকল দাস ট্রাইবাল রাষ্ট্রের সম্পত্তি, ব্যক্তিবিশেষের মালিকানা তখনও অস্বীকৃত। রাজ্য তখনও বিভিন্ন গ্রাম-সংগঠনের সমষ্টি, এই স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম্যজীবনের ব্যবস্থার নাম ছিল চিং-টিয়েন। কয়েকটি গ্রামের উপর কর্তৃত্ব থাকতো একজন অভিজাতের, তাদের নিয়োগের ভার ছিল রাজার হাতে। তামা, টিন প্রভৃতি ধাতু শাসকদের একচেটিয়া সম্পত্তি থাকার দরুন অস্ত্রবল তাদের আয়ত্তে থাকে। স্বৈরতন্ত্র এইভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, ব্যাপক জলসেচ ব্যবস্থার সংগঠনের ভিতর দিয়ে তার প্রসার ঘটে। অধ্যাপক উ টা-কুন মনে করেন যে খ্রীস্টপূর্ব তিন শতক পর্যন্ত চীনা সভ্যতার এই প্রথম পর্যায় স্থায়ী হয়েছিল, তারপর আসে এক যুগান্তর।

চিন রাজবংশের মন্ত্রী শাং ইয়াং স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম অর্থাৎ চিং-টিয়েন প্রথার উচ্ছেদসাধন করেন কিম্বদন্তী আছে। তাঁর নূতন ব্যবস্থায় উৎপাদন-শক্তি ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায়, এবং তার ফলে খ্রীস্টপূর্ব ২২১ সনে প্রথম প্রকৃত চীন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় চিন শি-হুয়াংটির নেতৃত্বে। এই সময় থেকে চীনে যে-দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয় উনিশ শতকে ইয়োরোপীয় অনুপ্রবেশের আগে পর্যন্ত তার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় নি। শাং ইয়াং-এর সংস্কারের ফলে

জমিতে ও দাসদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার প্রবর্তন স্বীকৃত হয়, বড়লোকের সম্পত্তি বিস্তারের পথ হয় পরিষ্কার। আগে গ্রাম-সংগঠনকে রাষ্ট্রের হাতে উৎপন্নের একটা অংশ কর হিসাবে দেওয়া মাত্র সকল পাওনা শোধ হয়ে যেত; এখন সরকারের কর ছাড়াও জমিদারের প্রাপ্য খাজনার ভারের সূচনা হল। 'সংস্কারের' কিছু পরবর্তী লেখকেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে এবার সাধারণ লোকের দুরবস্থা কায়েমি ভাবে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। জমি কেনাবেচা প্রথার কল্যাণে বড় লোকদের হাতে জমি সঞ্চিত হতে থাকে, অন্যদিকে বেড়ে যায় ছোট চাষী, কারিগর ও ভূমিহীন কৃষকের দুর্দশা। চীনা সমাজ দুই হাজার বৎসর এই তীব্রভাবে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় বাস করে এসেছে, অভিজাত শাসক ও দীন জনসাধারণের মধ্যে বিরোধেরও অভাব ঘটে নি। সম্ভ্রান্ত ভদ্র অর্থাৎ ধনী পরিবারেরা এবং সেই সব বংশের শিক্ষিত আমলা সম্প্রদায় (শতাব্দীর পর শতাব্দী রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করে এরাই) উভয়ে মিলে অভিজাত শ্রেণী গঠিত হয়, এর সাধারণ চীনে নাম তু-হাও। লবণ ও লোহা সরকারের সম্পত্তি বলে গণ্য ছিল, জমির উপর কর্তৃত্ব জমিদারের। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হওয়ায় চীনদেশে বারবার বণিকদের ধনদৌলত বাড়তে থাকে বটে, কিন্তু উৎপাদনের উপাদান তাদের হাতের বাইরে, তাদের কাজ ছিল কেবলমাত্র উৎপন্ন মাল স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে কেনাবেচা করা। তাই ধনী হওয়া মাত্র বণিকেরা অভিজাত শ্রেণীর কোলের মধ্যে স্থান পেয়ে তাদের সঙ্গে মিশে যেত বলা চলে। সামাজিক পরিবর্তনে বণিকেরা তাই কোনও অবদান রেখে যেতে পারে নি। এক হিসাবে সমাজের মেরুদণ্ড ছিল অগণিত ছোট চাষী। কিছুদিন পর পর ঋণভারগ্রস্ত কৃষকদের অসন্তোষ বিস্ফোরণের মতন ফেটে পড়ত, অন্তর্যুদ্ধ ও বিদ্রোহের ঢেউ-এ তখন এক রাজবংশের পতন ও অন্যের উত্থান দেখা যায়। নূতন রাজাদের কল্যাণে প্রথম কিছুদিন সাধারণ লোকের অবস্থায় কিছুটা উন্নতি আসত, কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকায় আবার আগের দুরবস্থা বারবার ফিরে আসতে থাকে।

কুড়ি শতাব্দী ধরে চীনের ইতিহাসের স্বরূপ এই। রাজবংশের উত্থান-পতনের জোয়ার-ভাঁটা সত্ত্বেও সমাজে মৌলিক কোনও বদল নেই, শুধু চোখে পড়ে পূর্বাঞ্চলের সেই প্রসিদ্ধ চিরন্তনী এক ভাব। তারপর উনিশ শতকে বিদেশী দস্যুর নিষ্ঠুর করাঘাতে সনাতনী সমাজে ভাঙন ধরল। উপনিবেশ-স্থানীয় চীনে কিন্তু ইয়োরোপাগত ধনতন্ত্র বলিষ্ঠভাবে গড়ে উঠতে পারে নি, একদিকে বিদেশী চাপ, অন্যদিকে আমলাতন্ত্র ও অভিজাত তু-হাও শ্রেণী আর্থিক পরিবর্তনের কণ্ঠরোধ করে থাকল। এই দুই বাধার অপসারণে ১৯৪৯-৫০এর চীন-বিপ্লবই সম্ভবত সে-দেশের ইতিহাসে প্রকৃত নূতন এক যুগের সূচনা করল।

ছয়

প্রথম পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ইতিহাসে খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতকের এথেন্স সুবিখ্যাত, এর পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক কোনও রাষ্ট্রে এতখানি গণতান্ত্রিক শাসনের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই নগররাষ্ট্রটির স্বরূপ ও আর্থিক প্রকৃতি সম্বন্ধে কেম্ব্রিজের অধ্যাপক জোনস আলোচনা করেছেন।

নিছক গণতন্ত্র হিসাবে এথেন্স্ যে শুধু সময়ের দিক থেকে প্রথম তা নয়, এর গণতান্ত্রিক রূপ পরেও কখনো অতিক্রান্ত হয়েছে কি না সন্দেহ। এথেন্সের স্বপক্ষে এতো বড় দাবি উপস্থিত করবার সঙ্গত কারণ কি পাওয়া যায়?

(১) এথেন্স্-রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের অধিকার ছিল নগর-পরিষদের প্রতি অধিবেশনে উপস্থিত থেকে রাষ্ট্রচালনায় প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তে অংশ গ্রহণ করা। এ অধিকার নিতান্ত মামুলি কথার কথা নয়, কারণ প্রায় সকল ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিষদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল, এবং প্রতি বৎসর পরিষদের নিয়মিত বৈঠকের সংখ্যা ছিল চল্লিশ। (২) বৈঠকের কার্যক্রম ঠিক করবার জন্য একটা সংসদ ছিল, তার পাঁচশ সভ্যও রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে এক বৎসরের জন্য লটারির দ্বারা নির্বাচিত হত, সংসদের অপর কাজ ছিল রাষ্ট্র-

কর্মচারীদের কর্তব্য পালনের তদারক করা। (৩) দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্য ছোট বড় অনেক কর্মচারী চোখে পড়ে, তাদের নিয়োগের রীতি ছিল প্রাপ্তবয়স্ক সকল যোগ্য নাগরিকদের মধ্য থেকে প্রতি বৎসর লটারির সাহায্যে নির্বাচন, অর্থাৎ সকল নাগরিকের সরকারী পদ পাবার সমান সম্ভাবনা এ ব্যবস্থার মূল কথা। এথেনীয়দের মত ছিল যে (এখনকার মতন) ভোটে নির্বাচনে পর্যন্ত পক্ষপাতিত্ব ও অন্যায় তদ্বিরের প্রভাব থাকে, অথচ নাগরিকদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান অধিকার প্রতিষ্ঠাই তাদের গণতান্ত্রিক আদর্শের মর্মস্থল। অবশ্য এ ব্যবস্থার অন্যথা দেখি সেনানায়ক ও হিসাব পরীক্ষকের পদে, যেখানে বিশেষজ্ঞ ছাড়া কাজ চলে না, কিন্তু তাদেরও নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত হতে হত প্রতি বৎসরের জন্য। (৪) জনগণের বিচারালয়ের হাতে প্রায় সমস্ত বিচারের কাজ ন্যস্ত ছিল। লটারি-নির্বাচিত ছয় হাজার নাগরিকের মধ্য থেকে প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন মামলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাগরিক-সমষ্টি নিয়ে ন্যায়াধিকরণ গঠিত হত। উচ্চ কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে দেশবাসী প্রত্যেকেই এই জন-আদালতের কাছে দরকার মত জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিল। (৫) গরীব নাগরিকরাও যাতে কাজের ভার নিতে পারে তাই সরকার থেকে অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা ছিল। কেবল কর্মচারীরা নয়, বিচার-রত আদালত ও সংসদের সভ্যরা এবং শেষ পর্যন্ত পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত অনেক নাগরিক পর্যন্ত সকলেরই প্রাপ্য দৈনন্দিন ভাতা বরাদ্দ থাকে।

এথেন্সের রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের পরিচিত আধুনিক গণতন্ত্রের দুস্তর পার্থক্য। এর কারণ মাত্র এই নয় যে, এথেন্স্ ছোট নগররাষ্ট্র আর আজকাল-কার রাজ্য আয়তন ও লোকসংখ্যায় অনেক বড়। সকল নাগরিকের সমান অধিকারের আদর্শ এথেন্সে যতখানি বাস্তব রূপ নিয়েছিল এখন নিছক আদর্শ হিসাবেও তার প্রভাব ক্ষীণতর, আবার নাগরিকের সংজ্ঞা আমাদের তুলনায় এথেনীয়দের কাছে সংকীর্ণতর বলা চলে। এর থেকে একটা মূল্যবান সিদ্ধান্ত টানা যায় যে গণতন্ত্র ইত্যাদি আদর্শের ঠিক চিরন্তনী রূপ পাওয়া যায়

না। আজ অনেকে যে মনে করে যে, পশ্চিমী পার্লামেন্টারি পদ্ধতি ও গণতন্ত্র অভিন্নার্থ তার ঐতিহাসিক সমর্থন নেই।

প্রশ্ন ওঠে যে এথেনীয় গণতন্ত্র অনেকটা সীমাবদ্ধ কি না। সীমাবদ্ধ, এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তির আশ্রয় এখানে অনুচিত মনে হয়। যেমন মেয়েদের রাস্ট্রিক অধিকার না থাকা এই সেদিন পর্যন্ত সর্বত্র নিতান্তই স্বাভাবিক গণ্য হত, আধুনিক গণতন্ত্রের উৎস ফরাসী বিপ্লবেও এর স্থান ছিল না। মেটিক অথবা বিদেশোদ্ভূত এথেন্স্‌বাসীদের রাস্ট্রিক অধিকার না থাকাটাও গ্রীক ধারণা অনুসারে স্বাভাবিক। গ্রীকদের বিশ্বাস ছিল যে, বিশেষ কোনও নাগরিক-সমষ্টির বংশগত ঐক্য থাকা উচিত; অর্থাৎ একদেশে বাস করলেও ভিন্নদেশীয় লোকের পৃথক জাতীয়ত্ব লোপ পায় না। কিন্তু এথেনীয় গণতন্ত্রকে খর্ব করার পক্ষে আর দুটি যুক্তিকে এত সহজে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। প্রথম যুক্তি এই যে, এথেন্সের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল সাম্রাজ্যের প্রজাদের শোষণের উপর, দ্বিতীয় যুক্তি, অগণিত দাসদের পরিশ্রমের ভিত্তির উপরই এর নির্ভর।

এথেন্স্‌-রাষ্ট্রের বৈভবসম্পদ ও তার ব্যাপক প্রভাবের মূলে ছিল সাম্রাজ্য-বিস্তার ও অধীন প্রজাদের উপর কর্তৃত্ব এতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এথেনীয় গণতন্ত্রের কাঠামো যে সাম্রাজ্যের উপর স্থাপিত এমন কথা বলা চলে না। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল এই ঐতিহাসিক সত্য যে এথেন্সে গণতন্ত্রের সূচনা সাম্রাজ্য স্থাপনের আগে। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে যখন সাম্রাজ্য লোপ পেয়ে গেছে তখনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে শুধু অব্যাহত থাকে ও নাগরিকদের প্রাপ্য সমস্ত ভাতা নগররাষ্ট্রের নিজস্ব আয় থেকে নির্বাহ হয় তা নয়, সেই পরবর্তী যুগেই দেখি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্ণতম প্রকাশ। সাম্রাজ্য ছিল এথেন্সের সম্পদ ও শক্তির কারণ, গণতন্ত্রের সঙ্গে তার অপরিহার্য যোগ ছিল না।

দাস প্রথা প্রাচীন এথেন্সে সুপরিচিত একথাও নিঃসন্দেহ, ধনদৌলত দাসদের পরিশ্রমে বিস্তার লাভ করেছিল বৈকি। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, এথেন্সের গৌরবময় যুগে উৎপাদন প্রথা দাসশ্রমের উপর পূর্ণনির্ভরশীল ভাব

অন্যায়। কৃষিকার্যে স্বাধীন ছোট চাষীদের প্রাধান্যটাই ছিল লক্ষণীয়, আর ব্যবসা বা কারিগরী কাজে দাসদের নিয়োগ প্রচলিত থাকলেও সেখানে সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য নাগরিকদেরও পরিশ্রম করতে দেখা যায়। ভাববার কোনই হেতু নেই যে অধিকাংশ নাগরিকদের নিজস্ব দাস ছিল, কিম্বা কায়িক পরিশ্রম ছাড়া তাদের জীবিকা-নির্বাহের অন্য উপায় আয়ত্তে থাকত। নাগরিকদের উপর স্তরের কিছু লোকই তখন আসলে দাসদের মালিক। কিন্তু অধিকাংশ নাগরিককে খেটে খেতে হত, সমাজের মোট উৎপাদনের বেশির ভাগটা তাদেরই পরিশ্রমের ফল। সুতরাং গণতান্ত্রিক যুগের এথেন্স্‌কে পরিপূর্ণ দাস-সমাজ বলার পথে বাধা আছে, দাস প্রথার প্রচলন থাকলেই দাস-সমাজ হয় না। প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখতে হয় যে সরকারী কাজের জন্য দৈনিক ভাতা কখনই নাগরিকদের জীবিকা-নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট হতে পারত না, সাধারণ নাগরিকদের পরিশ্রমের দায়মুক্ত অলস জীবনযাপনের চিত্রটুকু অবাস্তব। নাগরিকদের তুলনায় দাসদের সংখ্যা অনেক বেশি এমন কথাও বলা চলে না। খ্রীস্টপূর্ব ৪০৬ সালে কিছুদিনের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ দাসদের মুক্ত করা হয়, খ্রীস্টপূর্ব ৪০৩ ও ৩৩৭ সালেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত পারিষদ গ্রহণ করে, যদিও আইনের ফাঁকে প্রস্তাব কার্যকরী হতে পারে নি। এর থেকে মনে হয় যে দাস প্রথা রহিত হলেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা অব্যাহত থাকতে পারত, এবং সাধারণ নাগরিকদের তাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না। এথেনীয় বড় লোকদের অবশ্য এতে সবিশেষ ক্ষতি, অসুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যহানি ঘটত, এবং নিশ্চয় সেইজন্যই দাস প্রথা স্থায়ী হয় ও বিস্তার লাভ করে। কিন্তু এথেনীয় গণতন্ত্রের প্রধান সমর্থক ছিল সাধারণ নাগরিকেরা, বড়লোকদের এর প্রতি বিশেষ প্রীতি ছিল এমন কথা ইতিহাস বলে না।

সাত

পশ্চিম ইয়োরোপের বহুশতাব্দীস্থায়ী সুবিশাল রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে অধ্যাপক টম্‌সনের প্রবন্ধে।

উত্তর ইয়োরোপ থেকে বন্যার মতন বর্বর জাতিদের আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছিল একথা সুবিদিত। এ-ও আন্দাজ করা সহজ যে সাম্রাজ্যের ভিতরকার অবস্থা ধীরে ধীরে জীর্ণ ও দুর্বল হয়ে আসছিল। কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের শেষ পর্বে যে রাজ্যের মধ্যে প্রকাশ্য বিদ্রোহের স্রোত চলছিল এবং সে-বিদ্রোহ যে সামাজিক সংঘাত অর্থাৎ সমাজের উপর ও নিচের স্তরের মধ্যে লড়াই, এই তত্ত্ব আমাদের বিশেষ পরিচিত নয়। কিছুদিন আগে রুশ ঐতিহাসিক আল্‌পাটভ এর আলোচনা করেছিলেন। টম্‌সনের প্রবন্ধে এর দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন যে সাম্রাজ্যের ধ্বংস আপনা থেকে হয় না, অনেক লোকের চেষ্টা ও কাজের ফলে ঘটে কোনও রাজ্যের পতন, এবং তেমন লোক যে শুধু দেশের বাইরে থেকে আসে তা নয়—ভিতরের লোকদের ভূমিকাও কম না। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে বহু সংখ্যক লোককে শেষ পর্যন্ত চালিত করতে পারে শুধু সমাজের বাস্তব অবস্থা।

স্পার্টাকাস এর গুপ্ত-সঙ্ঘ দাস বিদ্রোহ অবশ্য রোমের পতনের অনেক আগে, কিন্তু সাম্রাজ্যের শেষ তিন শতাব্দীতে সমাজের অন্তর্বিরোধ তীব্র আকার নিতে থাকে। বিদ্রোহের পর বিদ্রোহের প্রধান কর্মভূমি ছিল গল অথবা ফ্রান্স ও স্পেন দেশ, অর্থাৎ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ অংশটিতে। দাবানলরূপী এই অসন্তোষের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না, কিন্তু কিছুদিন পর পর টুকরো টুকরো যে বিদ্রোহের সামান্য উল্লেখ আছে তার প্রকৃতি সর্বদাই প্রজা-বিদ্রোহের নিদর্শন, অর্থাৎ সমাজের তখনকার বাস্তব অবস্থাই তার উৎস। কিছুতেই সেই বিদ্রোহস্রোতের যেন শেষ হয় না, অথাৎ সে যুগের সামাজিক সমস্যার রূপই যেন এতে প্রকাশ পাচ্ছে। রোমান ঐতিহাসিকদের এর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যেতেও কেমন একটা অনিচ্ছা ছিল। প্রজাবিদ্রোহ দমনের কাহিনী এমন কিছু গৌরবের কথা নয় সমাজের গলদের দিকে চোখ পড়াটাও অস্বস্তিকর বৈকি।

পশ্চিম ইয়োরোপে রোমের শেষ পর্বে প্রজাবিদ্রোহীদের একটা সাধারণ

নাম দেওয়া হয়েছিল—'বাকডি'। নাম না হলেও ব্যাপারটির সূত্রপাত পাওয়া যায় আন্দাজ ১৮৬ খৃস্টাব্দে ম্যাটার্নাস্-এর বিদ্রোহে। এই নামের এক প্রাক্তন সৈনিক 'অসংখ্য শয়তানের এক দল গঠন করে।' বিদ্রোহদমনের জন্য ডাক পড়ে এক বিশাল সৈন্য বাহিনীর। কুড়ি বৎসর পরে আবার গল প্রদেশে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে চার দল রোমান সৈন্য পাঠানো হয়। আন্দাজ ২৮৪ খৃস্টাব্দে বাকডি নামের প্রথম ব্যবহার পাওয়া গেল, ইলিয়ানাস ও এমাণ্ডাস্-এর নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ সম্রাট ম্যাক্সিমিয়ান ২৮৬ সালে দমন করেছিলেন। ৩৬৪ সালের পর সম্রাট ভালেন্টিনিয়ান্‌কে অনেক বৎসর ধরে বিদ্রোহী প্রজাদের বিরুদ্ধে লডতে হয়। প্রসিদ্ধতম বাকডি বিদ্রোহ স্থায়ী হল ৪০৭ থেকে ৪১৭ পর্যন্ত। টিবাটোর নেতৃত্বে বিদ্রোহের তারিখ ৪৩৫ থেকে ৪৩৭, আবাব ৪৪২ সালে। গলের এই কয়েকটি বড বাকডি বা প্রজাবিদ্রোহ ছাডাও স্পেনে অনুরূপ যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায় ৪৪১, ৪৪৩, ৪৪৯, ৪৫৪ ও ৪৫৬ খৃস্টাব্দে। মনে হয় যে গল ও স্পেন প্রদেশ পঞ্চম শতকে বিদ্রোহী প্রজায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, সমাজ ও রাষ্ট্র অন্তর্দ্বন্দে হয়ে পড়েছিল দুর্বল হতে দুর্বলতর। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অবসান আসে এই অবস্থায় ৪৭৬ খৃস্টাব্দে।

প্রায় দুই শতাব্দী ধরে বিদ্রোহীদের বাকডি এই সাধারণ নামে অভিহিত করায় অনুমান করা সঙ্গত যে এই বিদ্রোহগুলি ব্যক্তিবিশেষের কারসাজি কিম্বা নিছক দস্যুবৃত্তি থেকে কিছু স্বতন্ত্র, এর পিছনে একই ধরনের দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক অসন্তোষ ছিল। ম্যাটার্নাস বহু গ্রাম ও অনেক বিস্তীর্ণ জমিদারী দখল করেন, অনেক বড় শহর অধিকৃত হয়, কারাগার ভেঙে বন্দীদের দেওয়া হয় মুক্তি। বাকডিদের মধ্যে অনেকে ছিল কৃষিকার্যে রত দাস অথবা সামান্য চাষী। একটি রোমান নাটকে উপহাস করে বলা হয়েছে যে, মধ্য গলে বাকডি অঞ্চলে লোকে আইন-কানুনের ধার ধারে না, প্রকৃতির নিয়মের সেখানে রাজত্ব, গাছের তলায় বিচার চলে, চাষীরা দেয় বক্তৃতা, আর জজিয়তি করে সামান্য সাধারণ লোক। অন্য একটি লেখায়

আছে যে ৪১৭ সালে যখন পশ্চিম গলে শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় তখন লোকেদের আর আপন দাসদের কাছে দাসত্ব করতে হল না। ৪৩৭ সালে এই অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনের পর আবার আইনের রাজত্ব ফিরে আসে একথাও শুনি। স্পষ্টতই মনে হয় যে বাকডি বিদ্রোহীদের লক্ষ্য ছিল সামাজিক আলোড়ন, অধিকৃত অঞ্চলে তারা সম্ভবত জমিদার ও বিত্তশালী লোকদের উচ্ছেদ করত, তখন প্রচলিত হত 'প্রকৃতির কানুন' এবং ঐতিহাসিক ও লেখক সম্প্রদায় সমেত যাবতীয় রোমান ভদ্রলোক ত্রস্ত হয়ে উঠতেন। এমন ধরনের বিদ্রোহের একটা বিশেষত্ব আছে, সমাজের বাস্তব জীবনে বিরোধের রূপ এর মধ্যে ফুটে বের হয়। রোম সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ জমিদারিগুলিতে প্রধানত দাসদের পরিশ্রমে চাষ চলত, স্বাধীন কৃষকেরাও ধার ও অভাবে বিব্রত থাকত, শহরে সংস্থানহীন গরীবের ভিড় বেড়ে চলত। সাম্রাজ্যের পতন ব্যাপারে এই আভ্যন্তরীণ বাস্তব অবস্থার ভূমিকা নিশ্চয় তুচ্ছ ছিল না। নৈতিক অবনতি, নেতার অভাব, যুদ্ধবিদ্যায় পশ্চাদ্‌গমন ইত্যাদির তুলনায় আর্থিক শোষণের ফলে সামাজিক বিরোধের ক্রমপ্রসারই রোম সাম্রাজ্যকে বেশী অবসন্ন করে ফেলেছিল এমন কথা নিশ্চয় অযৌক্তিক নয়। পূর্বাঞ্চলের ভিন্ন অবস্থায় সেই একই রোমান সাম্রাজ্য দীর্ঘতর যুগ স্থায়ী হতে পেরেছিল।

আট

ইতিহাসে আর একটি প্রসিদ্ধ সন্ধিক্ষণ ইয়োরোপীয় মধ্যযুগের অবসান। পরবর্তী আধুনিক ইয়োরোপের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হল ধনতন্ত্রের জয়যাত্রা। এই ধনতন্ত্র অথবা ক্যাপিটালিজ্‌মের উদয় কখন কি ভাবে হয়েছিল সে-প্রশ্নের উত্থাপন করেছে 'অতীত ও বর্তমান' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিল্‌টনের প্রবন্ধ।

ধনতন্ত্রের প্রকৃত সংজ্ঞা কি তার উপরই অবশ্য এর উত্তর নির্ভর করে। বাণিজ্যের বিস্তার ও ধনসঞ্চয়ের সঙ্গে ধনতন্ত্র একার্থ হলে ইয়োরোপীয়

মধ্যযুগেই তার অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যায়। বারো ও তের শতাব্দীর বণিকদের কীর্তি আলোচনায় ঐতিহাসিক পিরেন লিখেছিলেন যে, তখন চোখে পড়ে 'ক্রমান্বয়ে ধনসঞ্চয়ের প্রবৃত্তি, যাকে আমরা ধনতন্ত্র বলে থাকি।' আর এক ঐতিহাসিক তের শতকে 'বাণিজ্য বিপ্লবের' কথা বলেছেন। ফরাসী ঐতিহাসিকেরা কেউ কেউ এরও অনেক আগে ক্যারলিঞ্জিয়ান যুগের বিস্তীর্ণ জমিদারির আলোচনায় ধনিক ও ধনতন্ত্রের উল্লেখ করেছেন, মম্‌সেনের মত পণ্ডিত তার চিহ্ন পেয়েছিলেন প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যে পর্যন্ত। বস্তুত, সভ্য মানুষের ইতিহাসে প্রায় সকল যুগেই এমন পর্যায়ের সন্ধান পাওয়া যায় যখন বাণিজ্যের বিশেষ বিস্তার লাভ হয়েছিল এবং ভাগ্যবান অনেকের হাতে জড়ো হয়েছিল প্রচুর ধনদৌলত। বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ ও বিত্তশালী বড়লোকের অস্তিত্ব যখন বিভিন্ন নানা যুগে দেখতে পাই তখন কি বলতে হবে ধনতন্ত্র নূতন কিছু নয়, সে আসলে সভ্যতার সাথের সাথী?

এক সময়ে বিশ্বাস ছিল যে ইয়োরোপে মধ্যযুগের সমাজ বুঝি একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের সমষ্টি, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের ধারা বুঝি তখন লুপ্ত প্রায়। পিরেন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা দেখিয়েছেন যে মধ্যযুগেও শহর, শহরবাসী ও শহরের কারিগরী বিদ্যার আর্থিক প্রভাব নগণ্য ছিল না। দেশের মধ্যে ও দেশবিদেশে বাণিজ্য তখনও একটা লক্ষণীয় ব্যাপার, কাপড় বোনা ইত্যাদি শিল্পেরও ছিল প্রচুর প্রসার। বেল্‌জিয়ামের ফ্ল্যাণ্ডার্স অঞ্চল, ইটালি ইত্যাদি কেন্দ্রে কারিগরী শিল্পের প্রতিপত্তি তখন সামান্য নয়। নানা দেশে প্রকাণ্ড মেলা, দেশ থেকে দেশান্তরে কাঁচা মাল ও কাপড়ের চালান ইত্যাদিরও উল্লেখ করা চলে। তের ও চৌদ্দ শতকে বণিকদের নানা জায়গায় ব্যবসা সংক্রান্ত প্রতিনিধি রাখতে হত, টাকা ধার দেওয়া নেওয়ার অভ্যাস ও ব্যবস্থার ক্রমশই প্রসার হচ্ছিল। চাষের কাজেও দেখা যায় যে, মালিকের জমিতে বিনা পয়সায় খেটে দেওয়ার বদলে টাকা দিয়ে খাজনা শোধের প্রথা বিস্তার লাভ করেছে, অথচ ইয়োরোপে খাঁটি ফিউডাল রীতি হল টাকায় খাজনা মেটাবার বদলে জমিদারের জন্য বেগার খাটা।

এসব কি ধনতন্ত্রের অঙ্গ? ধনতন্ত্র কি মধ্যযুগের জীবনযাত্রার সঙ্গেও এমনভাবে জড়িত? তাহলে অন্য বহু যুগেও তো ধনতন্ত্রের এমন ধারা চিহ্ন দেখা যাবে, আধুনিক ইয়োরোপের বিশেষত্বই বা তা হলে কোথায় থাকে?

ইতিহাসে ধনতন্ত্রের ভূমিকার উপর প্রথম জোর দিয়েছিলেন মার্ক্স্‌ ও তাঁর সহকর্মীরা। ডব্‌সন প্রমুখ অর্থনীতিজ্ঞ ঐতিহাসিকেরা তাই মার্ক্সের সংজ্ঞা গ্রহণ করেছেন, পিরেনের ধনতন্ত্রের ধারণা এখানে অচল। ফিউডাল বা ক্যাপিটালিস্ট্‌ বল্‌তে মার্ক্স্‌ বুঝতেন এক একটা বিশেষ উৎপাদন পদ্ধতি যাকে আশ্রয় করে এক একটা বিশিষ্ট সমাজ গড়ে ওঠে। উৎপাদন পদ্ধতির উপর নির্ভর করে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রচলিত নানা ধারণা। ফিউডাল যুগের বৈশিষ্ট্য হল টুকরো টুকরো ভাবে উৎপাদনের কাজ চালানো, উৎপন্ন জিনিসের বেশির ভাগটা পণ্য হিসাবে বাজারে না পাঠিয়ে উৎপাদন স্থলের ছোট গণ্ডির মধ্যে তার সদ্ব্যবহার। তখনকার দিনে প্রত্যক্ষ উৎপাদনে নিযুক্ত চাষী-কারিগরের আয়ত্তে ছিল কিছু উৎপাদনের উপাদান (means of production অর্থাৎ জমি, হাতিয়ার ইত্যাদি)। অনেক উৎপন্ন মাল প্রথমটা তাদেরই সম্পত্তি, পরে বাধ্য হয়ে তা তাদের হস্তচ্যুত হয়। ফিউডাল সমাজে প্রধান শ্রেণী হল এক দিকে জমির মালিক অভিজাত জমিদার বা সামন্ত, অন্যদিকে আইনের চোখে অধিকারহীন অর্ধদাস কৃষকেরা। ক্যাপিটালিস্ট্‌ পদ্ধতি হল উৎপাদনে উন্নত কৌশলের ফলে প্রচুর উৎপাদন, এবং বাজারে কেনাবেচার জন্য প্রস্তুত মাল বা পণ্যের বিপুল প্রসার। উৎপাদনের উপাদান-গুলি তখন মালিকের সম্পত্তি, উৎপন্ন জিনিসও প্রথম থেকে মালিকের, তাই উৎপাদনে সাক্ষাৎ কর্মীদের নিজস্ব বলতে থাকে কেবল খাটবার ক্ষমতা। ক্যাপিটালিস্ট্‌ সমাজে তাই প্রধান শ্রেণী হল একদিকে ধনিক যার মূলধন উৎপাদনের উপাদান কিনে ফেলতে পারে, অন্যদিকে শ্রমিক যার নিজস্ব উৎপাদনের উপাদান না থাকাতে নিজের শ্রমশক্তি বেচা ভিন্ন গতি নেই।

ধনতন্ত্র তা হলে একটা বিশেষ ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি, নিছক বণিকবৃত্তি বা টাকা জমানো ও টাকা খরচের সঙ্গে তার অনিবার্য যোগ নেই, তাই

নানা যুগে বণিক ও ধনবানের অস্তিত্ব ধনতন্ত্র নয়। ধনদৌলত আর মূলধনকে এক ভাবা অনুচিত, মূলধনের সাহায্যে নিঃস্ব শ্রেণীকে উৎপাদনের কাজে না লাগালে ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ আসে না। বাণিজ্য ও টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসা সব সময় ধনতন্ত্র নয়। তেমনি চাষীর জমিদারকে দেয় খাজনারও নানা ধরন আছে। বেগার খাটা ছাড়া শস্যের ভাগ তুলে দিয়ে বা টাকা দিয়েও খাজনা দেওয়া চলে, তাতে ফিউডাল প্রথার অবসান হতেই হবে এমন কথা নেই।

বাণিজ্যবিস্তার বা ধনসঞ্চয়, আর ধনতন্ত্র আলাদা জিনিস। কিন্তু একথাও ঠিক যে ইয়োরোপে ধনতন্ত্রের আগমন তারা সুগম করে তুলেছিল, যদিও অন্যত্র তা ঘটে নি। প্রাথমিক মূলধনসঞ্চয় নামে এর এক বিখ্যাত বর্ণনা মার্ক্স্‌ নিজেই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ধনতন্ত্রের সোপান স্বরূপ মার্ক্স্‌-বর্ণিত প্রাথমিক সঞ্চয় শুধু বাণিজ্যবিস্তারের ফলে টাকা জমানো নয়, তার মধ্যেই পড়ে ছোট চাষী ও কারিগরদের আগেকার জীবনযাত্রা ও উৎপাদনের উপাদানের উপর অধিকার থেকে উচ্ছেদ। এর প্রথম ব্যাপক উদাহরণ সম্ভবত ষোল শতকে ইংল্যাণ্ডে জমি দখল (enclosures), এবং সুতাকাটা ও কাপড়বোনা শিল্পে রূপান্তর। নিঃস্ব শ্রেণী সৃষ্টি এবং খাস উৎপাদনে মূলধন নিয়োগ, ধনতন্ত্রের পদক্ষেপ এই সূত্র ধরেই এগিয়ে চলেছে। ইয়োরোপের ইতিহাসে পর্যন্ত এদিক থেকে গবেষণার প্রচুর অবকাশ আছে।

ইয়োরোপীয় মধ্যযুগের শেষের দিকে, অর্থাৎ বারো থেকে পনের শতকে, বাণিজ্যবিস্তার ও ধনসঞ্চয় হওয়া সত্ত্বেও সমাজের মূল চরিত্র ফিউডাল ছিল। বহুদিন পর্যন্ত বণিকেরা উৎপাদন পদ্ধতিতে এমন কিছু পরিবর্তন আনে নি, চাষীর উপর জমিদারের শোষণের ধরনটা ছিল মূলত এক। রাষ্ট্রের রূপও তাই তখন মোটামুটি ফিউডাল থেকে যায়। কেন্দ্রীভূত শাসনের প্রতিভূ প্রথম রাজারা পর্যন্ত আসলে বুর্জোয়া নন, অভিজাত জমিদারদেরই তাঁরা প্রতিনিধি। ফিউডাল সমাজও ভেঙে পড়তে থাকে অন্তর্বিরোধে, নিছক বণিকবৃত্তির প্রসারে নয়। বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিপ্লবের সুরু মাত্র বাণিজ্যবিস্তারের ফল নয়; উৎপাদন পদ্ধতিতে রূপান্তর আরম্ভ হবার পরই তার সূত্রপাত।

নয়

বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিপ্লব প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল ষোল শতকের হল্যাণ্ডে, কিন্তু সতের শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে এর প্রতিষ্ঠাই বেশি উল্লেখযোগ্য। ইংরাজ বিপ্লবে আবার প্রথম চার্ল্‌স্‌-এর সময় অন্তর্যুদ্ধ এবং ক্রম্‌ওয়েলের নেতৃত্বে সাধারণতন্ত্রী শাসনই আসল ব্যাপার, ১৬৮৮ সালের 'গৌরবময় বিপ্লব' বস্তুত পাদটীকা মাত্র। ইংরাজ বিপ্লবের প্রস্তুতি ও প্রধান পর্বে নেতৃত্ব এসেছিল প্রটেস্ট্যাণ্ট্‌ ধর্মমতাবলম্বী পিওরিটান সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে সেই পিওরিটান মতামত নিয়ে আলোচনা করেছে দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত অক্স্‌ফোর্ডের শিক্ষক ক্রিস্টফার হিল্‌-এর লেখা নিবন্ধ।

ষোল শতাব্দীর ইংরাজ সমাজ আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল আর্থিক-স্থিতিহীন বেকারদের সমস্যায়। সামন্তদের আর অজস্র আশ্রিতপোষণের ক্ষমতা ছিল না, মঠগুলি বন্ধ হওয়াতে গরীবদের সবিশেষ ক্ষতি হতে থাকে। ছোট চাষীরা জমি থেকে হচ্ছিল বিতাড়িত জমি দখলের চাপে, জমিদারেরা বেশি লাভের প্রত্যাশায় চাষের বদলে ভেড়ার পাল রাখতে আরম্ভ করে, গ্রামের জমিতে আর বহুসংখ্যক লোকের জীবিকা উপার্জনের উপায় রইল না। ফিউডাল সমাজ ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছিল, সমাজের রূপান্তর আরম্ভ হয়েছিল। মার্ক্সের ভাষায় নিঃস্ব শ্রেণীর উৎপত্তি হচ্ছিল এই ভাবে। দেশব্যাপী গোলযোগের ভয়ে টিউডার সরকার অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে প্রতি এলাকায় অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করে স্থানীয় বেকারদের কিছুটা সাহায্যদান প্রথা প্রবর্তন করে। ইংরাজিতে এর নাম Poor Laws, কিন্তু এই আইন-কানুনের অপর এক লক্ষ্য নিতান্ত অথর্ব ছাড়া অন্যদের সাহায্য না দিয়ে ও ভিক্ষাবৃত্তিকে দণ্ডনীয় অপরাধে পরিণত করে সমর্থ বেকারদের যে-কোনও ধরনের কাজ করাতে বাধ্য করা, মালিকে যতটুকু মজুরি দিতে রাজি তাতেই অসহায় বেকারেরা যাতে সন্তুষ্ট থাকে তারই ব্যবস্থা।

সতের শতকের মাঝামাঝি অর্থাৎ বিপ্লবের আগে পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের এই গরীব ও বেকারদের সমস্যা সম্বন্ধে দুই বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর দেখা পাওয়া

যায়। এক ধরনের চিন্তার মধ্যে লক্ষনীয় ছিল অতীতের জন্য বিলাপের সুর, স্থিতিশীল মধ্যযুগীয় বিধিব্যবস্থা ও নৈতিক আদর্শের প্রতি আকর্ষণ, পারিপার্শ্বিক বদলকে বুঝতে না পারার ভাব, দ্বিধাগ্রস্ত মনে পবিবর্তনকে বাধা দেব্ার চেষ্টা। একে ফিউডাল দৃষ্টি বলা অন্যায় হবে না, এর প্রভাব রাজদরবার ও অভিজাত মহলে ও দেশের অনুন্নত অঞ্চলে স্পষ্টই প্রতীয়মান। পুরাতনপন্থীদের অবশ্য জনসাধারণের ও দুর্গতদের বন্ধু হিসাবে চিত্রিত করবার সার্থকতা নেই। মধ্যযুগের ফিউডালি ব্যবস্থাও এক প্রকারের শোষণ এবং তার প্রতি এদের বিন্দুমাত্র বিরূপতা ছিল না। অপর ধরনের চিন্তাকে নিশ্চয়ই উদীয়মান ক্যাপিটালিস্ট্ অথবা বুর্জোয়া বলা চলে। এতে দেখি ভবিষ্যতেব প্রতি বিশ্বাস, পুবাতন ব্যবস্থা ও আদর্শকে প্রত্যাখ্যান, আসেপাশের দুর্দশাকে সাময়িক অথবা অনিবায ভেবে উপেক্ষা, পূর্ণোদ্যমে নূতন আর্থিক প্রচেষ্টা সমর্থন। এর প্রভাব ছিল পার্লামেন্টের অধিকাংশের মনে, নবীন বুর্জোয়া মধ্যশ্রেণীর ভিতর, এবং লণ্ডন ও অন্যান্য শহর এবং পূবাঞ্চল ইত্যাদি অগ্রসর এলাকায়। বিপ্লবের সময় ইংল্যাণ্ডে যে-দুই পরস্পরবিরোধী শিবির দেখতে পাই, তার সঙ্গে দুইটি চিন্তাধারার অঙ্গাঙ্গি যোগ অতি স্পষ্ট।

দ্বিতীয় দলের কেন্দ্র ছিল পিওরিটান সম্প্রদায়, সুতরাং ইংরাজ বিপ্লব বুর্জোয়া না পিওবিটান এ-প্রশ্ন নিবর্থক। ইংরাজ পিওরিটান আন্দোলনে সমাজসম্পর্কে চিন্তার এক প্রধান মুখপাত্র ছিলেন এলিজাবেথের যুগে কেম্ব্রিজের শিক্ষক ও প্রচারক উইলিয়াম পার্কিন্স্। তিনি আজ বিস্মৃতপ্রায় হলেও সতের শতকের প্রথম ভাগে প্রায় প্রত্যেক পিওরিটান নেতার মনে তাঁর চিন্তা ও প্রভাব ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তাঁর অগণিত শিষ্য চারিদিকে নূতন মতবাদ প্রচার করে। তাঁর লেখার অনুবাদ হয় ফরাসী ও ডাচ, ইটালীয় ও স্প্যানিশ ভাষায়। ইংরাজ পিওরিটানেরা আদি গুরু ক্যাল্ভিনের পাশেই তাঁর স্থান নির্দেশ করত।

এ-হেন প্রভাবশালী পার্কিন্সের সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে মত স্বভাবতই

কৌতূহলজনক, তার বুর্জোয়া বা ক্যাপিটালিস্ট্ রূপটাও গুরুত্বপূর্ণ। পার্কিন্সের মতে প্রত্যেক লোকের উচিত নির্দিষ্ট কোনও প্রয়োজনীয় কাজে নিযুক্ত থেকে কঠোর পরিশ্রম করা, ভগবানের ইচ্ছা ও নির্দেশ হল তাই। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করছে চার ধরণের লোক : (১) পরিশ্রমে নারাজ ভবঘুরে ভিখারীরা, (২) সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা, (৩) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাদের প্রচুর অর্থ ভোগবিলাসে খরচ হয় অথচ যাদের নিয়মিত কাজ নেই, এবং (৪) বড়লোকের আশ্রিত অনুচরবর্গ। ভিক্ষাবৃত্তিকে মারাত্মক অপরাধ গণ্য করে যে-আইন প্রচলিত হয়েছিল, বলা বাহুল্য পার্কিন্সের মতে সে-আইন ঈশ্বরের নির্দেশের পরিপূরক, সে-আইন চিরস্থায়ী হওয়া উচিত। বিপ্লবী লং পার্লামেন্ট্ও ঠিক এইভাবে এ আইন চিরন্তন আদর্শ হিসাবে ঘোষণা করেছিল। চারিদিকে এত বেকার কেন এ প্রশ্নের উত্তরে পার্কিন্স্ বলেছিলেন যে, তারা সুগঠিত সমাজশৃঙ্খলার মধ্যে আসতে চায় না বলেই তাদের দুর্দশা, অর্থাৎ তারা মালিকের সামর্থ্যের অনধিক অল্প মজুরিতে সন্তুষ্ট থেকে কঠোর পরিশ্রমে নারাজ। এমন লোকের প্রতি সমাজের কোনও দায়িত্ব নেই, ভিক্ষা দেওয়া তাই আলস্যের প্রশ্রয় ও সেকেলে ভাবালুতা মাত্র, অভাবের চাপে তাদের কাজে প্রবৃত্ত করানোতেই সমাজের মঙ্গল। অপরদিকে সাংসারিক বিষয়কর্ম কিছু অগৌরবের কথা নয়, ব্যবসা প্রভৃতি পার্থিব কাজে নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মহিমাই প্রকাশ পায়, আর্থিক উন্নতি স্বোপার্জিত হলে তাতে ভগবানের সমর্থনও সূচিত আছে। ক্যাল্‌ভিনিস্ট্ পিওরিটান মতবাদে সকল মানুষ সমানভাবে ঈশ্বরের করুণার অধিকারী নয়। প্রিয় সন্তান হিসাবে ঈশ্বর যাদের ইহলোকে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরলোকে মুক্তির ভার গ্রহণ করেন তাদের ব্যবহারিক জীবনে সাফল্য তাদের প্রতি ভগবানের সমর্থনেরই প্রমাণ। এরাই পরিপূর্ণভাবে ভগবানের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে ধন্য হতে পারে। সমাজের আর্থিক গড়নেও কর্মঠ ও পরিশ্রমী লোকেরাই আসল—অলস, কর্মহীন, পরাশ্রয়ী লোক অবান্তর, সমাজের উপর, দুস্থ হলেও, তাদের দাবি থাকতে পারে না। মধ্যযুগের নৈতিক আদর্শকে চূর্ণ করে এইভাবে নূতন

সামাজিক চিন্তা গড়ে উঠেছিল, কারণ মধ্যযুগে চার্চের শিক্ষা ছিল দুর্গতের কিছুটা সেবা করে আত্মপ্রসাদ লাভ ও পুণ্যসঞ্চয়।

ইংরাজ বিপ্লবে বুর্জোয়া পিওরিটান দল সম্পূর্ণ জয়ী হতে পারে নি, কারণ শেষ পর্যন্ত অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে খানিকটা আপোসে নিষ্পত্তি হল, ফিউডাল ব্যবস্থা পরাজিত হয়েও তাই তখন নিশ্চিহ্ন হয় নি।

এই আপোসের রাজনৈতিক রূপ হল ক্রম্‌ওয়েলের রেপাব্লিকের অবসান ঘটিয়ে রাজবংশকে ফিরিয়ে আনা; অবশ্য নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র চলবে না, পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব মেনে রাজাকে চলতে হবে এই আশ্বাসে। বিশ্বাসভঙ্গের জন্য দ্বিতীয় জেম্‌স্‌কে সিংহাসনচ্যুত করা হয় ১৬৮৮ সালে, সেটাকে বলা যায় ১৬৬০ সালের আপোস চুক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এখানে প্রশ্ন ওঠে, পিওরিটান নেতারা আপোসে রাজি হলেন কেন? তার প্রধান কারণ, ইতিমধ্যে চরমপন্থী মতবাদ মাথা তুলেছিল। চরমপন্থার সেদিন রাজনৈতিক দাবি ছিল পূর্ণ গণতন্ত্র, ধর্মবিশ্বাস ছিল সকলের মুক্তি, ঈশ্বরের বরপুত্র ধর্মান্ধ ছোট গোষ্ঠীর শুধু নয়। বুর্জোয়া প্রভুত্বের বদলে গরীব জনগণের ক্ষমতা দাবির সম্ভাবনা দেখা দেওয়া মাত্র পিওরিটান নেতাদের মনে হল অরাজকতার বদলে রাজাও ভাল, সুশৃঙ্খল সমাজ বজায় রাখতে হলে যদি অ-পিওরিটান বিশপ্‌দের কর্তৃত্ব মেনে নিতে হয় তাও সহ্য করতে হবে। আপোসের মধ্যেও অবশ্য বুর্জোয়া স্বার্থ অনেকখানি জয়যুক্ত হয়, আর পূর্ণজয়ী না হয়েও পিওরিটান মতাদর্শ ইংরাজ জীবনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। সতের শতকের বিপ্লবের সাফল্য এইখানেই।

দশ

বুর্জোয়া বিপ্লবের পূর্ণ পরিণতি ফরাসী বিপ্লবে। এর প্রভাব পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে বিস্তার লাভ করেছে, প্রথম থেকে তার ঘাত-প্রতিঘাত অনেক দেশের ইতিহাসে লক্ষনীয়। মুক্তি, সাম্য ও মৈত্রীর ধ্বনি আসলে নিছক গণতন্ত্রের বাণী। ইংরাজ বিপ্লবে আপোসের ফলে সমাজ যে-রূপ নিয়েছিল তার

মধ্যে এ বাণী আবার নূতন আদর্শের আহ্বান হিসাবেই সমর্থন ও প্রতিবাদের ঝড় তুলল। এরই একটা দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কির্নান প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে।

ফরাসী বিপ্লবে পূর্ণ গণতন্ত্রের উপাসক ছিল জ্যাকবিন দল। তাদের প্রচণ্ড আলোড়নের প্রতিক্রিয়ায় ইংল্যাণ্ডের শাসক শ্রেণী ও সমাজের উপর-তলার লোক সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। প্রতিরোধের অন্যান্য উপায়ের মধ্যে বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল সক্রিয় প্রাণবান ধর্মবিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঐতিহাসিক হালেভি এর নাম দিয়েছিলেন প্রটেস্টাণ্ট্‌ ধর্মোৎসাহের নবজন্ম। সরকারী চার্চের মধ্যে এই ভাবধারার প্রবাহ ইতিহাসে ইভান্‌জেলিক্যাল আন্দোলন নামে খ্যাত, বাইবেল গ্রন্থের সারাংশ থেকে এর নামকরণ। রাজনীতির ক্ষেত্রে উইল্‌বার্‌ফোর্স্‌ ছিলেন এর প্রতিনিধি। সরকারী চার্চের বাইরে মেথডিস্ট্‌, ব্যাপ্টিস্ট্‌ প্রভৃতি সম্প্রদায় অনুরূপ ধর্মোচ্ছ্বাসের বাহন হল। ইংরাজ সরকার, পার্লামেণ্ট্‌, শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সাধারণ লোক অনেকে পর্যন্ত নূতন করে ধর্মের আশ্রয় নিতে চেষ্টা করে। জ্যাকবিন মতাদর্শের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে ধর্মপ্রচার সমাজে নূতন প্রতিষ্ঠা পেল এইভাবে।

আঠারো শতকে বিপ্লবের আগে পর্যন্ত সক্রিয় ও উদ্দীপনাময় ধর্মবিশ্বাসের অভাব থেকে এই নূতন উৎসাহের তাৎপর্য বোঝা যায়। তখন ধর্ম হয়ে উঠেছিল একটা অভ্যাসের মতন, বাইরের অনুষ্ঠান বজায় থাকলেও দৃঢ় বিশ্বাস চোখে পড়ত না, চিন্তার মহলে সংশয়বাদ প্রতিপত্তি পেয়েছিল, গণ্যমান্য লোকেরা ধর্ম সম্পর্কে ছিল উদাসীন। আঠারো শতাব্দীর মাঝে যখন ওয়েস্‌লি মেথডিস্ট্‌ আন্দোলনের মাধ্যমে নূতন ধর্মোচ্ছ্বাসের আবাহন করলেন তখন তা সাড়া পেয়েছিল কেবল উদীয়মান শিল্পবিপ্লবের তাড়নায় নির্যাতিত দুঃস্থ লোকের মধ্যে, সম্ভ্রান্ত ভদ্র সমাজে তার প্রতি ছিল বিদ্রূপ ও বিরূপতা। ফরাসী বিপ্লবের পর দেখা গেল নাটকীয় পরিবর্তন। ওয়েস্‌লির সজীব ধর্ম এতদিনে পেল বিপুল সমর্থন, ধর্মোৎসাহ সংক্রামিত হল সকল

সম্প্রদায়, শিক্ষিত সমাজ ও সরকারী চার্চের মধ্যে পর্যন্ত। প্রাণহীন অভ্যাস ও বাইরের অনুষ্ঠানের স্থানে আসতে লাগলো ভগবদ্ভক্তির প্লাবনে 'মুক্তি'র আহ্বান, 'সৎকার্যের' প্রেরণায় জীবনে সার্থকতার সন্ধান।

সামাজিক বিপ্লবকে ঠেকাতে হলে যে-ধর্ম কার্যকরী তার মধ্যে এই উচ্ছ্বাস ও সক্রিয় উদ্দীপনার একান্ত প্রয়োজন থাকে। আঠারো শতকে ধর্মের প্রচলিত রূপে দেখি কতকগুলি আচার পালন, জীবনে সুনীতির কয়েকটি নিয়ম অনুসরণ, তত্ত্বের ক্ষেত্রে স্বাধীন বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ। ফরাসী বিপ্লবের ঝড়ের দিনে এ ধরণের ধর্ম আর সমাজের রক্ষাকবচ রইল না, তাই হঠাৎ চোখ পড়ল এত দিনের অনাদৃত ওয়েস্লিপন্থার দিকে—যেখানে ধর্ম একটা তীব্র মানসিক আবেগ, সংসারের দুঃখকষ্ট ভুলে পরমার্থের চিন্তায় আত্মনিয়োগ, বুদ্ধির বদলে ভক্তির আরাধনা, মঙ্গলময় জ্ঞানে ভগবানের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ, এবং সৎকার্য হিসাবে কিছুটা দুঃস্থের সেবা। নূতন ধর্ম আন্দোলনের পুরোহিতদের আন্তরিকতায় সন্দেহ করবার কারণ নেই, কিন্তু আসল প্রশ্ন হল সমাজের উপরের স্তরের লোকদের হঠাৎ ধর্মের প্রতি এত টান হল কেন। ফরাসী বিপ্লবের আতঙ্কের সঙ্গে এর যোগাযোগ অস্বীকার করা শক্ত। অনুরূপ অবস্থায় এরকম প্রতিক্রিয়া খুব অপরিচিত ব্যাপার কি?

১৭৯০ সালে বার্ক্ যখন ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেন তখন তাঁর যুক্তি ছিল যে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন সমাজব্যবস্থা নিখুঁত না হলেও একটা স্বাভাবিক পরিণতির ফল, হঠাৎ বদলের ধাক্কায় অতীতের ভাল দিকটাও ধ্বংস হবে। এ হল শুধু আঠারো শতকের বুদ্ধির বিচার। ১৭৯৭ সালে উইল্‌বার্‌ফোর্সের একই উদ্দেশে লেখা বই-এ দেখি অন্য ধরনের কথা। সেখানে বলা হচ্ছে লোকের অসন্তোষ নৈতিক সমস্যা, রাষ্ট্রিক নয়। জীবন্ত ধর্ম বিশ্বাসের পুনরুদ্ধারই কেবল মানুষকে পার্থিব দুঃখকষ্ট অগ্রাহ্য করে আত্মার মঙ্গলচিন্তায় বিভোর হতে শেখাতে পারে, সমাজের স্থিতি রক্ষার অন্য উপায় নেই। দ্বিধা-বিভক্ত সমাজে বিপদ হল

দুর্ভাগাদের অভ্যুত্থান, প্রাণবান ধর্মোৎসাহ-ই কেবল তেমন সমাজকে বেঁধে রাখতে পারে, কারণ যেখানে সকল মানুষের মিল ধর্মের আগ্রহ সেদিকেই লোককে টেনে নেয়। উইল্‌বার্‌ফোর্সের শিক্ষা হল—বুদ্ধি নয়, ভক্তিই সমাজকে রক্ষা করবার উপায়। অবস্থাপন্ন লোকেরা সেদিন তাঁর নির্দেশে সাড়া দিয়েছিল জীবনযাত্রার ধরন কিছুটা সংশোধিত করে, নৈতিক সংস্কারের সমর্থনের মধ্যে, বেকারদের সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে, ধর্মশিক্ষার বিপুল প্রচারের ভিতর। নাবিকদের মধ্যে যেখানে কিছুদিন আগেও টম পেন এর বিপ্লবী লেখা ছড়িয়ে পড়েছিল সেখানে হতে লাগল বাইবেল বিতরণ। খৃস্টীয় সকল সম্প্রদায়ের সকল প্রচেষ্টার তহবিলে অর্থাগমের পরিমাণ বেড়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। সঙ্ঘবদ্ধ প্রচার বা মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ দেখা গেল দিকে দিকে।

আত্মরক্ষার এই আয়োজনে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া পূর্ণ বিজয়লাভ করতে পারে নি। সাধারণ লোকের মধ্যে অসন্তোষ বাস্তব অবস্থার চাপে বেঁচে থাকে, জ্যাকবিন আদর্শ কিছুটা রূপান্তরিত হয়ে মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবি মহলে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করে চলে। এমন কি নূতন ধর্ম আন্দোলনেরও একটা দিক ছিল যেটা পরিবর্তনের সহায়ক। সক্রিয় ধর্ম মানুষের দুঃখ মোচনের তাগিদে খানিকটা সংস্কারব্রতী হয়ে পড়ে। বিপ্লবের পথ তখনকার মতো বন্ধ হলেও পুরাতন ব্যবস্থাকে অপরিবর্তিত রাখা শেষ পর্যন্ত তাই চলল না। ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধ প্রতিরোধ সত্ত্বেও তাই উনিশ শতকে ইংল্যাণ্ডে অগ্রগতির স্রোত রুদ্ধ হয়ে যায় নি।

এগার

আলোচ্য পত্রিকার শেষ উল্লেখযোগ্য রচনা লণ্ডনের ইতিহাস-শিক্ষক হবস্‌বম্‌ এর প্রবন্ধ। ইংল্যাণ্ডে যন্ত্রশিল্প-বিপ্লবের ইতিহাসে গোড়ার দিকে মজুরদের যন্ত্র ভাঙবার চেষ্টার বিশ্লেষণ এর মধ্যে পাওয়া যায়।

১৮১২ সালের লাডাইট আন্দোলন অনেকেরই সুপরিচিত, কিন্তু মেশিন-ধ্বংসের এই অভিযান একটা সাময়িক উদ্দামতা ছিল না। বহুদিন, অনেকবার,

ও নানাস্থানে এব অনুরূপ ঘটনার প্রমাণ আছে। ঐতিহাসিক মহলে প্রচলিত বিশ্বাস যে নেপোলিয়ানেব বিরুদ্ধে যুদ্ধেব একটা পর্যায়ে মজুরেরা দুরবস্থায় অস্থির হয়ে পাগলের মত কল ভাঙবার চেষ্টা করেছিল। এ প্রসঙ্গে এটাও স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে মেনে নেওয়া হয় যে, এ আন্দোলন ছিল অনিবার্য পরিবর্তনের বিরুদ্ধে নিছক মূর্খ আক্রোশ কেন না মালিকদের উপব জোর প্রয়োগের নীতি সর্বদা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ঐতিহাসিক গবেষণা এখন প্রমাণ কবছে যে প্রচলিত বিশ্বাসে অনেকখানি ভুল আছে।

লাডাইট বিদ্রোহ একটা চমকপ্রদ ব্যাপাব সন্দেহ নেই। গোলযোগেব ভয়ে অশান্ত এলাকায় সেদিন যে ১২,০০০ সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছিল, সংখ্যায় তারা পর্টুগালে তখন যুদ্ধবত ওয়েলিংটনের বাহিনীব থেকে বৃহত্তব। কিন্তু লাডাইটদেব দিকে চোখ আবদ্ধ বেখে ভুললে চলবে না যে কল ভাঙা একটা আকস্মিক বিক্ষোভ নয়। ১৮১২ সালেব আগে ও পরে প্রায় একশ বৎসর ধবে এই ধরনের প্রচেষ্টাব প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে। ইংল্যাণ্ডে শিল্পকাযে কলেব প্রচলনের সমস্ত আদিযুগ ধবে এব ব্যাপ্তি। যদিও ১৮১২ সালের মতন বিস্ফোরণ আর ঘটে নি, তবুও মেশিন ভাঙাব উদ্যম একটা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন। অর্থাৎ মজুরেবা এটাকে প্রতিরোধেব এক সাধাবণ উপায় হিসাবেই দেখে থাকত।

মজুব আন্দোলনের গোড়ার কথা হল শক্তিশালী মালিকের সঙ্গে একজোটে দরদস্তর করা, অসহায় অবস্থায় আলাদা আলাদা চুক্তি করতে বাধ্য না হওয়া। কল ভাঙা কিম্বা ভাঙবার ভয় দেখানো সেই উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় হিসাবে আঠারো শতকে একটা সাধারণ ঘটনা ছিল। এর অজস্র উদাহবণ পাওয়া গেছে এবং এর কারণ বোঝাও সহজ। ক্ষতিব ভয়ে মালিককে দাবি মেনে নিতে রাজি করানো অনেক সময় সম্ভব। তাছাড়া প্রথম মজুর আন্দোলন এত সুশৃঙ্খল হয় না যে শান্তভাবে এক সঙ্গে সকলে কাজ বন্ধ করে মালিককে নতি স্বীকার করানো যায়। ধ্বংসকার্যের দিকে আসক্তি তখন স্বাভাবিক।

মাঝে মাঝে অবশ্য দেখা যায় যে মজুরে কল ভাঙছে নেহাৎ আক্রোশের চাপে, কারণ নূতন যন্ত্র আমদানী হলে অনেকের চাকরি যাবার সম্ভাবনা। কিন্তু কল হিসাবেই কলের প্রতি শত্রুতা একটা ব্যাপক মনোভাব ছিল না। মজুরদের লক্ষ্য ছিল আত্মরক্ষা, অনুকূল অবস্থায় কলের ব্যবহারে কাজের উন্নততর কৌশল অবলম্বনে তাদের কোনও আপত্তি থাকার প্রমাণ নেই। নূতন নূতন কলের ব্যবহারে অস্বস্তি ও দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব যখন দেখা যায় তখন তা মজুরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এমন কথা বলা চলে না। অনেক সময় তেমন মনোভাব সাধারণ জনমতেরই প্রকাশ। দোকানদার, ব্যবসায়ী, এমন কি ছোট কারখানার মালিকও সব সময় নিত্য নূতন কলের আমদানী প্রীতির চোখে দেখত না; দুরন্ত পদক্ষেপে যন্ত্রশিল্পের প্রসার শিল্পপতির পক্ষে লাভজনক হলেও অপরের কাছে বিশেষ আনন্দের বস্তু ছিল না। উত্তরোত্তর অধিক লাভের অভিযান কিন্তু সরকারের কাছে সমর্থন পেত। সতের শতকের বিপ্লবের পর থেকে রাষ্ট্রের নীতি কখনই ধনিক স্বার্থের প্রতিকূলতা করে নি, সর্বদাই মালিকদের স্বপক্ষে আইন-কানুনের দৃষ্টান্ত তাই চোখে পড়ে।

কল ভাঙার আন্দোলন কি একেবারেই নিষ্ফল হয়েছিল? মজুর আন্দোলনে মালিকের উপর চাপ দেবার অন্য যত উপায় আছে তার তুলনায় এর ব্যর্থতা তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না। দেশব্যাপী বড় বড় সুসংগঠিত ইউনিয়ান গড়ে উঠবার আগে কল ভাঙবার উদ্যম যেমন নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়, তেমনি মজুরদের স্বার্থরক্ষার দিক থেকে এর আংশিক সাফল্যটাও বাস্তব ঘটনা। আসলে যন্ত্রশিল্প-বিপ্লবের যুগ মালিক মজুর দুই পক্ষের সুদীর্ঘ লড়াই-এর যুগ, দুই দিক থেকেই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অস্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। কল ভাঙার উদ্যম তারই অন্যতম, তাকে স্বতন্ত্র সৃষ্টিছাড়া কিছু মনে করবার কারণ নেই।

॥ ইতিহাস : শ্রাবণ, ১৩৬০ (১৯৫৩) ॥

আলোচনা

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, তাঁর প্রত্যেকটি বক্তব্য আমাদের শ্রদ্ধার যোগ্য। 'ইতিহাস' পত্রিকার গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভারত-ইতিহাসের নূতন সংস্করণ' প্রবন্ধের মতামত সম্পর্কে কিন্তু অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্নগুলির পিছনে ইতিহাস সম্বন্ধে যে-ধারণা দেখতে পাই, সর্বজনগ্রাহ্য না হলেও তার বিবরণ বাঞ্ছনীয় মনে করি।

ইংরাজ আমলে ভারতের ইতিহাস-চর্চায় 'কিছু বিকৃতি' দেখা দেয়, এবং তার প্রতিবাদে 'আমরাও রাজনৈতিক সুবিধার জন্য অনেক কাল্পনিক ইতিহাস রচনা' করেছিলাম—ডক্টর মজুমদারের প্রধান প্রতিপাদ্য এই মত সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ নেই। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে তিনি এমন মন্তব্যেরও অবতারণা করেছেন যা গ্রহণ করা সহজ নয়। তিনি বলেছেন যে আমাদের জাতীয়তাবাদী স্বদেশী ইতিহাস আমদানি হয়েছিল শুধুই 'সাময়িক সুবিধার জন্য', এখন 'প্রয়োজন ফুরাইলেও' তার অনুসরণ কেবল 'অনর্থের সৃষ্টি' করবে।

ইতিহাস আলোচনার সমস্যা কি এত সরল? ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতের জাতীয়তাবাদী রচনার মধ্যে তফাতটা কি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর তফাত নয়? দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য-প্রসঙ্গ কি এত সহজে নিষ্পত্তি করা চলে?

সমস্যার আসল রূপ প্রকাশ পেয়েছে ডক্টর মজুমদারের এই উক্তিতে যাকে তিনি স্বতঃসিদ্ধের মর্যাদা দিয়েছেন—'ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্য সত্যের নির্ধারণ। আদালতে বিচারকের ন্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী কি নির্দোষী, ইহার নিরূপণ করাই তাঁহার একমাত্র কর্তব্য'' ('ইতিহাস', ষষ্ঠ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ৭৫ পৃষ্ঠা)।

ঐতিহাসিক কি আসলে বিচারক মাত্র? সার্থক বিচারের ধরনটাই বা কি?

উদ্ধৃত বাক্যটির মধ্যে স্ববিরোধ চোখে পড়বার মতন। বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত কি সার সত্যের সমতুল্য? কোনও বিচারকের রায় কি সমাজ-জীবনে শেষ কথা? তা হতে পারে না, কারণ বিচারক যে-আইন প্রয়োগ করেন সেই আইন সম্বন্ধেও মানুষের মনে প্রশ্ন ওঠে। প্রচলিত আইনের সঙ্গে ক্রমবিকাশমান ন্যায়বুদ্ধির অমিল মানুষের অভিজ্ঞতায় বারবার দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ, বিচারকেরও দৃষ্টিভঙ্গী আছে, প্রতিষ্ঠিত আইনের দৃষ্টিভঙ্গী। নির্বিচারে বিচারকের রায় তাই সব সময় মানা চলে না, বিশেষ করে বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী যখন প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। বিচারকের মতন ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্তও সমাজনিরপেক্ষ অখণ্ড সত্য নয়, ঐতিহাসিকের কাছে আমরা এইটুকু বিনয় দাবি করতে পারি।

ডক্টর মজুমদারের উদ্ধৃতির পিছনেও দৃষ্টিভঙ্গী আছে। তার প্রথম বিশ্বাস হল যে চিরন্তন স্থির সত্য নির্ধারণ শক্তিশালী ঐতিহাসিকের কাছে শক্ত কাজ নয়। ঐতিহাসিকেরা বার বার এই দাবি করেছেন, বার বার দাবি ব্যর্থ প্রমাণ হয়েছে। একদা কেম্ব্রিজ আধুনিক ইতিহাসমালা সম্বন্ধে প্রকাশ্য ঘোষণা করা হয়েছিল—"**So for as truth can be ascertained by mortal men, so far as learned impartial criticism can be final, we have them here.**" ধ্রুব সত্য গুহার মধ্যে নিহিত আছে, তাকে টেনে বার করলেই হল। কেম্ব্রিজ ইতিহাসকে এই সম্মান আজ কে দিতে পারে?

আসলে, সামাজিক জীবনের স্রোতের মধ্য থেকেই নানা দৃষ্টিভঙ্গীর উদয় হয়, তাদের মধ্যে বিরোধ অনেকখানি অনিবার্য, এদের উৎপত্তিকে সাময়িক সুবিধার সন্ধানে সত্যের রাজপথ থেকে বিচ্যুতি ভেবে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। মহাপ্রতিভাশালী ঐতিহাসিকও দৃষ্টিভঙ্গীর হাত থেকে নিস্তার পান না। তিনিও সামাজিক জীব, সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী দুর্বল হয়ে পড়লে তার লেখাও আর

আগের মতন সত্য মনে হয় না। এর দৃষ্টান্ত এত অসংখ্য যে তাকে অগ্রাহ্য করাটাই আশ্চর্য মনে হয়। ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখছেন—**The suggestion that such historians as Gibbon and Macaulay, Acton and Ranke, Fustel de Coulanges and Mommsen, J. R. Green and Stubbs—not to speak of those still living—were only seeking in their research to discover fact, without being inspired by some general conception of the meaning of history, is enough to make a cat laugh."**

ইতিহাস-চর্চায় এ বিপদ কেন? কারণ এই যে, নিঃসন্দেহে সত্য এমন ঘটনা বা 'ফ্যাক্ট্'-সংগ্রহ ইতিহাসে প্রাথমিক স্তর মাত্র। আকবরের জন্ম ১৫৪২ সালে, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর তারিখ ১৭০৭, পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলা পরাস্ত হন, ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয় ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে, ১৮৫৭ সালে সিপাহীরা বিদ্রোহ করে—ফ্যাক্টের নমুনা হল এই সব। এক্ষেত্রে সত্য নির্ধারণ শক্ত কাজ নয়।

কোনও ঐতিহাসিকই কিন্তু এই স্তরে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেন না। অন্য কথা বাদ দিলেও ফ্যাক্ট্ বাছার প্রশ্ন আসে। অর্থাৎ অনেক সময় (বিশেষত আধুনিক যুগে মাল মশলার প্রাচুর্যের জন্য) ঘটনা নির্বাচন করে নিতে হয়। পলার্ড্ বলেছিলেন যে অষ্টম হেনরি সম্বন্ধে আমরা হাজার হাজার ফ্যাক্ট্ জানি, তার সবগুলি ব্যবহার করা কোনও লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। বাছাই করতে হলেই ঐতিহাসিক মূল্যবিচার অনিবার্য। তাছাড়া নানা ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র ও কার্যকারণ সম্বন্ধ খোঁজা, ঘটনার ফলাফল নির্ধারণ—এ সব ছাড়া ইতিহাস নিরর্থক, এবং এ চেষ্টা প্রাথমিক ফ্যাক্ট্-সংগ্রহের গণ্ডির বাইরে। মূল্যবিচার তাই ইতিহাসে দ্বিতীয় ও অতি-আবশ্যিক স্তর।

মূল্যবিচারে ভিন্ন মত হওয়া স্বাভাবিক, এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পায়। ডক্টর মজুমদার সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অপরাপর দৃষ্টিভঙ্গীরই বা অভাব কোথায়?

বীরপূজা, রেস্‌-মাহাত্ম্য, শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা, শ্রেণীসংঘাত, স্বধর্মের অভিমান, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ—ঐতিহাসিকের দেখবার ধরনের উপর এদের প্রভাবও কম নয়। সমাজবিদ্যার প্রতি অঙ্গের লক্ষণ এই, একে অস্বীকার করে সমাজনিরপেক্ষ সত্য নির্ণয়ের দাবি অনেকটা কল্পনাবিলাস।

প্রথম স্তরের ফ্যাক্ট্‌ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের এক মত হওয়াই স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। মূল্যবিচারের স্তরেও নিশ্চয় বহু ব্যাপারে একমত হওয়া সম্ভব। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যাখ্যায় ও বিচারে মৌলিক প্রভেদ দেখা যায়, তখন মতভেদ অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক নয়। বহুলাংশে তেমন মতভেদ দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্য থেকেই উৎপন্ন। দৃষ্টান্ত দেওয়া সহজ—রেফর্মেশন কিম্বা ফরাসী বিপ্লবের সার্থকতা, ইতিহাসে রোব্‌স্‌পিয়ার বা স্টালিনের স্থান নির্দেশ, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল, উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের প্রকৃতি, সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ, ভারতের মুক্তিসাধনে অহিংসার স্থান—ইত্যাদি প্রসঙ্গ ফ্যাক্ট্‌-নির্ধারণের স্তরের কথা নয়, মূল্যবিচারের প্রশ্ন। নৈতিক মূল্যবিচার নয়, ঐতিহাসিক মূল্যবিচার। এখানে বিশেষ কোনও সামাজিক দৃষ্টির উপরে ওঠা ঐতিহাসিকের সাধ্যের বাইরে।

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তার সবগুলিই কি তুল্যমূল্য, সবই কি সমান সত্য কি সমান মিথ্যা? এখানে ইতিহাসে তৃতীয় স্তরের কথা আসে, ফ্যাক্টের মূল্যবিচার থেকে আমরা এগিয়ে চলি দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে। ইতিহাস-চর্চায় বিজ্ঞান-দর্শনের স্পর্শ এইখানে। বিজ্ঞানের রাজ্যে আমরা দেখি নানা মত বা থিওরির উদয় হয়, বিশ্লেষণ ও পরখ করে আমরা তাদের বিচার করি, আপেক্ষিক সত্যাসত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, অথচ প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পূর্ণ সত্য নির্ধারণের দাবি করেন না। ইতিহাসেও সত্যের সন্ধান **approximation** মাত্র। বিজ্ঞান থেকে তফাত এই যে, ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত অনেক বেশি মাত্রায় সামাজিক দৃষ্টির উপর নির্ভরশীল আর পরীক্ষার সাহায্যে সত্যে পৌঁছবার উপায়টি এখানে অনেকটা অচল। বিজ্ঞানে যেমন এক থিওরি খণ্ডন করে নূতন মতে পৌঁছান সম্ভব, ইতিহাসেও তেমনি এক

দৃষ্টিভঙ্গী পার হয়ে অন্যত্র পৌছানো যায়। এখানে অস্ত্র হল যুক্তি ও বিশ্লেষণ, তার ফলে দেখার ধরন বদলে যাওয়া অদ্ভুত কথা নয়। থিওরির-ও মূল্যবিচার চলে, আপেক্ষিক সত্যাসত্যের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। শুধু আমরা যেন বিচারকের ফতোয়া দেবার লোভ সম্বরণ করি, আমরা ইতিহাসের রিসার্চ্-লেবরেটরির কর্মী মাত্র।

ডক্টর মজুমদারের দু'টি বিশেষ সিদ্ধান্তের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আলোচনা শেষ করি।

প্রথম সিদ্ধান্ত, ভারতে মুসলমান রাজত্ব বিদেশী শাসন, কারণ হিন্দুদের উপর সমানে অত্যাচার চলে আর সে-অত্যাচার সম্বন্ধে হিন্দুরা সর্বদাই সজাগ ছিল।

তর্কের খাতিরে প্রমাণ দু টি মেনে নিলেও কিন্তু সিদ্ধান্তটুকু প্রমাণিত হয় না। স্বদেশী শাসনে কি অত্যাচার অবিচারের স্থান নেই? ষোল শতকে জার্মানির আনাব্যাপ্‌টিস্ট্ জনগণ বা স্পেনে প্রটেস্টান্ট্ সম্প্রদায় তো নির্মূল হয়েছিল, বহু যুগ ধরে ইংল্যাণ্ডে ক্যাথলিকদের 'সামাজিক ও ধর্ম বিষয়ে কোন অধিকারই' ছিল না—কিন্তু তখন কি এই সব দেশ বিদেশী শাসনের অধীন? স্বদেশী হিন্দু রাজত্বে কি প্রজাদের শোষণ অসম্ভব ছিল? ধর্মে হস্তক্ষেপই কি অত্যাচার ও পরাধীনতার একমাত্র অকাট্য প্রমাণ?

মুসলমান রাজত্বকাল ইংরাজপ্রভুত্বের মতন বিদেশী শাসন নয়-এ কথার অর্থ শুধু এই যে ভারতীয় মুসলমানদের অন্য স্বদেশ ছিল না, লুণ্ঠিত অর্থ শাসকেরা বিদেশে চালান দিত না, রাজাদের রাজনীতি অন্য দেশের বা বাইরের কোনও সাম্রাজ্যের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হত না, দেশের অধিবাসীদের একটা বিশাল অংশ রাজাদের সহধর্মী ও সমবিশ্বাসী ছিল। মুসলমান নেতারা বহিরাগত হলেও কিছুদিনের মধ্যে তাদের কাছে আর অন্য স্বদেশ থাকত না। মুসলমান ধর্মের উৎপত্তি ভারতের বাইরে, তার পরিধি সার্বভৌম—কিন্তু মধ্য যুগে অনুরূপ খৃস্টধর্মের আওতায় তো ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের জনগণকে আমরা বিদেশী-শাসিত মনে করি না। হিন্দু

সংস্কৃতি=ভারতীয় সংস্কৃতি, এই সমীকরণটুকুও এক ধরণের মূল্যবিচার ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক মাত্র, তার বেশি কিছু নয়।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, ভারতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ 'বরাবরই ছিল।' 'হিন্দু-মুসলমান যে দুই জাতি' 'জিন্নার এই মত হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃভাব কল্পনা অপেক্ষা ঐতিহাসিক সত্যের অধিকতর অনুবর্তী।'

হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদ অস্বীকার করার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু প্রভেদ আর বিরোধ কি সর্বদাই সমার্থক? প্রভেদ থাকার জন্য বার বার বিরোধ এসেছে, এ কথা নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু বিরোধই একমাত্র সত্য এ কথা বলব কেমন করে? কোনও কোনও রাজার সময় অথবা কোনও কোনও অঞ্চলে বিরোধ তীব্র হয়ে উঠত, আবার অনেক সময় অনেক স্থানে তা স্তিমিত হয়ে পড়ত--এইটাই কি বেশী সত্য নয়? সমাজের অনেক স্তরে, প্রভেদ থাকলেও বহু ক্ষেত্রে বিরোধের ভাবটা এক কাজ কর্মে আর্থিক সমস্বার্থের চাপে আচ্ছন্ন হয়ে পড়াও তখন খুব সম্ভব ও স্বাভাবিক ছিল। নবাবী আমলের ইতিহাসে যদি এর নিদর্শন পাওয়া যায়, তবে আধুনিককালে তার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া নিতান্ত অন্যায় নয়। ঘটনার পরিমাণের দিক থেকে ইতিহাসে মারামারি, কাটাকাটি ও ক্ষুদ্র স্বার্থের সন্ধান অপর্যাপ্ত, অথচ আমরা সহজেই অন্য দিকটার কথা তুলে ধরে থাকি। অর্থাৎ এখানেও ঘটনার মূল্যবিচার ও আনুষঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গী এসে পড়ে। হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদ অস্বীকার ফ্যাক্ট্ অগ্রাহ্য করার সামিল, কিন্তু বিরোধ থেকে সহযোগের দৃষ্টান্তের দিকে ঝোঁক পড়া ঘটনার মূল্যবিচারের কথা। অবশ্য কল্পিত ঘটনার আমদানি করা চলে না, প্রাথমিক ফ্যাক্টের স্তরকে অগ্রাহ্য করে ইতিহাস রচনা নিশ্চয়ই কাল্পনিক হতে বাধ্য।

মুসলমান শাস্ত্রকারদের কাফের সম্বন্ধে উক্তিই শেষ কথা নয়, প্রশ্ন এই যে, সে-নীতি মুসলমান শাসকের পক্ষে দেশে কত দূর ও কতখানি কার্যকরী করা সম্ভব ছিল। পণ্ডিতদের আস্ফালন সভাষদদের স্তুতির মতনই বিচার-সাপেক্ষ। মনুসংহিতার শূদ্র বা নারীবিরোধী শ্লোককেও অক্ষরে অক্ষরে

দেশের নীতি বলে চালানো চলে না। রাজশক্তি ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন হলেও অত্যাচারের নীতি কতদূর ও কতখানি কার্যকরী হওয়া সেদিন সম্ভব ছিল সে-কথাও ভোলা চলে না।

আমীর খস্রুর স্মৃতি-উৎসবের প্রতিবাদ সম্বন্ধে তাই কথা ওঠে। সেখানে সম্ভবত তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো উদ্দেশ্য ছিল। সে প্রতিভার যদি অস্তিত্ব না থেকে থাকে, তা হলে উৎসব নিশ্চয়ই অন্যায়। কিন্তু উগ্র ধর্মবিশ্বাসের জন্য প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করা চলে না। ধর্মের সংকীর্ণতার জন্য ইয়োরোপীয় মধ্যযুগের সংস্কৃতির ধারকদের আজ তুচ্ছ করা হয় কি? আমীর খস্রু হিন্দু-বিদ্বেষী হতে পারেন, কিন্তু প্রজার চোখের জলে সিক্ত রাজশক্তির দৌলত সম্বন্ধে উক্তিও তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়েছিল।

ইতিহাসের সম্যক বিচারে আমাদের উচিত প্রথমে বাস্তব ঘটনা বা ফ্যাক্ট্ নির্ধারন; দ্বিতীয়ত, ঘটনার ঐতিহাসিক মূল্যবিচার ও সেই সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে সজাগ থাকা: তৃতীয়ত, বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির সাহায্যে নানা দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে আপেক্ষিক বিচার। তাই নানা সাহেব ও বাহাদুর শাহ অথবা তান্তিয়া বা ঝান্সীর রাণীর চরিত্র অনুশীলন যেমন ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রকৃতি নির্ণয়ে প্রধান বা শেষ কথা হতে পারে না, তেমনি ভাবতে মুসলমান শাসনের প্রকৃতিবিচার একদেশদর্শী হওয়াটাও দুঃখের কথা।

॥ ইতিহাস : বৈশাখ, ১৩৬৩ (১৯৫৬) ॥